পৌরনীতি ও সুশাসন

প্রথম পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক

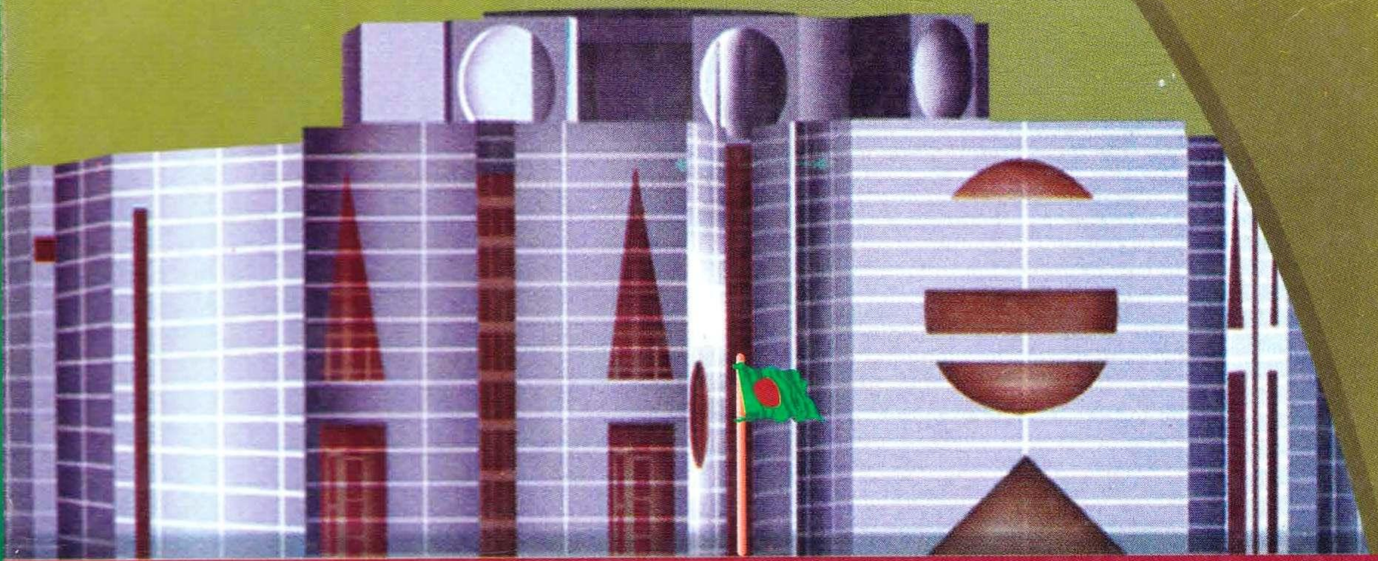

হাসান বুক হাউস ◆ ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত

পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র : একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি ◆ প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন পরিচিতি

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সুশাসন

তৃতীয় অধ্যায়ঃ মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ই-গভর্নেন্স ও সুশাসন

পঞ্চম অধ্যায়ঃ নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

সপ্তম অধ্যায়ঃ সরকার কাঠামো

অষ্টম অধ্যায়ঃ জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

নবম অধ্যায়ঃ জনসেবা ও আমলাতন্ত্র

দশম অধ্যায়ঃ দেশপ্রেম ও জাতীয়তা

প্রথম অধ্যায়

পৌরনীতি ও সুশাসন পরিচিতি

মানুষ সামাজিক জীব স্বভাবতই মানুষ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে পারে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও স্নেহ-প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। এ জন্যই মানুষ আপনজনদের নিয়ে একত্রে বাস করতে চায়। স্নেহ ও ভালোবাসার প্রত্যাশী মানুষ সঙ্গপ্রিয়তার জন্যই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে চায়। সমাজ ছাড়া সে বাস করতে পারে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক গ্রিক দার্শনিক **এরিস্টটল** এজন্যই বলেছেন, “মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব এবং যে সমাজে বাস করে না, সে হয় দেবতা না হয় পশু। " (Man is by nature a social and political animal and a man who is not a member of a society is either a God or a beast.)

প্রাচীন যুগের মানুষ ফলমূল সংগ্রহ, পশু শিকার এবং অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করতো, ঘুরে বেড়াত। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধনের ফলে সভ্যতার অগ্রগতি সাধিত হলেও মানুষের মধ্যে এখনো সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করার সেই প্রবণতা এতটুকু কমে যায়নি। আজও মানুষ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

সুদূর অতীতে সমাজবদ্ধ মানুষের নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করে কতগুলো নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়েও দেখা যায়, সমাজবদ্ধ মানুষের নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান। নাগরিক জীবনের এসব দিক নিয়ে আলোচনার জন্য তাই গড়ে উঠেছে জ্ঞানের এক বিশেষ শাখা, যা আজ CIVICS বা ‘পৌরনীতি’ বলে পরিচিত। এজন্য পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞানও বলা হয়। পৌরনীতি মূলত একটি সামাজিক বিজ্ঞান।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দ (Key Words) ঃ

সিভিকস, সিভিস, সিভিটাস, নাগরিক, নগররাষ্ট্র (City State), জাতীয় রাষ্ট্র (Nation State), দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক চেতনা, সুশাসন (Good Governance), নৈতিক মূল্যবোধ, স্বচ্ছতা, বৈধতা, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা (Accountability), দক্ষতা, সেবাধর্মী মনোভাব, সুশীল সমাজ, বিকেন্দ্রীকরণ, লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি।

শিখন ফল ঃ এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১। পৌরনীতির ধারণা বর্ণনা ও সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবে।
২ । পৌরনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা করতে পারবে।
৩। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবে ।
৪ । বাংলাদেশে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবে ।
৫ । সুশাসনের ধারণা ও সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবে।
৬ । সুশাসনের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
৭। পৌরনীতি ও সুশাসনের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবে।
৮। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
৯ । পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
১০ । পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে ।
১১। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
১২ । পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
১৩। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ভূগোলের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
১৪। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে জনসংখ্যা ও উন্নয়নচর্চার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
১৫। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে মানবাধিকার ও জেন্ডার স্টাডিজের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
১৬। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।

সূচিপত্র

১.১ পৌরনীতির ধারণা ও সংজ্ঞা

Concept and Definition of Civics

ইংরেজি সিভিক্স' (Civics) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পৌরনীতি' । সিভিকস' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ সিভিস' (Civis) এবং সিভিটাস' (Civitas) থেকে। সিভিস' এবং সিভিটাস' শব্দের অর্থ যথাক্রমে নাগরিক ও নগররাষ্ট্র' (City State)। সুতরাং শব্দগত অর্থে সিভিকস' বা পৌরনীতি হলো নগররাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের আচরণ ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান। প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রিসে শব্দগত বা মূলগত অর্থেই পৌরনীতি বলতে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিষয় মনে করা হতো।

সংস্কৃত ভাষায় নগরকে পুর' বা পুরী এবং নগরের অধিবাসীদেরকে বলা হয় পুরবাসী । এ জন্যই নাগরিক জীবনের অপর নাম 'পৌর জীবন এবং নাগরিক জীবন সম্পর্কিত বিদ্যার নাম 'পৌরনীতি ।

প্রাচীন গ্রিসে এক একটি নগর ছিল এক একটি রাষ্ট্র। প্রাচীন গ্রিসের এথেন্স, স্পার্ট প্রভৃতি নগর-রাষ্ট্রগুলোর আয়তন ও জনসংখ্যা ছিল সীমিত। নগর-রাষ্ট্রের সকল সদস্যকে নাগরিক বলা হতো না। নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে শুধু যারা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতো অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতো শুধু তাদেরকেই নাগরিক' বলা হতো। নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হতো পৌরনীতিতে। সুতরাং শব্দগত বা মূলগত অর্থে পৌরনীতির অর্থ ছিল অনেকটা সীমিত ও সংকীর্ণ।

কিন্তু বর্তমানে পৌরনীতিকে শুধুমাত্র শব্দগত অর্থে আলোচনা করা হয় না। কেননা, আধুনিক রাষ্ট্রগুলো প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্র' (City state) নয়, বরং এগুলো এখন জাতি রাষ্ট্র' (Nation state)। প্রাচীন গ্রিক নগর-রাষ্ট্রগুলো অপেক্ষা আধুনিক জাতি রাষ্ট্রগুলো আয়তনে যেমন বিশাল, জনসংখ্যা তেমনি বিপুল। এসব জাতি রাষ্ট্রে নাগরিকদের জীবন এবং কার্যাবলি বহুমুখী ও জটিল। আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের আচরণ, কার্যাবলি এবং তাদের বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারাবাহিক পর্যালোচনার মাধ্যমে যে শাস্ত্র আদর্শ নাগরিক জীবনের ইঙ্গিত দান করে, তাই হলো সিভিক্স বা পৌরনীতি'। পৌরনীতি মূলত সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

এফ. আই. গ্রাউড (F. I. Gloud)-এর মতে, “যে সকল প্রতিষ্ঠান, অভ্যাস, কার্যাবলি ও চেতনার দ্বারা মানুষ রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন এবং অধিকার ভোগ করতে পারে, তার অধ্যয়নই হচ্ছে পৌরনীতি।" ("Civics is the study of institutions, habits, activities and spirit by means of which a man or woman may fulfil the duties and receive benefits of membership in a political community”.)

ই. এম. হোয়াইট (E. M. white)-এর মতে, “নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল প্রশ্ন সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাই পৌরনীতি।" ("Civics is the subject that deals with everything appertaining to citizenship.”)

ই. এম. হোয়াইট তার “The philosophy of citizenship” গ্রন্থে বলেছেন যে, “পৌরনীতি হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা, যা নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও মানবতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।" ("Civics is that branch of human knowledge which deals with everything relating to a citizen—past, present and future; local, national and human.")

সূচিপত্র

Webster's International Dictionary-তে পৌরনীতির সঙ্গা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "পৌরনীতি হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেই বিভাগ বা শাখা যা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে" (Civics is that department of political science dealing with rights and duties of citizen.) [১]

Encyclopaedia Britanica-তে পৌরনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "পৌরনীতিকে সামাজিক বিজ্ঞানের সেই শাখা বলে অভিহিত করা যায়, যেখানে সরকারের সংগঠন ও পদ্ধতি এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ আলোচনা করা হয়।" [২]

১. S. Webster's International Dictionary (Second Edition) July ২, ১৯৩৪, Page ৪৯২.
২. s. Encyclopaedia Britanica, Vol, ৫, Page ৭৩৪

ফ্রেডরিখ জেমস গুল্ড (Fredrick James Gould)-এর মতে, "পৌরনীতি হচ্ছে প্রতিষ্ঠান, আচরণ ও চেতনার অধ্যয়ন শাস্ত্র যার মাধ্যমে একজন পুরুষ বা নারী কর্তব্য পালন ও সুযোগ সুবিধা ভোগ সম্পর্কে জানতে পারে।" (Civis is the study of institutions, habits and spirits by means of which a man or woman may fulfil the duties and receive the benefits of memberships in political community.)

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, *নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত স্থানীয়, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের যে শাখা আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।* পৌরনীতি নাগরিক হিসেবে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা, মানুষের কার্যাবলি, অভ্যাস ও আচরণ বিশ্লেষণ এবং রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পর্যালোচনার আলোকে আদর্শ নাগরিক জীবনের শিক্ষা দান করে।

পৌরনীতির সংজ্ঞা থেকে এর যে অর্থ ও প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা নিমের চার্ট দ্বারা প্রকাশ করা হলো ঃ

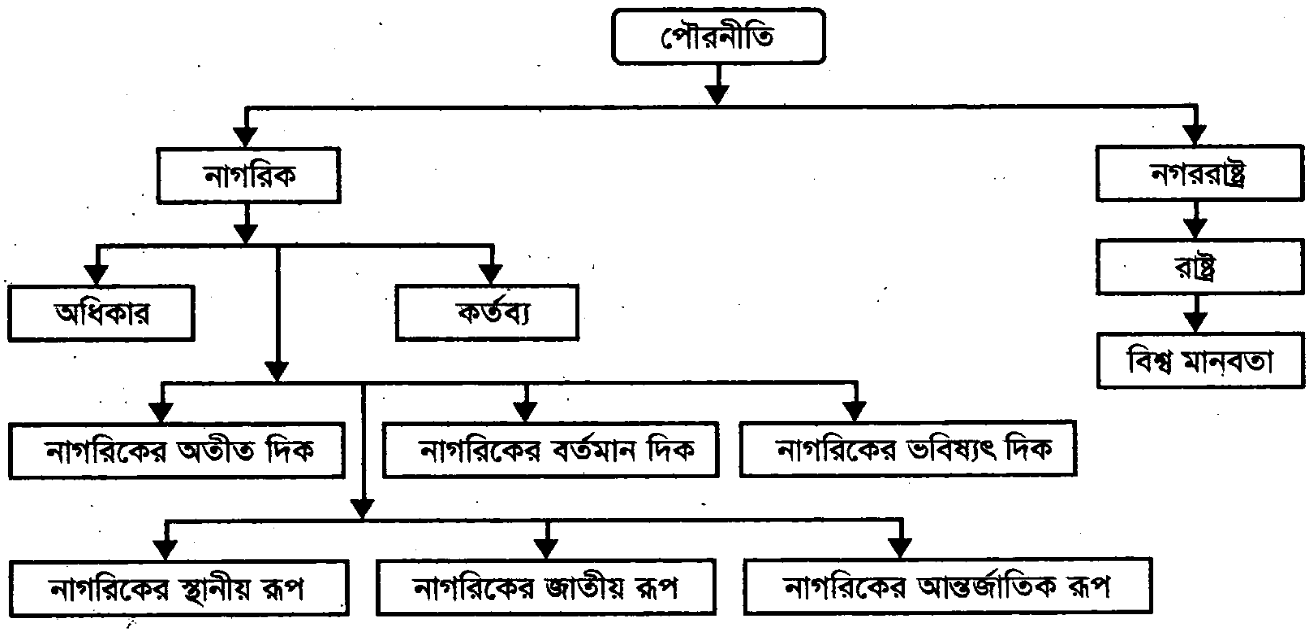

১.২ পৌরনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু

Scope and Subject-matter of Civics

পৌরনীতি মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলিই পৌরনীতির মুখ্য আলোচ্য বিষয়। পৌরনীতির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নাগরিকের জীবন ও কার্যাবলি যতদূর বিস্তৃত, অর্থাৎ কিছু নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে, পৌরনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধি ততদূর প্রসারিত।

পৌরনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু নিম্নের চিত্রের সাহায্যে এভাবে দেখানো যায়—

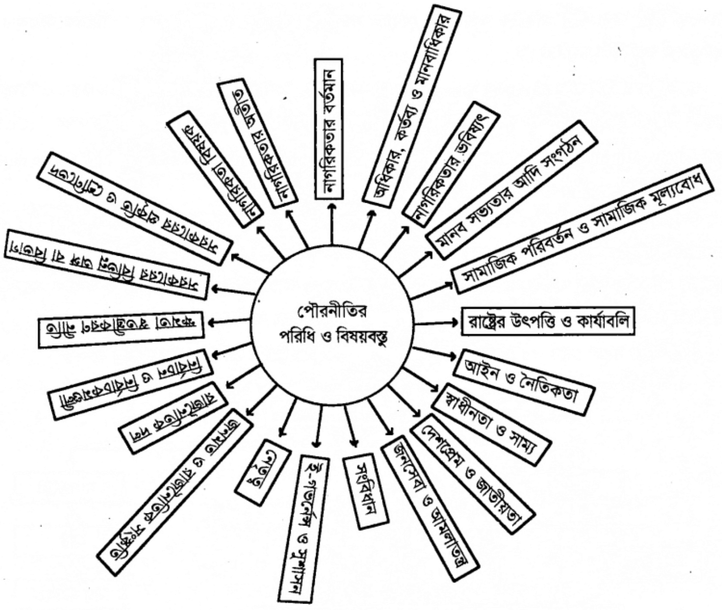

পৌরনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

১. নাগরিকতা বিষয়ক ঃ নাগরিকদের উত্তম এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি বা উদ্ভব হয়েছে। সুনাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, সচেতনতা প্রভৃতি গুণাবলি রাষ্ট্রকে মহীয়ান করে তোলে। নাগরিকতার অর্থ ও প্রকৃতি, নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপ, সুনাগরিকতা, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য বোধ প্রভৃতির অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে পৌরনীতি আলোচনা করে। এজন্য পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

২. মানবসভ্যতার আদি সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা ঃ মানবসভ্যতার বিকাশে আদি ও অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। এরিস্টটলের মতে পরিবার হলো রাষ্ট্রের আদি রূপ। সময়ের স্রোত বেয়ে বিবর্তনের ধারায় পরিবারের সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং গড়ে ওঠেছে রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। পৌরনীতি তাই পরিবারের বর্তমান ও অতীত রূপ এবং কার্যাবলি; সমাজের বিকাশ, সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি ও কারণসমূহ, সামাজিক মূল্যবোধ; রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উৎপত্তির ইতিহাস এবং বিকাশের ধারা প্রভৃতি দিক সম্পর্কে আলোচনা করে।

৩. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা ঃ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উৎপত্তির ইতিহাস, রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ, সংবিধানের প্রকৃতি ও শ্রেণিভেদ, সরকারের প্রকৃতি ও শ্রেণিভেদ, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ বা বিভাগের প্রকৃতি, সংগঠন ও কার্যাবলি, নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলী, রাজনৈতিক দল, জনমত প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন সম্পর্কে পৌরনীতি আলোচনা করে।

৪. রাজনৈতিক তত্ত্ব ঃ পৌরনীতি রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করে। পৌরনীতিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের কার্যাবলি সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব বা মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

৫. সামাজিক ও রাজনৈতিক বিমূর্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা ঃ আইনের প্রকৃতি, সংজ্ঞা, উৎস, প্রয়োজনীয়তা এবং নৈতিকতার সাথে এর সম্পর্ক স্বাধীনতার প্রকৃতি, সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, রক্ষাকবচ এবং আইনের

সাথে এর সম্পর্ক; সাম্যের প্রকৃতি, প্রকারভেদ এবং স্বাধীনতার সাথে এর সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে পৌরনীতি আলোচনা করে।

৬. নাগরিকতার স্থানীয় দিক সম্পর্কে আলোচনা ঃ একজন আদর্শ নাগরিক ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সাথেও সংশ্লিষ্ট থাকে। এসব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রকৃতি, সংগঠন, কার্যাবলি এবং বিকাশ সম্পর্কে পৌরনীতি আলোচনা করে।

৭. নাগরিকতার জাতীয় দিক সম্পর্কে আলোচনা ঃ নাগরিকদের জাতীয় বিষয় অর্থাৎ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ধাপে ধাপে বিভিন্ন নেতার অবদান, জাতীয় রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ, শাসনতান্ত্রিক সমস্যা ও অগ্রগতি সম্পর্কে পৌরনীতি আলোচনা করে থাকে।

৮. নাগরিকতার আন্তর্জাতিক রূপ সম্পর্কে আলোচনা ঃ নাগরিক জীবন আজ স্থানীয় ও জাতীয় গণ্ডির সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই বর্তমানে প্রতিবেশী ও দূরের সকল রাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে বিশ্ব-শান্তি ও বন্ধুত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্যই মানুষ আজ গড়ে তুলেছে জাতিসংঘসহ অন্যান্য বহু আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। পৌরনীতি তাই জাতিসংঘসহ অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, বিকাশ, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করে ।

৯. নাগরিকতার অতীত নিয়ে আলোচনা ঃ পৌরনীতি নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের অতীত ইতিহাস ও গঠন কাঠামো ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে।

১০. নাগরিকতার বর্তমান নিয়ে আলোচনা ঃ পৌরনীতি নাগরিকতার বিশেষ করে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের বর্তমান রূপ সম্পর্কে আলোচনা করে ।

১১. নাগরিকতার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা ঃ নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদির অতীত ও বর্তমান রূপ আলোচনার আলোকে এর ভবিষ্যৎ রূপ ও কার্যাবলি কিরূপ হবে বা হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও পৌরনীতি ইঙ্গিত প্রদান করে থাকে।

১২. রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা ঃ পৌরনীতি একটি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা নিয়েও আলোচনা করে। বাংলাদেশের পৌরনীতিতে পলাশীর যুদ্ধ, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, লাহোর প্রস্তাব, ভাষা আন্দোলন, বাঙালির প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনা, ৬ দফা, স্বাধীনতা যুদ্ধ ইত্যাদি রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

১৩. সাংবিধানিক অগ্রগতিবিষয়ক আলোচনা ঃ পৌরনীতি সাংবিধানিক অগ্রগতি বা বিকাশ ধারা নিয়েও আলোচনা করে। পৌরনীতিতে ব্রিটিশ শাসনামল ও পাকিস্তান শাসনামলে সাংবিধানিক বিকাশ ও অগ্রগতি, স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া, সংবিধানের বিভিন্ন দিক বা ধারাসমূহ, জাতীয় সংসদের নির্বাচনসমূহের ফলাফল এবং বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালনকারী সরকার বা মন্ত্রিসভার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, পৌরনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিস্তৃত। নাগরিকের জীবন ও কার্যাবলি যতদূর বিস্তৃত অর্থাৎ যা কিছু নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে, পৌরনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধিও ততদূর বিস্তৃত।

১.৩ পৌরনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

Necessity of Study of Civics

পৌরনীতি পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। যা কিছু নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে, তার প্রায় সকল দিক নিয়েই পৌরনীতি আলোচনা করে। পৌরনীতি হচ্ছে জ্ঞানের মূল্যবান শাখা। পৌরনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপঃ

১. পৌরনীতি সুস্থ ও সুন্দর সমাজজীবন গঠনের শিক্ষা দান করে ঃ ইতিহাস যেমন মানুষের অতীত ও বর্তমান নিয়ে আলোচনা করে এবং ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করে; অর্থনীতি যেমন মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সমস্যা এবং জীবনের মানোন্নয়নের উপায় সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে; পৌরনীতি তেমনি গড়ে ওঠেছে মানুষের

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে। কীভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা সুস্থ ও সুন্দর সমাজজীবন গঠন করা যায়, জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা যায়; সে সম্পর্কে পৌরনীতি আলোচনা করে।

২. পৌরনীতি নাগরিকতা সম্পর্কীয় জ্ঞান দান করে ঃ পৌরনীতি পাঠের ফলে সুদূর অতীতে কীভাবে নাগরিক জীবনের সূত্রপাত হলো, তখন নাগরিকতার স্বরূপ কী ছিল; আধুনিক যুগে নাগরিকতা বলতে কী বোঝায়, কীভাবে তা অর্জিত হয় এবং বিলুপ্তি ঘটে—নাগরিকতা সম্পর্কিত এরূপ বিভিন্ন দিক জানা যায়।

৩. পৌরনীতি সুনাগরিকতার শিক্ষা দান করে ঃ পৌরনীতি পাঠের ফলে নাগরিকগণ বুদ্ধিমান, আত্মসংযমী, বিবেকবান, নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠে। পৌরনীতির জ্ঞান মানুষকে সুসভ্য ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৪. পৌরনীতি নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি উদার করে ঃ সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ নির্ভর করে নাগরিকের স্বচ্ছ, উদার ও সুষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। পৌরনীতি পাঠে মানুষের মনের গোড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, সংকীর্ণতা, দীনতা, কুসংস্কার, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দূর হয় এবং দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও প্রসারিত হয়।

৫. বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের অতীত জানতে সাহায্য করে ঃ পৌরনীতি অধ্যয়ন করে মানুষ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে, সার্বভৌমত্ব, আইন, স্বাধীনতা, সাম্য প্রভৃতির উৎপত্তি বা অতীত ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। অতীতে এ সকল প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের প্রকৃতি কীরূপ ছিল তা না জানলে ভবিষ্যতে এগুলোর সাংগঠনিক রূপ কীরূপ হওয়া উচিত তা অনুমান বা কল্পনা করা সম্ভব নয়।

৬. বিভিন্ন সংগঠনের বর্তমান অবস্থা জানতে সাহায্য করে ঃ পৌরনীতি পাঠ করলে কোন দেশের জন্য কীরূপ সংবিধান ও সরকার উপযোগী, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রকৃতি ও কার্যাবলি; নির্বাচকমণ্ডলীর প্রকৃতি ও গুরুত্ব; জনমতের প্রকৃতি, গুরুত্ব ও জনমত গঠনের মাধ্যমসমূহ রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি, কার্যাবলি ও গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

৭. পৌরনীতি নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি করে ঃ পৌরনীতি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর অতীত ও বর্তমান, এগুলোর বর্তমান প্রকৃতি, কার্যাবলি ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে। এর ফলে এই শাস্ত্র পাঠে মানুষের রাজনৈতিক জ্ঞান ও নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।

৮. পৌরনীতি নাগরিককে অধিকার সচেতন করে ঃ মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার একান্ত প্রয়োজন। পৌরনীতি পাঠের ফলে নাগরিকগণ তাদের এসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন হতে পারে।

৯. পৌরনীতি নাগরিকের কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে ঃ অধিকারের ধারণার মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত থাকে। প্রত্যেক নাগরিককে তার কর্তব্য কী কী, কেন কর্তব্য পালন করতে হয়, অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক কী—এসব সম্পর্কে জানতে হয়। পৌরনীতি এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং ব্যক্তিকে অধিকার উপভোগের পাশাপাশি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করে।

১০. পৌরনীতি নাগরিকের গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি করে ঃ গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা হলেও তা বাস্তবায়ন করা কষ্টকর। পৌরনীতি গণতন্ত্রের প্রকৃতি, প্রকারভেদ, দোষ-গুণ, এর সফলতার শর্তাবলি সম্পর্কে আলোচনা করে। এর ফলে জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।

১১. পৌরনীতি আন্তর্জাতিক দিগন্ত উন্মোচন করে ঃ বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী, কাছাকাছি হচ্ছে বিশ্বের মানুষ। মানুষ আজ জাতিসংঘের মতো অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে তুলেছে। এই আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃতি, সংগঠন, কার্যাবলি, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদি সম্পর্কে পৌরনীতি আলোচনা করে থাকে। ফলে এসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে মানুষের আচরণ ও কার্যাবলি কীরূপ হওয়া উচিত তা জানতে পৌরনীতি সাহায্য করে।

১২. পৌরনীতি ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে ঃ পৌরনীতি অধ্যয়নের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উৎপত্তি, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি, নাগরিকতা, অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ভবিষ্যতে এগুলো কীরূপ পরিগ্রহ করবে বা করা উচিত, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হবে এবং ভবিষ্যতে তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

১৩. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন ঃ অতীতে দু' দুটি বিশ্বযুদ্ধ কীভাবে বিশ্বশান্তি বিনষ্ট করেছে। বিশ্বের শান্তিকামী নেতাগণ কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, জাতিসংঘ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তুলেছে, আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তুলেছে এবং এসব সংগঠন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা পালন করছে, পৌরনীতি পাঠ করে তা জানা যায়।

১৪. দেশপ্রেম বৃদ্ধির শিক্ষা ঃ পৌরনীতি পাঠ করার ফলে নাগরিকদের দেশপ্রেম বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একজন নাগরিক প্রয়োজনে জীবন দান করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

১৫. সুযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার শিক্ষা ঃ নেতৃত্ব কী, কীভাবে নেতৃত্ব লাভ করা যায়, নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণাবলি কী কী, নেতৃত্ব অর্জনে সমস্যা কী কী, কীভাবে সেসব সমস্যা দূর করা যায়, এসব বিষয় নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে থাকে। ফলে পৌরনীতির জ্ঞান সুযোগ্য নেতৃত্ব বিকাশে সাহায্য করে থাকে। সুতরাং ওপরের আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় যে, পৌরনীতি অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্দর ব্যক্তিজীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলতে হলে সুনাগরিকতার শিক্ষা অর্জন করতে হলে পৌরনীতির জ্ঞান অর্জন করা খুবই প্রয়োজনীয়।

১.৪ বাংলাদেশে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব

Significance of the Study of Civics and Good Governance in Bangladesh

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। নিম্নোক্ত কারণগুলোর জন্য বাংলাদেশে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম ঃ

১. দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা ঃ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অর্জন করা যত কঠিন তার থেকে স্বাধীনতা রক্ষা করা আরও বেশি কঠিন। আমাদের কষ্টার্জিত এই স্বাধীনতাকে রক্ষা ও অর্থবহ করার জন্য প্রয়োজন স্বদেশপ্রেম। পৌরনীতি ও সুশাসনের শিক্ষা দেশকে ভালোবাসতে শেখায়।

২. জাতীয় ইতিহাস জানা ঃ আমাদের রয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এ ইতিহাস আমাদের বংশধরদেরকে জানতে হবে। কেননা যে জাতি নিজস্ব জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস জানে না কিংবা ভুলে যায়, সে জাতি কখনো উন্নত ও সুসংহত হতে পারে না। পৌরনীতি ও সুশাসন আমাদের জাতীয়, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস এবং স্বাধীনতা অর্জনের সঠিক ইতিহাস জানতে সাহায্য করে।

৩. জাতীয় সমস্যা ও এর সমাধানের পথনির্দেশ ঃ অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল সমস্ত নাগরিকের নিকট উপভোগ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজন জাতীয় সংহতি অর্জন এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের সংকটসমূহ কাটিয়ে ওঠা। পৌরনীতি ও সুশাসন জাতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করে।

৪. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ঃ প্রত্যেক জাতি ও রাষ্ট্রেরই কতগুলো জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থাকে। আমাদের সংবিধানে চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি রয়েছে। এগুলো হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। এগুলো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। এ মূলনীতিগুলো হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি। পৌরনীতি ও সুশাসন এসব রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।

৫. রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন বাংলাদেশি নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। পৌরনীতির শিক্ষা আমাদেরকে সোনার বাংলার সোনার মানুষ হবার শিক্ষা দেয়।

৬. সুনাগরিকতার শিক্ষালাভ ঃ সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন ও পরিচালনা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন মেধা, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সচেতন সুনাগরিক। পৌরনীতি ও সুশাসনের শিক্ষা এরূপ সচেতন ও সুনাগরিক হতে সাহায্য করে।

৭. গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টি ঃ গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। জনগণ সচেতন হলে, অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হলে, সহনশীল হলে গণতন্ত্র সফল হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন আমাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৮. সংবিধান সম্পর্কে জানা যায় ঃ আমাদের সংবিধান প্রণীত হয়েছে ১৯৭২ সালে। আমাদের রাষ্ট্রপরিচালনার বিধি-বিধান এই সংবিধানে লেখা রয়েছে। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে আমরা আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার বিধিবিধান, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে জানতে পারি।

৯. উদার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের ফলে বাংলাদেশের নাগরিকগণ অন্ধ, গোড়ামি ও সংকীর্ণতা ত্যাগ করে উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকার হতে পারে।

১০. সঠিক ইতিহাস জানতে সাহায্য ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃত ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে হলে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করতে হবে।

১১. সুশাসন প্রতিষ্ঠা ঃ পৌরনীতির জ্ঞান সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। সুশাসন কী, সুশাসনের বৈশিষ্ট্য কী কী, কীভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়, কীভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বাধাগুলো অপসারণ করা যায় তা পৌরনীতি পাঠের ফলে জনা যায়। সুতরাং সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকেরই উচিত পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা।

১.৫ সুশাসনের ধারণা ও সংজ্ঞা

Concept and Definition of Good Governance

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র মানব সভ্যতার বিবর্তনের ফসল। যুগের পর যুগ ও বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদানের সমন্বয়ে এসবের উদ্ভব ঘটেছে। এসব সংগঠন গড়ে উঠেছে মানব জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য। এ সকল সংগঠনের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য একসময় শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আদিতে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসন প্রবর্তনের মূল লক্ষ্য ছিল জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা মনুসংহিতায় লক্ষ্য করা যায় যে, রাজা প্রজাদের নিকট থেকে উৎপন্ন ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজস্ব আদায় করতো। এর বিনিময়ে রাজা প্রজাদের নিরাপত্ত বিধান করতো। প্লেটা ো, এরিস্টটল, ইবনে খালদুন প্রমুখ দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বিশ্বাস করতেন যে, উত্তম জীবন গড়ে তোলার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব (The State exists to Promote good life) I

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটলে রাষ্ট্রের কার্যাবলি ও দায়-দায়িত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যা ও জটিলতা বৃদ্ধি পেলে তা নিরসনকল্পে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতেও জনকল্যাণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে থাকে। বৃদ্ধি পেতে থাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের (Welfare state) “Roll o (of আধুনিক রাষ্ট্র জনগণের বন্ধু, দার্শনিক ও পরিচালকে (Friend, Philosopher and Guide) পরিণত হয়। বর্তমানে জনকল্যাণই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হয়। এজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে সুশাসনের। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে তথ্যের সহজলভ্যতার পাশাপাশি জনগণের সচেতনতা ও দক্ষ, জনকল্যাণকর শাসন অর্থাৎ সুশাসনের প্রয়োজনীয়তাকে আবশ্যকীয় করে তুলেছে।

Good Governance বা সুশাসন সম্পর্কে আলোচনার আগে জানা প্রয়োজন শাসনের ব্যবস্থা’ বা Governance বলতে কী বোঝায়। গভর্নেন্স একটি বহুমাত্রিক ধারণা যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, ক্ষেত্র এবং প্রেক্ষাপট থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ কারণে তাত্বিকদের মধ্যে গভর্নেন্স বিষয়ে সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

গভর্নেন্সকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শাসনের ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। ল্যান্ডেল মিলস এবং সেরাজেন্ডিন ‘(Landell Mills and seragedino মতে, জনগণ কীভাবে শাসিত হয়, কীভাবে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালিত হয়, কীভাবে দেশের রাজনীতি আবর্তিত হয় এবং একই সাথে এ সকল প্রক্রিয়া কীভাবে লোকপ্রশাসন ও আইনের সাথে সম্পর্কিত সে বিষয়কেই গভর্নেন্স বলে।

The Oxford English Dictionary-Go to of FI, শাসনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হিসেবে গভর্নেসকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৯৯৪ সালে বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতিই হলো গভর্নেন্স।

হলিফ্যানি (Halfani) ও অন্যান্য গবেষকগণ সহমত পোষণ করে বলেন যে, ‘গভর্নেন্স হলো সরকারের এমন এক ব্যবস্থা যার লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত থাকে রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের মধ্যে বৈধ সম্পর্ক ও উন্মুক্ত যোগাযোগ

নিশ্চিত করা এবং সে সাথে কার্যকরী ও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, নির্বাচনি প্রক্রিয়া স্থাপন এবং প্রতিনিধিত্বকারী দায়িত্বশীল সরকারি কাঠামোকে ক্রিয়াশীলকরণ।

ডি. কউফম্যান ও অন্যরা (D. Kaufmann & others) মনে করেন যে, "যে প্রক্রিয়ায় শাসকবর্গ নির্বাচিত হন, জবাবদিহি করেন, নিরীক্ষিত ও পরিবর্তিত হন; সম্পদের ব্যবস্থাপনায় সরকারি দক্ষতা এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্ধারিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা বিবেচিত হয় তাকেই গভর্নেন্স বলে।'

'গভর্নেন্স প্রপঞ্চটির সাথে সু' প্রত্যয় যোগ করে সুশাসন' (Good Governance) শব্দটির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। এর ফলে গভর্নেন্স'-এর নরমেটিভ উপাদানের প্রকাশ ঘটেছে। এর ফলে সুশাসনের অর্থ দাড়িয়েছে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন। ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক প্রকাশ করে যে, সুষ্ঠ গভর্নেল বা সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। এ চারটি স্তম্ভ হলো-১, দায়িত্বশীলতা ২ স্বচ্ছতা ত আইনি কাঠামো ও ৫. অংশগ্রহণ।

সুশাসনকে একক কোনো ধারণার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত বা বিশ্লেষণ করা যায় না। কেননা সুশাসনের ধারণাটি হলো বিহুমাত্রিক বিভিন্ন তাত্বিক, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থা সুশাসন ধারণাটির সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সুশাসন ধারণাটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। একটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বব্যাংক সর্বপ্রথম উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে সুশাসন ধারণাটিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। এতে উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়ন চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে, সুশাসনের অভাবেই এরূপ অনুন্নয়ন ঘটেছে। শুধু তাই নয়, সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তা পূরণের শর্তে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ঋণ সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এখন দেখা যাক কে, কীভাবে সুশাসন' বা 'Good Governance-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। জি. বিলনে (G. Bilney)-এর মতে, "Good Governance is the effective management of a country's Social and economic resources in a manner that is open, transparent, accountable and equitable) I

মারটিন মিনোগের মতে, "বৃহৎ অর্থে সুশাসন হচ্ছে কতিপয় উদ্যোগের সমাহার ও একটি সংস্কার কৌশল যা সরকারকে আরো বেশি গণতান্ত্রিক, মুক্তমনা, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য সুশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করে তোলে।"

The Social Encyclopaedia তে সুশাসন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "এটি সরকার পরিচালনা অপেক্ষা একটি বিস্তৃত ধারণা যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।" (It is abroader concept than Government, which is specially concerned with the role of Political authorities in maintaining social order within a defined territory and the exercise of executive power)

সুশাসন সম্পর্কে একটি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন **ম্যাককরনী** (MacCorney)। তার মতে সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়।" (Good governance is the relationship between civil society and the state, between government and governed, the ruler and ruled)

সবশেষে বলা যায় যে, প্রশাসনের যদি জবাবদিহিতা (Accountability), বৈধতা (Legitimacy), ool (Transparency) থাকে, এতে যদি অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, বাক স্বাধীনতাসহ সকল রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন, আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা থাকে তাহলে সে শাসনকে সুশাসন বলে।

১.৬ সুশাসনের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য

Elements & Characteristics of Good Governance

জি. বিলনে (G. Bilney), OCED এবংUNDP সুশাসনের বেশ কিছু আদর্শ ও কার্যকরী বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেJ করেছে, এগুলো নিম্নরূপঃ –

১: অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া (Participatory Process) ঃ অংশগ্রহণ বলতে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে জনগণের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনকে বোঝায়। এর অর্থ হলো রাজনৈতিক ও শাসন কাজে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ, নীতি প্রণয়নে নাগরিকের সম্পৃক্ততা, তথ্য, মত ও পরামর্শমূলক কাজে জনগণের অংশীদারিত্ব, রাষ্ট্রীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যৌথ উদ্যোগ, যৌথ পরিকল্পনা এবং জনগণের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ। রাষ্ট্রে ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ সুশাসনকে গতিশীলতা দান করে।

২. নৈতিক মূল্যবোধ (Ethics or moral values) ঃ আইন অপেক্ষা নৈতিকতার সীমানা অনেক বেশি প্রসারিত। নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা শাসন কাজ পরিচালনা করা হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী ব্যক্তিবর্গের নৈতিক চরিত্রের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. স্বচ্ছতা (Transparency) ঃ স্বচ্ছতার অর্থ পরিষ্কার, স্পষ্ট । দ্বৈত অর্থবোধতার অনুপস্থিতিই হলো স্বচ্ছতা। শাসন ব্যবস্থার আইন কানুন, নীতি বা সিদ্ধান্ত যদি স্পষ্ট, পরিষ্কার বা স্বচ্ছ হয়, যদি এর একাধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ না থাকে তাহলে তা সহজেই জনগণের বোধগম্য হয়। শাসক-শাসিতের মধ্যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও তা পালনকারীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকে না। নীতি বা সিদ্ধান্ত স্বচ্ছ হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তবে স্বচ্ছতার জন্য চাই দায়িত্বশীলতা এবং দুনীতি দূর বা প্রতিরোধ করা।

৪. বৈধতা (Legitimacy) ঃ সরকারের বৈধতা, সরকারের গৃহীত নীতি বা সিদ্ধান্তের বৈধতা, প্রণীত আইনের বৈধতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যকীয় উপাদান। এজন্যই অনির্বাচিত, অগণতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী বা সামরিক শাসনকে - কেউ সুশাসন বলে না। কেননা তারা বৈধ শাসক নয়, তাদের গৃহীত নীতি বা সিদ্ধান্ত, প্রণীত আইন বা সামরিক বিধির বৈধতা থাকে না। বৈধতাকে তাই সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলা হয়।

৫. দায়িত্বশীলতা (Responsibility) ঃ সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো দায়িত্বশীলতা। এর অর্থ হলো সরকার ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কর্মকাণ্ডের দায়িত্বশীলতা। সরকারের শাসন বিভাগ তাদের নীতি-সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে। এভাবে পরোক্ষভাবে শাসন কর্তৃপক্ষ জনগণের নিকটই দায়ী থাকে। কেননা আইন বিভাগের সদস্যগণ জনগণেরই নির্বাচিত প্রতিনিধি ।

৬. আইনের শাসন (Rule of Law) ঃ সুশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন আইনের শাসন বিদ্যমান থাকে। আইনের শাসনের মূলকথাই হলো- (ক) আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, (খ) সকলেরই আইনের আশ্রয় লাভের সুযোগ, (গ) শুনানী ব্যতীত কারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। আইন হতে হবে সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। এছাড়াও আইনের শাসনের জন্য প্রয়োজন সরকারের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, রাষ্ট্রের নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ।

৭. দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা (Accountibility) ঃ একটি রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ যেমন তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে তেমনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থিত সংগঠন পরিচালনার জন্যও এর পরিচালকদের দায়বদ্ধ থাকতে হয়, জবাবদিহি করতে হয়। এই দায়বদ্ধতার রয়েছে দুটি দিক, (ক) রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ও (খ) প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা। নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করে নির্বাচকদের ম্যান্ডেট লাভ এবং তা বাস্তবায়নে রাজনীতিবিদগণ যে অঙ্গীকার ঘোষণা করেন, তাকে বলে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা। তেমনি প্রশাসনিক । কাজকর্মের জন্যও প্রশাসকদের বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারীদের দায়বদ্ধ থাকতে হয়। দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা গেলে শাসনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, অর্পিত দায়িত্ব দ্রুত সম্পন্ন হয়, দুনীতিহাস পায় এবং লক্ষ্য অর্জিত হয়।

৮. দক্ষতা (Efficiency) ঃ দক্ষতার অর্থ হলো প্রাপ্ত সম্পদের ও উপকরণের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা অর্জন। অবাধ তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান, দুনীতি বিরোধী মনোভাব, কর্তব্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, কাজের আগ্রহ, কাজে ফাকি দেয়ার অভ্যাস বা বিলম্বে যোগ দেয়ার বদঅভ্যাস পরিত্যাগ, সততা ইত্যাদি বজায় থাকলে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯. জনপ্রশাসনের সেবাধর্মী মনোভাবঃ (Service oriented attitude of Public administration) প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, জনকল্যাণের জন্যই প্রশাসন গড়ে উঠেছে। তারা জনগণের

সূচিপত্র

সেবক, প্রভু নন। জনসেবার জন্যই প্রশাসনের জন্ম হয়েছে, প্রশাসন চলে জনগণের অর্থে—এ উপলব্ধিই সুশাসনের পথকে প্রশস্ত করে।

১০. স্বাধীন বিচার বিভাগ (Independent Judiciary)ঃ তৃতীয় স্তম্ভ হলো বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগের লক্ষ্য হলো ন্যায়বিচার নিশ্চিত বা প্রতিষ্ঠা করা। বিচার বিভাগ যদি সরকারের অন্য দুটি বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকে, বিচারকগণ যদি সৎ, দক্ষ, নিরপেক্ষ ও উচ্চ নৈতিক গুণাবলির অধিকারী হন, ভয়ভীতি বা প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার না করেন তাহলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচার বিভাগই আইনের শাসনের প্রকৃত অভিভাবক ও রক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ৰলা চলে।

১১: সততা (Honesty) ঃ সুশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই সৎ হন। ব্যক্তিস্বার্থ, ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থালস্া, বিলাসী জীবনের প্রতি আগ্রহ মানুষকে অসৎ করে তোলে। কাজেই এগুলো পরিহার করতে পারলে তা সুপ্রশাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

১২. লিঙ্গ বৈষম্যের অনুপস্থিতি (Absence of Gender disparity) ঃ সুপ্রশাসনে লিঙ্গ বৈষম্য করা হয় না। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিই প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ পান এবং পুরস্কৃত হন বা পদোন্নতি পান।

১৩. বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation)ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রীকরণের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে ক্ষমতার বন্টন ও বিভক্তিকরণের নীতি। এর অর্থ হলো ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্বকে প্রশাসনের উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তরে ছড়িয়ে দেয়া। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে জনসচেতনতাও বৃদ্ধি পায়, প্রশাসনের মূল্যবান সময় বেঁচে যায়, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোবল ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এজন্যই বিকেন্দ্রীকরণকে সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়।

১৪. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঃ শক্তিশালী, মর্যাদাসম্পন্ন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হলে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন করা যায়। এরফলে প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় এবং দক্ষ নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

১৫. সুশীল সমাজ (Civil society) ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সুশীল সমাজের ভূমিকাকে বর্তমানে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সুশীল সমাজ নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তার সমাধান খোজার চেষ্টা করেন। সুশীল সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ প্রেস, রেডিও, টিভি মাধ্যম, বিভিন্ন সামাজিক, আর্থিক,সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে বা মুখপাত্র হিসেবে যে বক্তব্য প্রকাশ করে থাকেন তা সুষ্ঠু জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৬. জন গ্রহণযোগ্যতা (Public Acceptability) ঃ সুপ্রশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন তা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হয় বা সচেষ্ট হয়। জনগণের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোনো শাসনকে তাই সুশাসন বলা যায় না ।

১৭. পেশাদারিত্ব (Professionalism)ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পেশাদারী দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য তাদের প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি পেলে প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। "

১৮. মর্যাদা ও বিশ্বাস অর্জন ঃ প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজকর্ম, দক্ষতা ও যোগ্যতা দ্বারা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং জনগণের নিকট নিজেদেরকে মর্যাদাসম্পন্ন ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে।

১৯. প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা (Free Media) ঃ প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকলে সুষ্ঠু জনমত গড়ে ওঠে না। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে, সুশাসনের পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে তাই প্রচার মাধ্যম হবে স্বাধীন ও সরকারের অপ্রয়াজেনীয় হস্তক্ষেপ মুক্ত।

২০. মুক্ত এবং বহুত্বভিত্তিক সমাজ (Free and Plural society) ঃ সমাজের গঠন কাঠামো যদি স্বাধীন ও মুক্ত হয় এবং এর প্রকৃতি যদি বহুত্বভিত্তিক হয় তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়। কৃত্রিমভাবে সমাজ নির্মাণ বা সমাজ কাঠামোতে কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়া সুশাসনকে বাধাগ্রস্ত করে। -

১.৭ পৌরনীতি ও সুশাসনের ক্রমবিকাশ

মানুষ সামাজিক জীব। স্নেহ ও ভালোবাসার প্রত্যাশী মানুষ সঙ্গপ্রিয়তার জন্যই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে চায়। সমাজ ছাড়া সে বাস করতে পারে না। সুদূর অতীতে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে কতগুলো নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত কতগুলো বিধি-বিধান বা নিয়ম-কানুন। অবশ্য প্রাচীন গ্রিসে যারা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করত শুধু তাদেরকেই বলা হতো নাগরিক। আর নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে জ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হতো তাকে বলা হতো পৌরনীতি। সমসাময়িক ভারতবর্ষে নগরকে বলা হতো পুর' বা 'পুরী এবং এর অধিবাসীদের বলা হতো, পুরবাসী । তাদের নাগরিক জীবনকে বলা হতো পৌরজীবন এবং নাগরিক জীবন সম্পর্কিত বিদ্যার নাম ছিল পৌরনীতি ।

সুদূর অতীতেও শাসকদের লক্ষ্য ছিল জনগণের কল্যাণসাধন। এরিস্টটলতো তার গুরু প্লেটোকে অনুসরণ করে সরকারের শ্রেণিবিভাগই করেছিলেন সরকারের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। প্রজা বা রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণে যে সরকার শাসন পরিচালনা করতো তাকে তিনি স্বাভাবিক সরকার' এবং প্রজাদের কল্যাণের কথা চিন্তা না করে যে সরকার ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বর্থ চরিতার্থ করার জন্য শাসন পরিচালনা করতো তাকে তিনি বিকৃত সরকার বলে অভিহিত করেছিলেন। এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের প্রধানতম ও পবিত্রতম লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের জন্য উন্নততর ও কল্যাণকর জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা, জ্ঞানের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা এবং নৈতিক উৎকর্ষতা সাধন করা। শুধু তাই নয় এরিস্টটল নিয়মতন্ত্রবাদ ও আইনের শাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও সেই প্রাচীন যুগেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। এমনকি তিনি সরকারের স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ করার জন্য সরকারের কাজকে আইন, শাসন ও বিচার—এ তিনভাগে বিভক্ত করার পরামর্শও প্রদান করেছিলেন। মূলত তার লক্ষ্য ছিল এমন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সেখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এককথায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্র আজ আর নেই। আধুনিক রাষ্ট্রগুলো হলো জাতি রাষ্ট্র (NationState) এবং এগুলো আয়তনে । যেমন বিশাল, তেমনি জনসংখ্যায়ও বিপুল। এসব জাতি রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন এবং কার্যাবলি বহুমুখী ও জটিল। আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের এই জটিল আচরণ, কার্যাবলি এবং তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞানের যে শাখা বর্তমানে আলোচনা করে তাই পৌরনীতি ।

আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ। এজন্য আধুনিক অধিকাংশ রাষ্ট্রকেই জনকল্যাণকর রাষ্ট্র (welfarestate) বলা হয়। বর্তমান, রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা। সুশাসন একদিনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুশাসকের ধারণাও একদিনে গড়ে ওঠেনি, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, বিকেন্দ্রীকরণ নীতি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ ও দাবি, প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ, জন অংশগ্রহণের দাবি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের দাবি আজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এর ফলে সুশাসন বিষয়টি আজ পৌরনীতিতে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে।

১.৮ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক

Relation of Civics and Good Governance with other branches of knowledge

পৌরনীতি ও সুশাসন হলো সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয় পৌরনীতির আলোচনার বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি অপর সামাজিক বিজ্ঞানগুলোও মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং সব সামাজিক বিজ্ঞানই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শুধু তাই নয়—দর্শন, মনোবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি নৈতিক বিজ্ঞানের সাথেও পৌরনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। জ্ঞানের এই মূল্যবান শাখাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

সূচিপত্র

১.৯ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান

Civics, Good Governance and Political Science

সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। সমাজবিজ্ঞানের এ গুরুত্বপূর্ণ শাখা দুটির সম্পর্ক সহোদর ভাইয়ের মতো।

সাদৃশ্য ঃ পৌরনীতি, সুশাসন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে নিম্নলিখিত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় ঃ

১. অর্থগত অভিন্নতা ঃ উৎপত্তিগত দিক থেকে পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রায় এক ও অভিন্ন। ল্যাটিন শব্দ 'Civis: ও 'Civitas' থেকে ইংরেজি Civics (পৌরনীতি) শব্দের উৎপত্তি। 'Civis' শব্দের অর্থ নাগরিক এবং Civitas শব্দের অর্থ নগররাষ্ট্র । Politics (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ Polites ও Polis থেকে। Polites'-এর অর্থ নাগরিক এবং Polis'-এর অর্থ হলো নগররাষ্ট্র'। সুতরাং বলা যায় যে, অর্থগত দিক থেকে জ্ঞানের উভয় শাখাই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং প্রায় অভিন্ন।

২. নিবিড় সম্পর্ক ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন হলো নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান হলো রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিজ্ঞান। পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান হলেও তা রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করে। কেননা প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের সভ্য এবং তার জীবনের বৃহত্তর অংশ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অপরদিকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিজ্ঞান হলেও নাগরিকতার বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা করে থাকে। কেননা, নাগরিকদেরকে নিয়েই রাষ্ট্র গঠিত। সুতরাং উভয়ের সম্পর্ক দেহ ও প্রাণের সম্পর্কতুল্য। উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ।

৩. আলোচ্য বিষয়ে মিল ঃ কিছু কিছু বিষয় উভয় শাস্ত্রই আলোচনা করে থাকে। নাগরিকতা ৰিষয়ক বিজ্ঞান হলেও পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্যসূচিতে রয়েছে সংবিধান, রাষ্ট্র, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সংঘ, সরকার, প্রশাসন, আইনকানুন, স্বাধীনতা, সাম্য, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়। অপরদিকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিজ্ঞান হলেও নাগরিকতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিয়েও আলোচনা করে থাকে।

পার্থক্য ঃ পৌরনীতি, সুশাসন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠই হোক না কেন, উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য লক্ষ করা যায় ঃ

১. পরিধি ও বিষয়বস্তুগত পার্থক্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন অপেক্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু বিস্তৃত ও ব্যাপক। অনেকেই এ জন্য পৌরনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ বলেও মনে করে থাকেন।

২. বিষয় নির্ধারণ ও গুরুত্বের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ এবং তার ওপর গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্রেও জ্ঞানের উভয় শাখার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলোর ওপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করে অন্য বিষয়গুলোর ওপর ততটা নয়। অপরদিকে, পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ওপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করে, রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ওপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করে না।

৩. দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ঃ পৌরনীতি, সুশাসন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য তা মূলত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান হওয়ায় সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যাগুলোকে নাগরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিজ্ঞান হওয়ায় ঐ একই সমস্যাগুলোকে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়।

৪. উৎপত্তিগত পার্থক্য ঃ পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics-এর উৎপত্তি ঘটেছে ল্যাটিন শব্দ Civis এবং civitas থেকে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ Political Science অথবা Politics শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে Polities ও polis থেকে।

সুতরাং বলা যায় যে, সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এ দুটি শাখার সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। উভয়ের সম্পর্ক দেহ ও প্রাণের সম্পর্ক তুল্য, যেন একে অপরের সহোদর। জ্ঞানের এ দুটি শাখা আসলে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক।

১.১০ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস

Civics, Good Governance and History

পৌরনীতি, সুশাসন ও ইতিহাস উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উভয়ের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

সাদৃশ্য ঃ পৌরনীতি, সুশাসন ও ইতিহাসের মধ্যে সাদৃশ্য নিম্নরূপঃ

১. ঘনিষ্ঠতা ঃ ইতিহাস মানবজাতির অতীতের স্মারকলিপি, সামগ্রিক জীবন-দর্পণ। অন্যদিকে পৌরনীতি ও সুশাসনের যে অংশ সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সম্পর্কিত সেসব ক্ষেত্রে ইতিহাসের সাথে তার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সুতরাং ইতিহাস ও পৌরনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ।

২. একে অপরকে পূর্ণতা প্রদান ঃ উভয় শাস্ত্রই পরস্পর পরস্পরকে পূর্ণতা প্রদান করেছে। ইতিহাস প্রদত্ত তথ্য দ্বারা পৌরনীতি যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে ঠিক তেমনি পৌরনীতির জ্ঞান দ্বারা ইতিহাসও সঞ্জীবিত হয়েছে।

৩. পারস্পরিক সহযোগিতা ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচিত বিষয়সমূহ যেমন- পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো অতীতে কীরূপ ছিল, কীভাবে তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে ইতিহাস পাঠ করলে তা জানা যায়। অপরদিকে ইতিহাসের একটি প্রধান অংশ হচ্ছে মানুষের সমাজ ও নাগরিক জীবনের ইতিহাস। মানুষের অতীত নাগরিক জীবনই বর্তমানে ইতিহাসে পরিণত হয়েছে এবং বর্তমানে নাগরিক জীবনই হয়তো অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট ইতিহাসে পরিণত হবে। ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার জন্য ফরাসি বিপ্লব, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রুশ বিপ্লব প্রভৃতি কখন, কীভাবে, কোন উদ্দেশ্যে এবং কোন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে সংঘটিত হয়েছে, ইতিহাস তা জানতে সাহায্য করে। এ জন্যই লর্ড এ্যাক্টন বলেছেন যে, “ইতিহাসের স্রোতধারায় বালুকারাশির মধ্যে স্বর্ণরেণুর মতো রাজনীতি বিজ্ঞান সঞ্চিত হয়ে ওঠেছে।"

৪. পারস্পরিক নির্ভরতা ঃ ঐতিহাসিক তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত যেমন পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা অসম্পূর্ণ, তেমনি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত না হলে ইতিহাসের আলোচনাও নিরর্থক হয়ে পড়ে। এ জন্যই অধ্যাপক সিলি বলেছেন যে, “ইতিহাস ব্যতীত পৌরনীতি ভিত্তিহীন এবং পৌরনীতি ব্যতীত ইতিহাস মূল্যহীন।”

পার্থক্য ঃ পৌরনীতি, সুশাসন ও ইতিহাসের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যও রয়েছে ঃ

১. বিষয়বস্তুগত ঃ পৌরনীতি, সুশাসন ও ইতিহাসের পার্থক্য মূলত বিষয়বস্তুগত। ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয় অপেক্ষা ব্যাপক। কেননা, প্রায় সব বিষয়েরই অতীত আলোচনা হলো ইতিহাসের বিষয়বস্তু। অপরদিকে পৌরনীতি ও সুশাসন শুধু নাগরিক জীবনকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোরই অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে।

২. অতীত ও ভবিষ্যতের ওপর গুরুত্ব ঃ ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় হলো অতীত সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দিকের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা। অপরদিকে পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় হলো নাগরিক জীবনের অতীত দিকগুলোর প্রতিচ্ছবি প্রদানের পর তার আলোকে ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের করণীয় নির্দেশ করা।

৩. পদ্ধতিগত ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের অনেক কিছুই তত্ত্ব ও অনুসন্ধানমূলক, কিন্তু ইতিহাসের প্রায় বিষয়ই বর্ণনামূলক ও তথ্যমূলক। তত্ত্ব, অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার প্রতি ইতিহাস খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করে না।

৪. পরিধিগতঃ ইতিহাস রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা প্রদানের পাশাপাশি ঐ সময়ের শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি প্রভৃতি বিষয় নিয়েও আলোচনা করে থাকে। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসন সাধারণত এসব বিষয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকে । .

পরিধি, পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অধ্যাপক গেটেলের সাথে একমত হয়ে বলা যায় যে, "ইতিহাস ও পৌরনীতি পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক।" একটি ব্যতীত অপরটির আলোচনা ভিত্তিহীন ও মূল্যহীন। উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়।

১.১১ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান

Civics, Good Governance and Sociology

পৌরনীতি, সুশাসন ও সমাজবিজ্ঞান উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উভয়ের মধ্যকার সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়।

সাদৃশ্য ঃ পৌরনীতি, সুশাসন ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য নিম্নরূপঃ

১. আলোচ্য বিষয়ে মিল ঃ পৌরনীতি, সুশাসন ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ে মিল রয়েছে। পরিবার, সমাজ, পরিবেশ, ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, সম্পত্তি, অপরাধ, অবকাশ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সমাজবিজ্ঞান ও পৌরনীতি আলোচনা করে থাকে ।

২. পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ঃ সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক আর পৌরনীতি ও সুশাসনের মূল আলোচ্য বিষয় হলো রাষ্ট্র ও নাগরিক। যেহেতু রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সেহেতু বলা যায় যে, উভয় শাস্ত্রই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

৩. একে অপরের পরিপূরক ঃ পৌরনীতি, সুশাসন ও সমাজবিজ্ঞান উভয়ই একে অপরের পরিপূরক। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র ও নাগরিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। অপরদিকে, সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে পৌরনীতি ও সুশাসনকে সমৃদ্ধ করে। এ জন্যই গেটেল বলেছেন যে, “রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এটা ধরে নেয়া হয় যে, মানুষ রাজনৈতিক জীব। কিন্তু মানুষ কীভাবে ও কেন রাজনৈতিক জীব—সমাজবিজ্ঞানে তার ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়।”

৪. একে অপরকে পরিপূর্ণতা দেয় ঃ সামাজিক পরিবেশে লালিত-পালিত হলেও পূর্ণতা অর্জনের জন্য মানুষের প্রয়োজন হয় রাজনৈতিক সংগঠনের। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ম-কানুন ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়। এ জন্যই এরিস্টটল বলেছেন যে, “মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব ।”

পার্থক্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে সমাজবিজ্ঞানের নিম্নলিখিত পার্থক্য রয়েছেঃ

১. জ্ঞানের দুটি ভিন্ন শাখা ঃ সামাজিক বিজ্ঞানের শাখাসমূহের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানই হলো মৌলিক বিষয়, পৌরনীতি ও সুশাসন হলো এর অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উভয় শাস্ত্রই হলো জ্ঞানের দুটি ভিন্ন শাখা।

২. বিষয়বস্তু ও পরিধির পার্থক্য ঃ সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি ব্যাপক এবং বিস্তৃত। কেননা সমাজের সকল দিক নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে। পক্ষান্তরে পৌরনীতি ও সুশাসনের বিষয়বস্তু ও পরিধি সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি থেকে সংকীর্ণতর। পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজের রাজনৈতিক দিকের ওপরই প্রধানত গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো রাষ্ট্র ও নাগরিকতা, যা সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান মাত্র ।

৩. পৌরনীতি শাখা, সমাজবিজ্ঞান সমগ্র ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন যেখানে শুধু রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞান সেখানে সমাজের সংগঠিত ও অসংগঠিত, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সব রকমের সংঘ, সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে থাকে। সুতরাং সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমগ্র এবং পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে এর একটি শাখামাত্র।

মানব জ্ঞানের এই উভয় শাখাই পরস্পর পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক। একজন সমাজবিজ্ঞানীকে যেমন পৌরনীতির জ্ঞান রাখতে হয়, তেমনি একজন পৌরবিজ্ঞানীকেও সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান রাখতে হয়। অধ্যাপক গিডিংস এ জন্যই বলেছেন যে, “যাদের সমাজবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো সম্পর্কে জ্ঞান নেই তাদেরকে রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া নিউটনের গতিতত্ত্বের জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিকে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেবার মতোই।” সুতরাং বলা যায় যে, পৌরনীতি ও সুশাসনের সমাজবিজ্ঞানের সাথে গভীর ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান।

সূচিপত্র

১.১২ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি

Civics, Good Governance and Economics

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি উভয়ই সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়।

সাদৃশ্য ; উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় ঃ

১. অভিন্ন লক্ষ্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির লক্ষ্য অনেকটা এক ও অভিন্ন। উভয়ের লক্ষ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা। পৌরনীতি ও সুশাসন হলো নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। কীভাবে নাগরিকতা অর্জন করা যায়, কীভাবে সুনাগরিক হওয়া যায়, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ কী কী ইত্যাদি বিষয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে থাকে। অপরদিকে অসীম অভাবের মাঝে সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করা যায় অর্থনীতি তারই শিক্ষা প্রদান করে। এই শিক্ষা না পেলে নাগরিক জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। ফলে কেউ সুনাগরিক হতে পারে না।

২. অভিন্ন আলোচ্যসূচি ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির আলোচ্যসূচিতে কতগুলো অভিন্ন বিষয় চোখে পড়ে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সমস্যার যেমন অর্থনৈতিক দিক রয়েছে, তেমনি প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক সমস্যারও রাজনৈতিক দিক রয়েছে। রাজনীতিবিদদের যেমন অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হয়, তেমনি অর্থনীতিবিদদেরও রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। সম্পদ, সম্পদের বন্টন, কর, উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্য, বাজেট, অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধান, সমাজসেবা, সমবায়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, জনসংখ্যা পরিস্থিতি ও জনসংখ্যা সমস্যা এবং তার সমাধান প্রভৃতি বিষয় তাই পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি সমান গুরুত্বসহকারে আলোচনা করে থাকে।

৩. পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ঃ আধুনিক রাষ্ট্রের অধিকাংশ কার্যাবলিই অর্থনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্র ও সরকারের সাফল্য নির্ভর করে অর্থনৈতিক সাফল্যের ওপর। অপরদিকে, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং পরিকল্পনাসমূহ রাষ্ট্র ও সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি পরস্পর নির্ভরশীল।

৪. পরস্পরের ওপর প্রভাব ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তারা রাজনৈতিক কার্যাবলির পাশাপাশি অর্থনৈতিক কার্যাবলিও পরিচালনা করে থাকেন। এজন্য তাদের অর্থনৈতিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অপরদিকে, অর্থনীতিবিদদেরও রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। কেননা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিকে লক্ষ রেখে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত না হলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৫. জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের জন্য উভয়ের প্রয়োজন ঃ আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা। অর্থনৈতিক কার্যাবলির অনেক দিকই বর্তমানে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে। কল্যাণকর রাষ্ট্রে পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি উভয় শাস্ত্র পাঠ করা তাই একান্ত প্রয়োজন।

৬. পরস্পর পরিপূরক ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক ও সহায়ক। মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন বিচ্ছিন্ন নয়, বরং তা একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক। একটির পরিবর্তন হলে অন্যটিরও পরিবর্তন হয়। এ জন্যই অধ্যাপক **ম্যাকাইভার** বলেছেন যে, "সকল শাসন পদ্ধতি তার অনুরূপ সম্পত্তি ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করে, একটিকে পরিবর্তন করলে অপরটিরও পরিবর্তন সাধিত হয়।"

পার্থক্য ঃ তবে পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য রয়েছেঃ

১. বিষয়বস্তুগত পার্থক্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের মূল আলোচ্য বিষয় হলো নাগরিকতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, আর অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

২. অনুশীলন পদ্ধতিগত পার্থক্য ঃ অর্থনীতির অনুশীলন পদ্ধতি প্রধানত গাণিতিক, কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনের অনুশীলন পদ্ধতি মূলত ঐতিহাসিক।

আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির মধ্যে প্রচুর মিল রয়েছে। উভয় শাস্ত্রের লক্ষ্য হলো উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং বলা যায় যে, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক। *উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়।*

১.১৩ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্র

Civics, Good Governance and Ethics

নাগরিকতা ও জাতীয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দিক নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি ও সুশাসন বলে। অপরদিকে মানুষের যাবতীয় কার্যাবলি এবং আচার-আচরণের ভালো-মন্দ নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে নীতিশাস্ত্র বলে। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

সাদৃশ্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্য নিম্নরূপঃ

১. উভয়ের লক্ষ্য এক ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য হলো এক এবং তা হলো আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা। প্লেটো ও এরিস্টটল রাষ্ট্রকে উত্তম জীবনযাপনের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সংগঠন বলে উল্লেখ করেছেন। পৌরনীতি ও সুশাসনের লক্ষ্য হলো সুনাগরিক সৃষ্টি করা। নীতিশাস্ত্র কোনটা সৎ, কোনটা অসৎ কোনটা ভালো, কোন্টা মন্দ; কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত এ শিক্ষা প্রদান করে সুনাগরিক সৃষ্টি করতে সাহায্য করে থাকে। লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাই উভয় শাস্ত্রই একে অপরকে সাহায্য করে।

২. উভয়ের ভিত্তিমূল এক ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের অনেক বিষয়েরই ভিত্তিমূল হলো ন্যায়নীতি। রাষ্ট্রীয় সংগঠন বিকশিত হবার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচলিত ন্যায়নীতি এবং আইনের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় সংগঠন পূর্ণরূপ লাভ করে এবং অতীতের অনেক ন্যায়-নীতিই আইনে পরিণত হয়। এ জন্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, ন্যায়নীতির ভিত্তিমূল থেকেই আইন, রাষ্ট্র প্রভৃতি গড়ে ওঠেছে।

৩. একে অপরের পরিপূরক ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্র একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক। নৈতিক আদর্শগুলো জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হলে তা রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হয়। কোনো রাষ্ট্রীয় আইন নৈতিকতা সম্মত না হলে তা জনসমর্থন পায় না। ফকস এ জন্যই বলেছেন যে, "ন্যায়নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে যা অন্যায়, তা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক বা ন্যায় হতে পারে না।" (What is morally wrong can never be politically right.)

পার্থক্য ঃ উভয় শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপঃ

১. বিষয়বস্তুগত ঃ নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু ও পরিধি পৌরনীতি ও সুশাসনের বিষয়বস্তু ও পরিধি অপেক্ষা ব্যাপকতর। নীতিশাস্ত্র মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ (External actions) এবং অভ্যন্তরীণ আচার-আচরণ (Internal actions) for আলোচনা করে। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসন শুধু মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

২. দৃষ্টিভঙ্গিজনিত ঃ অনেক সময় দেখা যায় যে, নৈতিক দিক থেকে অন্যায় নয় এমন অনেক কাজ রাষ্ট্রীয় আইনে অন্যায় বিবেচিত হয়। যেমন— রাস্তার বামদিক দিয়ে অসংযতভাবে গাড়ি চালানো নৈতিকতা বিরুদ্ধ নয় কিন্তু তবুও রাষ্ট্রীয় আইনে তা বেআইনি। আবার অনেক নৈতিকতা বিরুদ্ধ কাজ আইন বিরুদ্ধ নাও হতে পারে। যেমন- পরনিন্দা, মিথ্যা কথা বলা প্রভৃতি নৈতিকতা বিরুদ্ধ হলেও যতক্ষণ তা অন্যের ক্ষতি করেনি ততক্ষণ তা আইন বিরুদ্ধ নয়। সুতরাং পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতি শাস্ত্রের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিজনিত পার্থক্য রয়েছে।

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে যত পার্থক্যই থাক না কেন উপসংহারে একথা বলা যায় যে, উভয় শাস্ত্রই একে অপরের পরিপূরক এবং উভয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। জ্ঞানের এই উভয় শাখাই আদর্শ মানুষ গড়ে তুলতে চেষ্টা করে।

১-১৪ – পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ভূগোল

Civics, Good Governance and Geography

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ভূগোল পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। পৌরনীতি ও সুশাসন মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিক, সমাজ, রাষ্ট্রের আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে। অপরদিকে রাষ্ট্রের ভূখণ্ড, জনসংখ্যা, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ পদার্থ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ভূপ্রকৃতির সুসংবদ্ধ অধ্যয়নই ভূগোল। । জ্ঞানের এই উভয় শাখার সম্পর্ক নিম্নরূপঃ

সাদৃশ্য ঃ

১. ভূখণ্ডগত ঃ রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ভূখণ্ড। রাষ্ট্র গড়ে ওঠে ভূমির ওপর, আকাশে বা বাতাসে নয়। রাষ্ট্রের সমৃদ্ধিও নির্ভর করে জমির উর্বরতা, খনিজ সম্পদ প্রভৃতির ওপর। নাগরিকদের চরিত্র গঠনেও নদী, সমুদ্র, পাহাড়, ভূপ্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠে ভূগোলের প্রভাব অপরিসীম।

২. পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ঃ ভূগোল আর্থিক সম্পদ, নগরের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের আয়তন এবং কৃষি ও খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। একটি রাষ্ট্রের মঙ্গল-অমঙ্গল ও সমৃদ্ধির সাথে এগুলোর সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং ভূগোল এবং পৌরনীতি ও সুশাসনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

৩. রাষ্ট্রের কল্যাণ ও জাতীয় সমৃদ্ধি ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্রের কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। রাজধানী কোথায় স্থাপিত হলে, শিল্পকেন্দ্র কোথায় কোথায় স্থাপিত হলে রাষ্ট্রের অধিক কল্যাণ বা মঙ্গল সাধিত হবে ভূগোল সে সম্পর্কে আলোচনা করে। এমনকি নদ-নদী ও সমুদ্র সম্পদকে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে ভূগোল সে সম্পর্কেও আলোচনা করে থাকে। সুতরাং রাষ্ট্রের কল্যাণ তথা জাতীয় সমৃদ্ধির স্বার্থেই ভূগোল এবং পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা প্রয়োজন।

৪. জনজীবনে প্রভাব ঃ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশ একটি জনগোষ্ঠীর জীবনে নানাভাবে প্রভাব ফেলে থাকে। এরিস্টটল, জ্যা বোদা, মন্টেস্কু, ইবনে খালদুন প্রমুখ মনীষী বলেছেন যে, ভৌগোলিক অবস্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের সাহসিকতা, ধৈর্য, বুদ্ধিবৃত্তি, কর্মস্পৃহা প্রভৃতির ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে।

৫. জাতীয় ও পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে ঃ একটি দেশের জাতীয় নীতি ও পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে জ্ঞানের এই দুটি শাখারই রয়েছে সাদৃশ্য। জাতীয় ও পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে পৌরনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। জাতীয় ও পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। বর্তমান সময়ে একারণেই ভূ-রাজনীতি (Geopolitics) নামে একটি নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি, জাতীয় স্বার্থ চিহ্নিতকরণ ও পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে ভৌগোলিক উপাদানসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়।

৬. জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশে ঃ পৌরনীতিতে জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয় রাষ্ট্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়ে থাকে। জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারের ফলেই পৃথিবীতে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। একই ভূ-খণ্ডে বসবাসকার জনসমাজের মধ্যেই প্রথমে ঐক্যবোধ এবং তা থেকে জাতীয়তাবোধের চেতনা জাগ্রত হয়। জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশে ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পার্থক্য ঃ

১. অধ্যয়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের অধ্যয়ন পদ্ধতি ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণধর্ম কিন্তু ভূগোলের অধ্যয়ন পদ্ধতি গাণিতিক ও ঐতিহাসিক।

২. বিষয়বস্তুগত পার্থক্য ঃ উভয়ের মধ্যে বিষয়বস্তুতে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- ভূপ্রকৃতিগত বিষয়সমূহ-যেমন ভূমিরূপ, সৌরজগৎ, শিক্ষা ও খনিজ প্রভৃতি পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় নয়। তেমনি নাগরিকতা, অধিকার ও কর্তব্য, সংবিধান, আইন, স্বাধীনতা, জনমত, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি বিষয় ভূগোলের আলোচ্য বিষয় নয়।

তবে উভয়ের মধ্যে উপরে বর্ণিত পার্থক্য সত্ত্বেও বলতে হয় যে, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ভূগোল ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিশেষ করে ভূগোল নানাভাবে পৌরনীতিকে সমৃদ্ধ করে থাকে। একটি রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় নীতি ও পররাষ্ট্রনীতি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যর ও অবস্থানের উপর নির্ভরশীল।

১.১৫ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চা

Civics. Good Governance and Population, Development Studies

পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চার সম্পর্ক নিবিড়। পৌরনীতি মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। এটি জ্ঞানের তথা সামাজিক বিজ্ঞানের একটি প্রাচীন শাখা। পৌরনীতি নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করে, সুনাগরিকতার শিক্ষা দেয়। কীভাবে একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় পৌরনীতিতে সে বিষয়েও গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। বর্তমানে তাই পৌরনীতি নামক জ্ঞানের শাখাটির নামকরণ করা হয়েছে পৌরনীতি ও সুশাসন'।

বর্তমানে জনসংখ্যা ও উন্নয়নচর্চা অধ্যয়নের নতুন একটি বিষয় তথা সামাজিক বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের এই নতুন শাখার আলোচ্য বিষয় হলো জনসমষ্টি, জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং এ কারণে সৃষ্ট সমস্যা ও তার সমাধান, জনস্বাস্থ্য, জনমিতিক ধারণা প্রভৃতি। এদিক থেকে বিবেচনা করলে পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চার মধ্যে গভীর সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক বিজ্ঞানের এই শাখা দুটির মধ্যে বেশকিছু সাদৃশ্যমূলক ও বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। এগুলো । নিম্নরূপঃ

সাদৃশ্য ঃ সামাজিক বিজ্ঞানের উভয় শাখার মধ্যে নিম্নলিখিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ঃ

১. বিষয়বস্তুগত ঃ উভয়ের মধ্যে বিষয়বস্তুগত মিল বা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণ, তাদের আচার-আচরণ, বিভিন্ন সমস্যা, জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যা ও তার সমাধান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে উভয় শাস্ত্রই আলোচনা করে থাকে।

২ পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক ঃ উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। উভয়ের আলোচ্য বিষয় হলো রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণ, তাদের সার্বিক উন্নয়ন এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান।

৩. অভিন্ন লক্ষ্য ঃ সামাজিক বিজ্ঞানের এই শাখা দুটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। উভয় শাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন, সর্বাধিক কল্যাণ এবং রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন।

৪. পরস্পর পরিপূরক ঃ পৌরনীতির জ্ঞান এবং সুশাসনের নীতিমালা একটি রাষ্ট্রের জনগণের উন্নয়ন চর্চাকে প্রভাবিত করে। পৌরনীতির জ্ঞান সুশাসনকে নিশ্চিত করে। আবার সুশাসন তখনই নিশ্চিত ও তাৎপর্যপূর্ণ হয় যখন দেশের জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম বা অধিক না হয়ে কাম্য জনসংখ্যা হয়। সুতরাং পৌরনীতি ও সুশাসন এবং জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চা পরস্পর পরিপূরক।

বৈসাদৃশ্য ঃ সামাজিক বিজ্ঞানের এই শাখা দুটির মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রেবৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. পরিধি ও বিষয়বস্তুগত পার্থক্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চার মধ্যে পরিধি ও বিষয়বস্তুগত পার্থক্য রয়েছে। জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চার বিষয়বস্তু ও পরিধি অপেক্ষা পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি ও বিষয়বস্তু অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত।

২. উৎপত্তিগত পার্থক্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের উৎপত্তি হয়েছে আগে। মানুষের সামাজিক ও নাগরিক জীবনের শুরুতেই উদ্ভব ঘটেছে পৌরনীতি ও সুশাসনের। আর সমাজবদ্ধ নাগরিক জীবনে যখন সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এসব সমস্যা যখন মানুষকে চিন্তিত করে তুলেছে তখনই এসব সমস্যা সমাধান কীভাবে করা যায়- সেজন্য উদ্ভব হয়েছে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চার।

৩. পদ্ধতিগত পার্থক্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চার মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা পদ্ধতি মূলত তত্ত্ব ও অনুসন্ধানমূলক। অপরদিকে, জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চার আলোচনা পদ্ধতি গাণিতিক বিশ্লেষণধর্মী।

সূচিপত্র

৪. বাস্তবতা ও আদর্শনিষ্ঠতার দিক থেকে পার্থক্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। মূর্ত ও বিমূর্ত সব বিষয় নিয়েই জ্ঞানের এ শাখাটি আলোচনা করে থাকে। অপরদিকে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চর্চা মূর্ত ও বস্তুনিষ্ঠ বিষয় নিয়েই আলোচনা করে।

উপরের আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় যে, পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে জনসংখ্যা ও উন্নয়নচর্চার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়।

১.১৬ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং মানবাধিকার ও জেন্ডার স্টাডিজ

Civics, Good Governance and Human Rights, Gender Studies

পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে হিউম্যান রাইটস ও জেন্ডার স্টাডিজ-এর সম্পর্ক খুবই নিবিড়। উভয়ের সম্পর্ক কতটা নিবিড় তা বুঝতে হলে হিউম্যান রাইটস বা মানবাধিকার ও জেন্ডার স্টডিজ এর প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হয়।

ব্যক্তি সমাজ জীবনে যেসব সুযোগ ও সুবিধার দাবিদার হয় এবং যা ছাড়া তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে না, তাই মানবাধিকার। মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মৌলিক মানবাধিকারসমূহ গৃহীত ও ঘোষিত হয়।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ যে মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ঘোষণা করে সেখানে ১-৩০ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত সর্বত্রই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সমান অধিকারের ঘোষণা রয়েছে। এ জন্যই ১৯৪৮ সালের মানবাধিকার সনদকে বিশ্বের সকল মানুষের ম্যাগনা কাটা' বলে অভিহিত করা হয়। বিশ্বের যেসব দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা হচ্ছে সেসব দেশ মানবাধিকারের এই নীতিগুলোর প্রতিও শ্রদ্ধাশীল।

জৈবিকভাবে Gender শব্দটির আভিধানিক অর্থ লিঙ্গ বা sex, সাধারণত জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় নারী না পুরুষ— কোন্ লিঙ্গ তা চিহ্নিত করার জন্য। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে উন্নয়ন ভাবনায় 'জেন্ডার একটি বহুল আলোচিত প্রত্যয়। জাতীয় ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর নিকট জেন্ডার বিষয়টি মানব উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

জৈবিকভাবে মানুষ নারী ও পুরুষ—এ দুই ভাগে বিভক্ত। কিন্তু জেন্ডার হলো সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী এবং পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য। এই পার্থক্য শারীরিক বা জৈবিক পার্থক্যের কারণে সৃষ্টি হয়নি। জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী ও পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আলোচিত নারী ও পুরুষের ভূমিকা। এক কথায় নারী ও পুরুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংজ্ঞা বা নারী ও পুরুষের সামাজিকসাংস্কৃতিক পরিচয় হলো জেন্ডার। জেন্ডার নারী ও পুরুষের সামাজিক শ্রেণিকরণকে মেয়েলী ও পুরুষালি' বিষয়ে পরিণত করে। জেন্ডার এজন্যই জৈবলিঙ্গের পরিণতি নয়, সমাজ কর্তৃক নির্মিত।

জেন্ডার স্টাডিজে বলা হয় যে, নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এমন কিছু নেই যার জন্য তাকে সারা জীবন গৃহে ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে বা গৃহের বাইরের কাজের জন্য নারী অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। পাশাপাশি পুরুষ গৃহকর্মের জন্য জন্মগ্রহণ করেনি কিংবা সবকিছুতেই পুরুষ নারীর থেকে উন্নত, যোগ্য ও শ্রেয় এ কথাও জেন্ডার স্টাডিজে অস্বীকার করা হয়। জেন্ডার স্টাডিজে নারী-পুরুষের বৈষম্য যা পুরুষশাসিত সমাজ কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে, তা তুলে ধরা হয়। কীভাবে এর ফলে নারী পুরুষে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, কীভাবে এর ফলে মানবাধিকারের নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে সেসব বিষয়ও জেন্ডার স্টাডিজ পাঠ করলে জানা যায়।

পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে হিউম্যান রাইটস এবং জেন্ডার স্ট্যাডিজের মধ্যে নিম্নলিখিত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ঃ

সাদৃশ্য ঃ

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতা ঃ জ্ঞানের উভয় শাখার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, তাদের গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি করে। মানবাধিকার ও জেন্ডার স্ট্যাডিজ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবাধিকার ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করে।

২. বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের মূল আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্র ও নাগরিক জীবন। মানবাধিকার ও জেন্ডার স্ট্যাডিজেরও আলোচ্য বিষয় নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় জীবনে অধিকার, কর্তব্য, মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ।

৩. নাগরিক জীবনের মানোন্নয়ন ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং হিউম্যান রাইটস ও জেন্ডার স্ট্যাডিজ নাগরিক জীবনের মানোন্নয়নের উপায় নিয়ে আলোচনা এবং এ নিয়ে গৃহীত পদক্ষেপ গ্রহণ, মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করে।

৪. একে অপরের পরিপূরক ঃ কীভাবে সুনাগরিক হওয়া যায়, সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতা কী কী, কীভাবে তা দূর করা যায় সে সব বিষয়ে পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচনা করা হয়। ঠিক তেমনি মানবাধিকার ও জেন্ডার স্ট্যাডিজ বিষয়টিও নাগরিক জীবনের বিকাশের জন্য, পূর্ণাঙ্গতার জন্য এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা সুনাগরিকতার শিক্ষা দেয় ।

বৈসাদৃশ্য ঃ

১. উৎপত্তির দিক থেকেঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের উৎপত্তি ঘটেছে আগে, হিউম্যান রাইটস ও জেন্ডার স্টাডিজ এর উৎপত্তি ঘটেছে পরে।

২. পরিধির দিক থেকে ঃ নাগরিকের জীবন ও কার্যাবলি যতদূর বিস্তৃত, অর্থাৎ যা কিছু নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে, পৌরনীতি ও সুশাসনের বিষয়বস্তু ও পরিধি ততদূর বিস্তৃত। অপরদিকে, হিউম্যান রাইটস এবং জেন্ডার স্টাডিজ শুধুমাত্র মানবাধিকার ও জেন্ডার নিয়ে আলোচনা করে থাকে। সুতরাং হিউম্যান রাইটস ও জেন্ডার বিষয়ের পরিধি ও বিষয়বস্তুর থেকে পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি ও বিষয়বস্তু অনেক বেশি বিস্তৃত ও ব্যাপক।

৩. নারী ও পুরুষের সমতার প্রতি গুরুত্ব আরোপের দিক থেকেঃ পৌরনীতি ও সুশাসনে নারী ও পুরুষকে পৃথকভাবে দেখা হয় না। তাদেরকে ভাবা হয় একজন নাগরিক হিসাবে। একজন নাগরিকের, সে পুরুষ হোক বা নারী হোক- পৌরনীতি ও সুশাসনে সবার জন্য অভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকারের কথা বলা হয়। অপরদিকে জেন্ডার স্ট্যাডিজে জেন্ডার বৈষম্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়।

৪. মানুষ সম্পর্কে ধারণা ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনে মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু হিউম্যান রাইটস ও জেন্ডার বিষয়ে মানুষকে শুধু সামাজিক জীব হিসেবেই মনে করা হয় এবং তার মানবিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে মানবাধিকার ও জেন্ডার স্টাডিজের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে মানবাধিকারের ঘোষণার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে এবং কৃত্রিমভাবে সমাজসৃষ্ট নারী-পুরুষের বিভাজন ও বৈষম্য দূর করতে হবে।

১.১৭ পৌরনীতি, সুশাসন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

Civics, Good Governance & Information and Communication Technology

পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্পর্ক খুবই নিবিড়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগের দ্রুত উন্নতি সাধিত হওয়ায় বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রযুক্তির

ব্যবহার একটি দেশের জনগণের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছে। অতীতের কৃষিভিত্তিক সমাজবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর এবং শিল্প সমৃদ্ধ সমাজে পরিণত হতে চলেছে। এর ফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটছে। পরিবর্তন ঘটছে মূল্যবোধের জগতেও ।

পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ।

সাদৃশ্য ঃ

১. লক্ষ্যের ক্ষেত্রে অভিন্নতা ঃ উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন এবং তা হচ্ছে রাষ্ট্র ও নাগরিকের কল্যাণ সাধন ও উন্নয়ন।

২. বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ঃ জ্ঞানের উভয় শাখার আলোচ্য বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞানের উভয় শাখাই সমাজ, নাগরিক ও নাগরিকতা, নাগরিক সেবা, নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সরকার, প্রশাসন, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা, জনমত, সুশাসন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে থাকে।

৩. একে অপরের পরিপূরক ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র ও নাগরিকের কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া রাষ্ট্র ও নাগরিক কল্যাণের কথা চিন্তা করা যায় না।

৪. একটির ওপর অন্যটির প্রভাব ঃ উভয় শাস্ত্রই একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ছাড়া নাগরিক কল্যাণ সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্টদের ও রাষ্ট্র প্রশাসন ও নাগরিকদের সম্পর্কে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থাকতে হয়।

বৈসাদৃশ্য ঃ

১. পদ্ধতিগত পার্থক্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের অনুশীলন পদ্ধতি মূলত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণধর্মী। কিন্তু তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার অনুশীলন পদ্ধতি মূলত গাণিতিক ও তথ্যনির্ভর।

২. দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনে বিদ্যমান সমস্যাগুলোকে নাগরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় এবং বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে এগুলোকে দেখা হয় তথ্য ও প্রযুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে।

৩. বিষয়বস্তুগত পার্থক্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র ও নাগরিকতা বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করে। অপরদিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কীভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করা হয় সেগুলোর উপর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিদ্যা অধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করে থাকে।

তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে নাগরিক জীবনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দিগন্তেও। মানবসভ্যতার প্রগতির ধারা আরো গতিশীল হয়েছে এবং জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে উন্নতি ও প্রগতির সোপান রচিত হয়েছে। বিদ্যুৎ, বেতারযন্ত্র, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ইমেইল প্রভৃতি পৃথিবীর এক প্রান্তের সমাজব্যবস্থা, আচার-আচরণ, কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদি অতি সহজে অন্য প্রান্তের সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তার করছে। দ্রুতগামী আকাশযান দূরকে নিকট করে চলেছে। ঘরে বসেই মানুষ তথ্য পাচ্ছে, সারা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহের সৃষ্টি হওয়ায় প্রশাসনে দুর্নীতি কমে যাচ্ছে, প্রশাসন স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হচ্ছে। কাজেই পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্পর্ক যে খুব নিবিড় তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

সূচিপত্র

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

(√ চিহ্নটি সঠিক উত্তর)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন উত্তর

১। পৌরনীতি ও সুশাসন কোন ধরনের বিজ্ঞান?

ক. রাজনৈতিক

খ. অর্থনৈতিক

গ. সামাজিক √

ঘ, সাংস্কৃতিক

২। পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

ক. Civics √

খ. Civis

গ, Civies

ঘ. Civitas

৩ । Civics শব্দটির উদ্ভব বা উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে?

ক. ইংরেজি

খ. আরবি

গ, ল্যাটিন √

ঘ. জার্মান

৪ । Civis ও Civitas কোন ভাষার শব্দ?

ক, ল্যাটিন √

খ. গ্রিক

গ, ফরাসি

ঘ. স্প্যানিশ

৫ । সিভিস’ ও ‘সিভিটাস’ শব্দের অর্থ যথাক্রমে–

ক. দেশ ও রাষ্ট্র

খ. রাষ্ট্র ও নগর

গ নাগরিক ও নগররাষ্ট্র √

ঘ, নগররাষ্ট্র ও নাগরিক

৬।প্রাচীনকালে কোথায় নগররাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল?

ক. মিসর

খ. চীন

গ. ইংল্যান্ড

ঘ, গ্রিস √

৭।প্রাচীনকালে এথেন্স ও স্পার্টায় কোন ধরনের রাষ্ট্র প্রচলিত ছিল ।

ক. বিশ্ব রাষ্ট্র

খ. জাতীয় রাষ্ট্র

গ, নগররাষ্ট্র √

ঘ, যুক্তরাষ্ট্র

৮।প্রাচীনকালে কোথায় কোথায় নগররাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল?

ক, গ্রিসের এথেন্স ও স্পার্টায় √

খ, গ্রেট ব্রিটেনের লন্ডন ও ব্রিস্টলে

গ. আমেরিকার নিউইয়র্ক ও ডালাসে

ঘ, মিসরের কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায়

৯।নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল প্রশ্ন সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাই পৌরনীতি”–উক্তিটি কার?

ক. সক্রেটিস

খ. এফ.আই গ্রাউড

গ. এরিস্টটল

ঘ. ই.এম. হোয়াইট √

১০। পৌরনীতি কোন ধরনের সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে?

ক. সামাজিক

খ, রাজনৈতিক √

গ, ধর্মীয়

ঘ, সাংস্কৃতিক

১১। পৌরনীতিকে জ্ঞানের মূল্যবান শাখা বলেছেন কে?

ক. গার্নার

খ. লাস্কি

গ. ম্যাকাইভার

ঘ. ই.এম. হোয়াইট √

১২। জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে কোন যুগে?

ক. প্রাচীন যুগে

খ. মধ্যযুগে

গ, প্রাক-মধ্যযুগে

ঘ, আধুনিক যুগে √

১৩। নগররাষ্ট্রের স্থলে আধুনিক যুগে কিরূপ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছেঃ

ক. বিশ্বরাষ্ট্র

খ, রাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্য

গ, জাতীয় রাষ্ট্র √

ঘ, প্রকৃতির রাজ্য

১৪।নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান কোনটি?

ক. অর্থনীতি

খ. সমাজবিজ্ঞান

গ. ইতিহাস

ঘ, পৌরনীতি ও সুশাসন √

১৫। নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে জ্ঞানের যে শাখা তার নাম–

ক. অর্থনীতি

খ, পৌরনীতি ও সুশাসন √

গ. ইতিহাস

ঘ. নীতিশাস্ত্র

১৬। মানবসভ্যতা রক্ষার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের জনপ্রিয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন কে?

ক. ই.এম. হোয়াইট

খ. এফ. আই. গ্লাউড

গ. জর্জ বার্নার্ড শ √

জ্যাঁ জ্যাক রুশো

১৭। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে একজন মানুষ কীসে উদ্বুদ্ধ হয়?

ক. আত্মস্বার্থে

খ. রাজনীতিতে

গ. দেশপ্রেমে √

ঘ. সাহিত্য চর্চায়

১৮। 'Polites ও Polis' শব্দের অর্থ যথাক্রমে

ক. নাগরিক ও রাষ্ট্র

খ, জাতীয় রাষ্ট্র ও নাগরিক

গ. নগররাষ্ট্র ও নাগরিক

ঘ, নাগরিক ও নগররাষ্ট্র √

১৯। "Polites & Polis' শব্দের অর্থ যথাক্রমে–

ক. গ্রিক √

খ. ল্যাটিন

গ. ইংরেজি

ঘ. জার্মান

২০। "ইতিহাস ব্যতীত পৌরনীতি ভিত্তিহীন এবং পৌরনীতি ব্যতীত ইতিহাস মূল্যহীন"-উক্তিটি কার্?

ক. অধ্যাপক ফাইনার

খ. অধ্যাপক সিলি √

গ. অধ্যাপক লাস্কি

ঘ, লর্ড এ্যাক্টন

২১। ন্যায়নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে যা অন্যায়, তা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক বা ন্যায় হতে পারে না—উক্তিটি কার? -

ক. ফকস্ √

খ. অধ্যাপক লাস্কি

গ. অধ্যাপক গার্নার

ঘ. অধ্যাপক গেটেল

২২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, মানুষ রাজনৈতিক জীব। কিন্তু মানুষ কীভাবে ও কেন রাজনৈতিক জীব সমাজবিজ্ঞানে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় –উক্তিটি কার?

ক. অধ্যাপক গার্নার

খ. অধ্যাপক গেটেল √

গ. ই.এম. হোয়াইট

ঘ. এফ.আই. গ্রাউড

২৩। শাসক যদি ন্যায়বান হয় তাহলে আইন অনাবশ্যক, আর শাসক যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন তাহলে আইন নিরর্থক'— উক্তিটি কার?

ক. সক্রেটিস

খ, প্লেটো √

গ, এরিস্টটল

ঘ. ম্যাকাইভার

২৪। সুনাগরিক হবার শিক্ষাদান করে জ্ঞানের কোন শাখা?

ক. ইতিহাস

খ. অর্থনীতি

গ, পৌরনীতি ও সুশাসন √

ঘ, নীতিশাস্ত্র

সূচিপত্র

২৫। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলো পৌরনীতি ও সুশাসন বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া আলোচনা করা সম্ভব নয়'— উক্তিটি কার?

ক, মরগান ও গিডিংসের √

খ, প্লেটাে ও এরিস্টটলের

গ, মরগান ও ম্যাকইভারের

ঘ গিডিংস ও গার্নারের

২৬।নাগরিকতার স্থানীয় রূপের সাথে কোন প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট বা জড়িত?

ক. আইনসভা

খ, রাজনৈতিক দল

গ. মন্ত্রিসভা

ঘ, ইউনিয়ন পরিষদ √

২৭। নাগরিকতার জাতীয় রূপের সাথে কোন প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট বা জড়িত?

ক. আইনসভা

খ. বিচার বিভাগ

গ. জেলা পরিষদ

ঘ, রাষ্ট্র √

২৮। মানুষ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে পারে না, কেননা সে–

ক. সৃষ্টির সেরা জীব

খ, রাজনৈতিক জীব

গ.সামাজিক জীব √

ঘ, অন্যের উপর নির্ভরশীল জীব

২৯। নাগরিক জীবনের সকল বিষয় আলোচনা করে জ্ঞানের কোন শাখা?

ক. অর্থনীতি

খ, পৌরনীতি ও সুশাসন √

গ, সমাজবিজ্ঞান

ঘ. ইতিহাস

৩০। নাগরিকের কোন ধরনের কার্যাবলি পৌরনীতি ও সুশাসনের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে?

ক. ধর্মীয়

খ. অর্থনৈতিক

গ. রাজনৈতিক √

ঘ, সাংস্কৃতিক

৩১। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠে কী দূর হয়?

ক. বুদ্ধি

খ. বিবেক

গ. কর্তব্যবোধ

ঘ, উদাসীনতা √

৩২। কোন শাস্ত্র পাঠ করে নাগরিকতা, রাজনীতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়?

ক. সমাজবিজ্ঞান

খ. অর্থনীতি

গ. নীতিশাস্ত্র

ঘ, পৌরনীতি ও সুশাসন √

৩৩। দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসার অনুভূতিকে কী বলা হয়?

ক. সামাজিক মূল্যবোধ

খ, রাজনৈতিক মূল্যবোধ

গ, দেশাত্মবোধ √

ঘ, মানবতাবোধ

৩৪। মানবাত্মার অনুভূতিকে কী বলা হয়?

ক. দেশাত্মবোধ

খ, মমত্ববোধ

গ. মূল্যবোধ

ঘ, মানবতাবোধ √

৩৫। 'দেশ ঠিক মায়ের মতোই –এ উপলব্ধিকে কী বলা যায়?

ক. মানবতাবোধ

খ, ভ্রাতৃত্ববোধ

গ. দেশাত্মবোধ √

ঘ. মমত্ববোধ

৩৬। কোন গুণের কারণে বিশ্বের সব মানুষ ভালোবাসার সূক্ষ্ম ও নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ?

ক. জাতীয়তাবোধ

খ. দেশাত্মবোধ

গ. স্বদেশ প্রেম

ঘ, মানবতাবোধ √

৩৭। উৎপত্তিগত দিক থেকে পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে কোন বিষয়ের সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি বা ঘনিষ্ঠতর?

ক. অর্থনীতি

খ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান √

গ. ইতিহাস

ঘ. সমাজবিজ্ঞান

৩৮। জ্ঞানের কোন শাখা মানুষের সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুখী ও সুন্দররূপে গড়ে তোলার শিক্ষা দান করে?

ক. অর্থনীতি

খ, পৌরনীতি ও সুশাসন √

গ. ইতিহাস

ঘ নীতিশাস্ত্র

৩৯। কোন বিষয় পাঠের মাধ্যমে নাগরিকগণ নিজেদেরকে আদর্শনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

ক, পৌরনীতি ও সুশাসন √

খ, অর্থনীতি

গ. ইতিহাস

ঘ, সমাজবিদ্যা

৪০। মিঠু পেশায় ডাক্তার। সে বাংলাদেশের সংবিধান ও সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চায়। এ বিষয়ে তার কোন কোন বিষয়ে পড়াশোনা করা উচিত?

ক পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান √

খ, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান

গ. পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস

ঘ, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ভূগোল ।

৪১। শমি ডাক্তারি পড়ছে। সে আসন্ন পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট প্রদান করবে। সে এ ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে চায়। এজন্য তাকে কী পাঠ করতে হবে?

ক. অর্থনীতি

খ, ইতিহাস

গ. সমাজবিজ্ঞান

ঘ, পৌরনীতি ও সুশাসন √

৪২। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করে সুহাস সুনাগরিক হবার শিক্ষা অর্জন করেছে। এবার সে নৈতিক গুণেরও অধিকারী হতে চায়। এজন্য তাকে কী পাঠ করতে হবে?

ক নীতিশাস্ত্র √

খ. ইতিহাস

গ. অর্থনীতি

ঘ. ধর্মশাস্ত্র

সূচিপত্র

৪৩। কোনটি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়?

ক. রাষ্ট্র

খ. রাজনীতি

গ. সংবিধান

ঘ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি √

৪৪। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি একই বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো। সর্বপ্রথম অর্থনীতিকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা দান করেন—

ক. প্লেটো

খ. জন মার্শাল

গ. এ্যাডাম স্মিথ √

ঘ, জেমস মিল

৪৫।

বৃত্ত ৩-এর ? চিহ্নিত স্থানে কী বসবে?

ক. সিটি কর্পোরেশন

খ. সার্ক

গ. জাতিসংঘ

ঘ, স্থানীয় সরকার √

৪৬। আইন নিষ্প্রয়োজন হয়, যদি–

ক. শাসক চরিত্রহীন হন

খ, শাসক স্বৈরাচারী হন

গ, কোন শাসক না থাকেন

ঘ শাসক ন্যায়পরায়ণ হন √

৪৭। আইন নিরর্থক হয়, যদি–

ক. শাসক চরিত্রবান হন

খ. শাসক গণতান্ত্রিক মনস্ক হন

গ শাসক দুর্নীতিপরায়ণ হন √

ঘ, শাসক ন্যায়বান হন

৪৮। পৌরনীতি ও সুশাসন কী পর্যালোচনা করে ।

ক নাগরিকের কার্যাবলি √

খ. সরকারের কার্যাবলি

গ. রাষ্ট্রের কার্যাবলি

ঘ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি

৪৯। স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান বা সৃষ্টি করে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন

ক. পরিবার প্রধান

খ. রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ

গ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান √

ঘ. এন.জি.ও

৫০। জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষ?

ক. রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ √

খ. বিচার বিভাগ

গ, সুইন বিভাগ

ঘ ন্যায়পাল

৫১। পৌরনীতি ও সুশাসনের পাঠ কী হতে সাহায্য করে?

ক. রাজনীতিবিদ

খ. সফল ব্যবসায়ী

গ, সুনাগরিক √

ঘ. বিচারক

৫২। সুহাস সমাজে বাস করে। কেননা সে- -

ক, সঙ্গপ্রিয় √

খ. ভীরু

গ. লোভী

ঘ. কাপুরুষ

৫৩। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই পৃথিবীর রূপ আমি দেখিতে চাহিনী আর'—এতে কোন ধরনের চেতনার প্রকাশ ঘটেছে?

ক, মমত্ববোধ

খ. দেশাত্মবোধ √

গ. কর্তব্যবোধ

ঘ. মানবতাবোধ

৫৪।

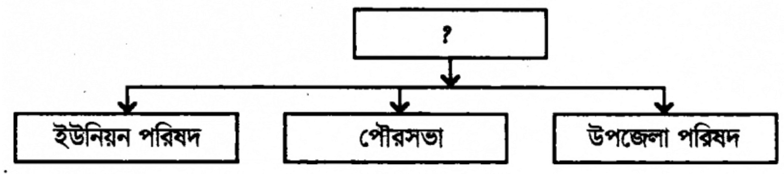

উপরের ফাকা ঘরটিতে কী বসবে?

ক. জাতীয় বিষয়

খ, স্থানীয় বিষয় √

গ. আন্তর্জাতিক বিষয়

ঘ. পররাষ্ট্র বিষয়

৫৫। জর্জ হ্যারিসন ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গান গেয়ে অর্জিত অর্থ বাংলাদেশের অসহায় মানুষের জন্য দান করেছিলেন। এ সময় তার নাগরিকত্ব কোন প্রকৃতির ছিল?

ক. স্থানীয়

খ. জাতীয়

গ. আন্তর্জাতিক √

ঘ, তিনটির কোনটিই না

৫৬। প্রতিটি নাগরিক বিশ্বসমাজের সদস্য’-এর দ্বারা নাগরিকত্বের কোন রূপটি প্রকাশ পেয়েছে?

ক. স্থানীয় রূপ

খ. জাতীয় রূপ

গ. আন্তর্জাতিক রূপ √

ঘ. মানবিক রূপ

৫৭। সুন্দর নাগরিক জীবন গড়ে তোলা পৌরনীতি ও সুশাসনের লক্ষ্য। মিতব্যয়ী ও স্বাবলম্বী হতে শেখানো অর্থনীতির কাজ। জ্ঞানের এই দুটি শাখা তাই পরস্পরের— - -

ক. বিকল্প

খ. প্রতিযোগী

গ, পরিপূরক √

ঘ, বিরোধী

বহুপদি সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৫৮। প্রাচীন গ্রিসের এথেন্স ও স্পার্টা নগররাষ্ট্রের নাগরিকগণ কীভাবে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করতো?

i. প্রত্যক্ষ বা সরাসরি

ii, পরোক্ষভাবে বা নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে

iii. প্রত্যেক পরিবার প্রধানকে প্রেরণের মাধ্যমে

iv. কোনোটিই না

সূচিপত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i √

খ.. ii

গ. iii

ঘ. iv

৫৯। নাগরিকতা স্থানীয় রূপ লাভ করে যখন একজন নাগরিক

i, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়

ii. নিজ এলাকার উন্নয়নে সচেষ্ট হয়

iii. নিজ রাষ্ট্রের স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রী হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. I ও ii √

খ. Iii

গ. ii ও iii

ঘ. কোনটিই না

৬০। পৌরনীতি ও সুশাসন একটি–

i. স্থিতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান

ii, গতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান

iii. গতিশীল রাষ্ট্রবিজ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii √

গ. iii

ঘ. i. i ও iii

৬১। পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics শব্দটি এসেছে ল্যাটিন—

i. Civis থেকে

ii. Civitas থেকে

iii. CivicS থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. iii ,

খ, i ও ii √

গ. i ও iii

ঘ. i. i ও iii

৬২। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে মানুষের মন থেকে কী দূর হয়?

i, কুসংস্কার

ii. উদারতা

iii. সাম্প্রদায়িকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. Ii

গ. i ও iii √

ঘ. i, ii ও iii

৬৩। পৌরনীতি ও সুশাসনের বিষয়বস্তু হলো—

i, সার্বভৌমত্ব

ii. রাষ্ট্র

iii. সরকারের শ্রেণিবিভাগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii √

৬৪। কোন কোন বিষয়ের উৎপত্তিগত দিক থেকে মিল রয়েছে?

i, পৌরনীতি ও সুশাসন

ii. রাষ্ট্রবিজ্ঞান

iii. ইতিহাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও iii

খ. ii ও iii

গ. I ও ii √

ঘ. i, ii ও iii

৬৫। নিচের কোনটি সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত নয়?

i.রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ii.অর্থনীতি

iii.ইতিহাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii ও iii

খ. ii

গ. Iii √

ঘ. i ও ii

৬৬।

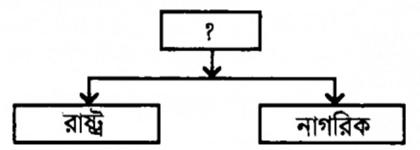

i.পৌরনীতি ও সুশাসন

ii.অর্থনীতি

iii.সমাজবিজ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. I √

খ. ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৬৭।

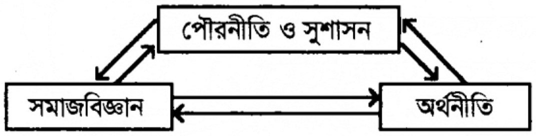

উপরের উদ্দীপকের চিত্রটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

i. সাদৃশ্য

ii. বৈসাদৃশ্য

iii, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i,ও ii

খ. ii ও iii

গ. Iii √

ঘ. i, ii ও iii

৬৮। রাষ্ট্র কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য?

i. সার্ক

ii. আসিয়ান

iii. জাতিসংঘ

সূচিপত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. Iii √

ঘ. I ও iii

৬৯। কেন পৌরনীতি ও সুশাসন পড়তে হবে?

i.নেতা হওয়ার জন্য

ii. অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জানার জন্য

iii. স্বাধীনতা অর্জনের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ.ii √

গ. iii

ঘ. i ও iii

৭০। বর্তমান রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশের প্রকৃতি হলো—

i.সমাজতান্ত্রিক

ii, পুঁজিবাদ

iii. কল্যাণমূলক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ.. I ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. iii √

৭১। নাদিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। সে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলোর অতীত জানতে চায়। তার জন্য প্রয়োজন—

i.সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান

ii, ইতিহাসের জ্ঞান

iii. ভূগোলের জ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii √

ঘ. ii ও iii

৭২। সুহাস যদি তার দাদুকে জিজ্ঞেস করে ইতিহাস কীভাবে পৌরনীতি ও সুশাসনকে সমৃদ্ধ করেছে তাহলে তার দাদুর উত্তর হবে— i, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে

ii. সার্বভৌমত্বের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে

ii.i রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও iii

গ.i ও ii

ঘ.i, ii ও iii √

৭৩। আমলাদের দুর্নীতি দেশের উন্নতিকে পিছিয়ে দিয়েছে, এর কারণ কী?

i. দেশপ্রেমের অভাব

ii. সততার অভাব

iii. শিক্ষার অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও iii

গ. i ও ii √

ঘ.i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৪ ও ৭৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

৭৪। বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হলে পাঠ করা প্রয়োজন—

ক. অর্থনীতি

খ. সমাজবিজ্ঞান

গ, পৌরনীতি ও সুশাসন √

ঘ. নীতিশাস্ত্র

৭৫। রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়—

ক. ইতিহাসে

খ. অর্থনীতিতে

সূচিপত্র

গ. সমাজবিজ্ঞানে

ঘ, পৌরনীতি ও সুশাসনে √

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৬ ও ৭৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পৌরনীতি ও সুশাসন সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পৌরনীতি ও সুশাসন মূলত নাগরিকতাবিষয়ক বিজ্ঞান। বর্তমানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার, সুশাসন, ই গভর্নেন্স ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসনে গুরুত্বসহ আলোচনা করা হয়।

৭৬। জ্ঞানের শাখা হিসেবে পৌরনীতির নতুন নামকরণ করা হয়েছে—

ক. পৌরনীতি ও দেশপ্রেম

খ. পৌরনীতি ও মানবাধিকার

গ, পৌরনীতি ও সুশাসন √

ঘ. পৌরনীতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

৭৭ । পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে জ্ঞানের যে শাখার সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ তা হলো—

ক. রাষ্ট্রবিজ্ঞান √

খ. ইতিহাস

গ. নীতিশাস্ত্র

ঘ, অর্থনীতি

চিত্রটি পর্যবেক্ষণ কর এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও।

৭৮। বৃত্ত (১)-এর নিচে ফাঁকা স্থানে কী বসবে?

ক. সার্ক

খ. ও.আই.সি

গ, স্থানীয় সরকার √

ঘ. কমনওয়েলথ

খ, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সুহৃদ ও সুহাস এ বছর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হবে। ভবিষ্যতে এরা রাজনীতি ও সরকার বিষয়ে পড়াশোনা করতে চায়। স্কুল শিক্ষক এদেরকে একাদশ শ্রেণিতে পাঠ্যবিষয় হিসেবে পৌরনীতি ও সুশাসন নিতে বলেছেন। তিনি

এদেরকে বলেছেন যে, পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে তোমরা নাগরিকতা, রাষ্ট্র, সংবিধান এবং তোমাদের দেশের সঠিক রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে।

প্রশ্ন

ক. পৌরনীতির ইংরেজির প্রতিশব্দ কী এবং তার উদ্ভব ঘটেছে কোন ভাষার কোন্ শব্দ থেকে? খ. পৌরনীতি সম্পর্কে ই. এম. হোয়াইট প্রদত্ত সংজ্ঞাটি কী?

গ. পৌরনীতি পাঠ করলে সুহৃদ ও সুহাস কী কী বিষয় জানতে পারবে?

ঘ. 'পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে সুহৃদ ও সুহাস এদেশের সঠিক রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে পারবে"—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ঝিনুক ও শুভ দুই ভাই। ঝিনুক শিক্ষকতা করে এবং শুভ পেশায় প্রকৌশলী। কিছুদিন আগে শুভ ইংল্যান্ড ও জার্মানি গিয়েছিল পেশাগত কাজে । শুভ ইংল্যান্ড ও জার্মানির জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে গল্প করছিল। ঝিনুক তাকে বললো যে, ঐ দুটি দেশ ছাড়াও তুমি যদি অন্যান্য দেশের জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে এবং নাগরিকতার সাথে জড়িত বিষয় সম্পর্কে আরো বেশি জানতে চাও তাহলে পৌরনীতির ওপর লেখা কোনো বই পড়বে। কেননা জ্ঞানের এই শাখাটি মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান।

প্রশ্ন

ক, নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল প্রশ্ন সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাই পৌরনীতি—উক্তিটি কার? ১

খ. শব্দগত বা উৎপত্তিগত অর্থে পৌরনীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে একজন নাগরিক হিসেবে শুভ কতটুকু উপকৃত হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পৌরনীতি পাঠ করলে শুভ কী কী বিষয় জানতে পারবে? ৪

৩. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নাভিদ ও নাশহাদ দুই ভাই। নাভিদ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে তার অন্যতম পাঠ্যবিষয় ছিল পৌরনীতি ও সুশাসন। খুব ভালো লাগতো তার এ বিষয়টি পড়তে। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করে সে নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এর ফলে তার নাগরিক সচেতনতা, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ অনেক বেড়েছে। এজন্যই নাশহাদকে সে বলেছে, পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে পড়াশোনা করলে সে সমাজ, রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে।

প্রশ্ন

ক. পৌরনীতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এরূপ ৩ জন লেখকের নাম লেখ ।

খ. পৌরনীতি বা Civics শব্দের উদ্ভব বা উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে?

গ. পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করে নাভিদ কোন কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছে?

ঘ, পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করার ফলে নাশহীদ কীভাবে উপকৃত হয়েছে? উদ্দীপকের আলোকে উত্তর দাও।

৪. নিচের ছকটি পড় এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

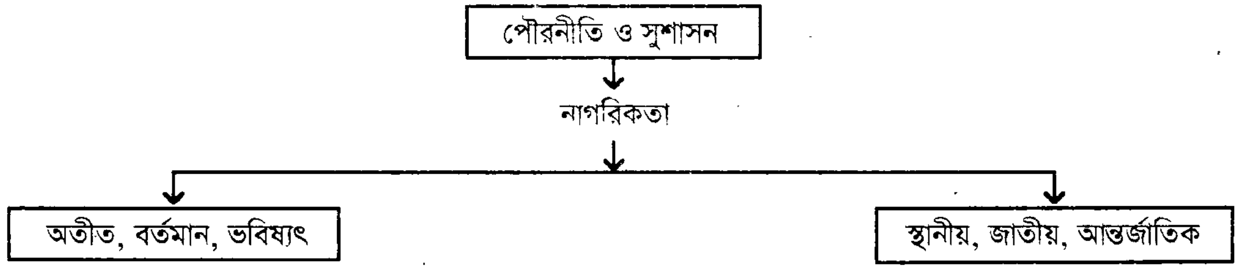

প্রশ্ন

ক. পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী এবং তা এসেছে কোন ভাষার কোন শব্দ থেকে?

খ. সুনাগরিকতা অর্জনে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

গ. উপরের উদ্দীপকটি পৌরনীতি ও সুশাসন যে চিত্র তুলে ধরেছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

ঘ, পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ নাগরিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? যুক্তি দিয়ে বোঝাও।

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জাহাঙ্গীর হোসেন একজন সদালাপী, বিনয়ী ও মিশুক যুবক এলাকার বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গরিব-দুঃখী জনগণের অনুরোধেই তিনি চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত না থাকায় এবং রাষ্ট্র, রাজনীতি, নাগরিকতা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞান না থাকায় কিছু কিছু বিষয়ে তিনি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। তার আত্মীয় ও বন্ধু মতি, সবুজ ও রঞ্জ তাকে পরামর্শ দিলেন যে, পৌরনীতি ও সুশাসনবিষয়ে কোনো বই পাঠ করলে তুমি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার সম্পর্কে এবং নাগরিকতা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারবে ।

প্রশ্ন

ক. পৌরনীতি বিষয়ে ই.এম. হোয়াইট-এর সংজ্ঞাটি লেখ ।

খ, পৌরনীতি শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে কী জান?

গ, নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসেনকে কেন তার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করার পরামর্শ দিলেন? ঘ, পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান—উক্তিটি বুঝিয়ে বল।

৬. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

ফারাহ মুনতাহা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রী। ভালো ছাত্রী হলেও সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি সম্পর্কে সে খুব কমই জানে। ওর আব্বা একজন শিক্ষাবিদ। পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ে তার লেখা অনেক বই প্রকাশ পেয়েছে। ছুটিতে বাসায় এলে সে তাই তার আব্বার লেখা বইগুলো পড়ে। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করার ফলে তার রাজনৈতিক সচেতনতা এবং নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধও বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশ্ন

ক. পৌরনীতি সম্পর্কে এফ.আই. গ্রাউড-এর সংজ্ঞাটি লেখ ।

খ. পৌরনীতি ও সুশাসনকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন?

গ. পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের ফলে ফারাহ মুনতাহী কী কী বিষয় সম্পর্কে জানতে পেয়েছে? বুঝিয়ে বল।

ঘ, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধিতে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর ।

৭. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সংবাদপত্রের পাতা উল্টালেই দেখা যায় প্রতিদিন বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ফলমূল, সজি ও মাছে ফরমালিনসহ অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মেশানো নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া বিবাদ হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে মানুষ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন

ক. সুশাসন' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

খ. সুশাসন বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের করণীয় কী হওয়া উচিত?

ঘ, সুশাসনের ধারণাটি বহুমাত্রিক'-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

সূচিপত্র

৮. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবে। রুনা সবেমাত্র একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। বাংলা, ইংরেজি ছাড়াও পৌরনীতি ও সুশাসন, অর্থনীতি ও যুক্তিবিদ্যা হলো স্মৃতির পঠিত বিষয়। রুনা বেছে নিয়েছে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞান। রুনা মনে করে পৌরনীতি ও সুশাসন, অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু স্মৃতি তাকে বুঝিয়ে বললো যে, জ্ঞানের এই মূল্যবান শাখাগুলোর মধ্যে যেমন মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি অমিল বা পার্থক্যও রয়েছে। জ্ঞানের এই শাখাগুলো পরস্পর পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক।

প্রশ্ন ঃ

ক. ইতিহাস ব্যতীত পৌরনীতি ভিত্তিহীন এবং পৌরনীতি ব্যতীত ইতিহাস মূল্যহীন—উক্তিটি কার?

খ. পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে উৎপত্তি ও অর্থগত অভিন্নতা সম্পর্কে লেখ।

গ, পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় স্মৃতির উক্তির আলোকে ব্যাখ্যা কর ।

ঘ, যাদের সমাজবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলোর সম্পর্কে জ্ঞান নেই তাদেরকে রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া নিউটনের গতিতত্ত্বের জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিকে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেবার মতোই। অধ্যাপক গিডিংস-এর উক্তিটি কী স্মৃতির বক্তব্যকে সমর্থন করে?

[এ অধ্যায়ের প্রশ্ন সংকেত]

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। Civics শব্দের অর্থ কী?
২। Civis ও Civitas শব্দের অর্থ কী?
৩। পৌরনীতির শব্দগত অর্থ কী?
৪ । পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী এবং তার উদ্ভব ঘটেছে কোন ভাষার কোন শব্দ থেকে?
৫। নাগরিক জীবনের অপর নাম এবং নাগরিক জীবন সম্পর্কিত বিদ্যার নাম কী?
৬। পৌরনীতি ও সুশাসন কী ধরনের বা কী বিষয়ক বিজ্ঞান?
৭। যা কিছু নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে, তার প্রায় সকল দিকই আলোচনা করে যে শাস্ত্র তার নাম কী?
৮। কোন ভাষায় নগরকে পুর বা পুরী বলা হয়?
৯ । প্রাচীন গ্রিসের রাষ্ট্রগুলো কী ধরনের ছিল?
১০। এরিস্টটলের মতে মানুষ কোন ধরনের জীব?
১১। ব্যাপক অর্থে পৌরনীতি ও সুশাসন কী সংক্রান্ত বিজ্ঞান?
১২ । পৌরনীতির একটি সংজ্ঞা দাও।
১৩ । পৌরনীতি সম্পর্কে ই.এম. হোয়াইট-এর সংজ্ঞাটি লেখ ।
১৪। পৌরনীতি সম্পর্কে এফ. আই. গ্রাউড-এর সংজ্ঞাটি কী?
১৫। পৌরনীতি সম্পর্কে webster's International Dictionary প্রদত্ত সঙ্গাটি লিখ।
১৬। Encyclopaedia Britanica প্রদত্ত পৌরনীতির সঙ্গাটি লিখ।
১৭। সুশাসন' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
১৮। মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব-উক্তিটি কার?
১৯। ইতিহাস ও পৌরনীতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে অধ্যাপক সিলি কী বলেছেন?
২০। পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে ফকস্ কী বলেছেন?
২১। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক সম্পর্কিত লর্ড এ্যাক্টনের উক্তিটি কী?
২২। সমাজবিজ্ঞান ও পৌরনীতির ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে অধ্যাপক গিডিংস কী বলেছেন?

২৩। পৌরনীতি ও সুশাসন, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান কী ধরনের বিজ্ঞান?
২৪। এরিস্টটলের মতে যারা সমাজে বাস করে না তারা কীরূপ?
২৫। সংস্কৃত ভাষায় নগরকে পুর' বা 'পুরী এবং নগরের অধিবাসীকে বলা হয় পুরবাসী' –এ জন্যই নাগরিক জীবনের অপর নাম কী ছিল?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। পৌরনীতির সংজ্ঞা দাও।
২। পৌরনীতি বলতে কী বুঝ?
৩। ই. এম. হোয়াইট প্রদত্ত পৌরনীতির সংজ্ঞা দুটি লেখ।
৪। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য নাগরিক জ্ঞান আবশ্যকীয় কেন?
৫। পৌরনীতি ও সুশাসন কীভাবে অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করে?
৬। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশে পৌরনীতি ও সুশাসন কীভাবে সাহায্য করে?
৭। সুনাগরিকতা অর্জনে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ কেন গুরুত্বপূর্ণঃ
৮। ব্যাপক অর্থে পৌরনীতি ও সুশাসন কী ধরনের বিজ্ঞান?
৯। পৌরনীতি ও সুশাসনকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন?
১০। পৌরনীতি শব্দের উদ্ভব বা উৎপত্তি কীভাবে হয়েছেঃ
১১। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের বিশেষ গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা কী?
১২। পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রধান আলোচ্য বিষয় কী কী?
১৩। পৌরনীতি ও সুশাসন কীভাবে নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার করে?
১৪। পৌরনীতি ও সুশাসন কীভাবে নাগরিকের গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি করে?
১৫। পৌরনীতি ও সুশাসন কীভাবে নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি করে?
১৬। পৌরনীতি ও সুশাসন কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে?
১৭। পৌরনীতি ও সুশাসন কীভাবে সুস্থ ও সুন্দর সমাজজীবন গঠনের শিক্ষা দান করে?
১৮। পৌরনীতি ও সুশাসন কীভাবে সুনাগরিকতার শিক্ষা দান করে?
১৯। দেশাত্মবোধ সৃষ্টিতে পৌরনীতি ও সুশাসনের ভূমিকা কতটুকু?
২০। সুশাসন বলতে কী বুঝ?
২১। G. Bilney প্রদত্ত সুশাসনের সংজ্ঞাটি লেখ।
২২। মারটিন মিনোগে প্রদত্ত সুশাসনের সংজ্ঞাটি লেখ ।
২৩। MacCorney প্রদত্ত সুশাসনের সংজ্ঞাটি লেখ।
২৪। জবাবদিহিতা কী?
২৫। পৌরনীতি হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা, যা নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও মানবতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে'-ই. এম. হোয়াইট প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা কর।
২৬। তুমি কি মনে কর যে, পৌরনীতি ও সুশাসন ইতিহাসের নিকট ঋণী?
২৭। ইতিহাস কীভাবে পৌরনীতি ও সুশাসনকে সমৃদ্ধ করেছে?
২৮। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক কী? –
২৯। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদগণ কেন মনে করেন যে, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক?
৩০। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির সাদৃশ্য বর্ণনা কর।
৩১। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির পার্থক্য বর্ণনা কর।
৩২। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক কী?
৩৩। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কী?
৩৪। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সাদৃশ্য বর্ণনা কর।

৩৫। পৌরনীতি ও সুশাসনের মধ্যে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক কী?
৩৬। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল কেন?
৩৭। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি কি একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, ব্যাখ্যা করে বল।
৩৮। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে আলোচ্য বিষয়ে মিল কতটুকু?
৩৯। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক কতটুকু নিবিড়?
৪০। পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে উৎপত্তিগত পার্থক্য কতটুকু?
৪১। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে আলোচ্য বিষয়ে মিল কতটুকু?
৪২। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের একে অপরের কতটুকু পরিপূরক?
৪৩। পৌরনীতি ও সুশাসন কীভাবে সমাজবিজ্ঞানকে সাহায্য করে?
৪৪। সমাজবিজ্ঞান সমাজের কী পর্যালোচনা করে?
৪৫। কী বিষয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজবিজ্ঞানের নিকট ঋণীঃ

প্রয়োগমূলক প্রশ্ন

১। পৌরনীতি ও সুশাসনের শিক্ষা তোমার বাস্তব জীবনে কেন প্রয়োজনীয়?
২। বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে কেন তোমার পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা উচিত?
৩। তোমার বাস্তব জীবনে পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রয়োগ দেখাও।
৪। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ তোমার জীবনকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারে তা আলোচনা কর।
৫। পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান ক'-কে কীভাবে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে?
৬। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের ফলে নাগরিকের মধ্যে কীভাবে দেশপ্রেম ও মানবতাবোেধ জাগ্রত হতে পারেঃ
৭। পৌরনীতি ও সুশাসন কীভাবে নাগরিকত্ববোধ, দেশাত্মবোধ ও মানবতাবোধ সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা কর।
৮। পৌরনীতি ও সুশাসন জনাব "গ"-কে কীভাবে নাগরিক চেতনা সম্পন্ন করে তুলেছেঃ
৯। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করেও কীভাবে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিকে পরিণত হয়েছে?
১০। পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান চ'-এর দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে কতটুকু প্রসারিত করেছে?-ব্যাখ্যা করে বল।
১১। পৌরনীতি ও সুশাসন কীভাবে অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত তা উদ্দীপকের/অনুচ্ছেদের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
১২। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাসের মধ্যে তুমি কি কোন পার্থক্য দেখতে পাও?
১৩। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে কি কোন পার্থক্য দেখতে পাও?
১৪। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে তুমি কি কোন পার্থক্য দেখতে পাও?
১৫। পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্য আলোচনা কর।
১৬। পৌরনীতি ও সুশাসন কেন ইতিহাসের কাছে ঋণী ব্যাখ্যা কর।
১৭। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ভূগোল কেন পারস্পরিক সম্পর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ? যুক্তি দিয়ে বোঝাও।
১৮। পৌরনীতি ও সুশাসনকে কেন সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়? যুক্তি পেশ কর।
১৯। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার জন্য অর্থনীতি কীভাবে সাহায্য করতে পারে? যুক্তি দিয়ে বোঝাও ।
২০। বাংলাদেশের সঠিক ও নির্ভুল রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে হলে কেন বাংলাদেশের পৌরনীতি ও সুশাসন জানতে হবে?—ব্যাখ্যা কর ।

উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ নাগরিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? যুক্তি দিয়ে বোঝাও ।
২। 'ক' কেন মনে করে যে, আধুনিক নাগরিকত্ববোধ সৃষ্টিতে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের কোন বিকল্প নেই–যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
৩। 'পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন অসম্ভব – ক ও খ এর মধ্যে এরূপ উপলব্ধি ঘটলো কেন—তা ব্যাখ্যা কর।
৪ । 'ক' জানতে পেরেছে সুনাগরিক হতে হলে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের কোন বিকল্প নেই'। 'ক' এর এই উপলব্ধির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

৫। পৌরনীতি ও সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা কর।
৬। পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান তোমার জীবনকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারবে? ব্যাখ্যা কর।
৭। পৌরনীতি হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা যা নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে'—ই.এম. হোয়াইটের এই সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা কর।
৮। পৌরনীতি ও সুশাসনকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।
৯। নাগরিকের জীবন ও কার্যাবলি যতদূর বিস্তৃত, অর্থাৎ যা কিছু নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করে, পৌরনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধি ততদূর প্রসারিত—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
১০। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান অর্জন তোমার জন্য কেন আবশ্যকীয় তা লিখ।
১১ । সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে পৌরনীতি ও সুশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর'—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
১২। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক'-উক্তিটি পরীক্ষা কর।
১৩। সকল শাসন পদ্ধতি তার অনুরূপ সম্পত্তি ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করে, একটির পরিবর্তন ঘটলে অপরটিরও পরিবর্তন সাধিত হয়।—প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ম্যাকাইভার-এর উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
১৪। একজন সমাজবিজ্ঞানীকে যেমন পৌরনীতি ও সুশাসন জ্ঞান রাখতে হয়, তেমনি একজন পৌরবিজ্ঞানীকেও সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান রাখতে হয়—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
১৫। ইতিহাস ব্যতীত পৌরনীতি ভিত্তিহীন এবং পৌরনীতি ব্যতীত ইতিহাস মূল্যহীন—অধ্যাপক সিলির উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ১৬। ন্যায়নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে যা অন্যায়, তা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক বা ন্যায় হতে পারে না"— ফকস্-এর উক্তিটির যথার্থতা পরীক্ষা কর।
১৭। মানুষের আচরণজনিত জটিল প্রশ্নগুলোর আলোচনায় মনস্তাত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করাই সাম্প্রতিককালের অন্যতম পন্থা–বার্কার-এর উক্তিটির যথার্থতা পরীক্ষা কর।
১৮। উদ্দীপক/অনুচ্ছেদের আলোকে পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যেকার সম্পর্কের গভীরতা পরীক্ষা কর।
১৯। উদ্দীপক/অনুচ্ছেদের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখাও যে, পৌরনীতি ও অর্থনীতি একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক।
২০। উদ্দীপক/অনুচ্ছেদের আলোকে পৌরনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্কের গভীরতার বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

সূচিপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুশাসন

গভর্নেন্স (Governance) একটি বহুমাত্রিক ধারণা যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, ক্ষেত্র এবং প্রেক্ষাপট থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গভর্নেন্সকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'শাসনের ব্যবস্থা' হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। 'গভর্নেন্স প্রপ্রঞ্চটির সাথে 'সু' প্রত্যয় যোগ করে সুশাসন' (Good Governance) শব্দটির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। এর ফলে সুশাসনের অর্থ দাড়িয়েছে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন। তবে সুশাসনকে একক কোনো ধারণার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত বা ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা সুশাসনের ধারণাটি হলো বহুমাত্রিক। বিভিন্ন তাত্ত্বিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থা সুশাসন ধারণাটির (concept) সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সুশাসন ধারণাটি বিশ্ব ব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম 'সুশাসন' (Good Governance) প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। এতে উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়ন চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে, সুশাসনের অভাবেই এরূপ অনুন্নয়ন ঘটেছে।

ম্যাককরনী (Maccorney) বলেছেন যে, সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়।' মোটকথা, প্রশাসনের যদি জবাবদিহিতা (Accountability), বৈধতা (Legilimacy), স্বচ্ছতা (Transparency) থাকে, এতে যদি অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, বাকস্বাধীনতাসহ সকল রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন (rule of law), আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা বা দায়িত্বশীলতার নীতি কার্যকর থাকে তাহলে সে শাসনকে 'সুশাসন' (Good Governance) বলে।
একটি আধুনিক ধারণা হিসেবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে রয়েছে বেশ কিছু সমস্যা বা বাধা। তবে সরকার ও জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় এসব সমস্যার সমাধান করে বা বাধা পেরিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

শিখন ফলঃ এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২। সুশাসনের সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩। সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা উত্তরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৫ । সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য মূল্যায়ন করতে পারবে।

৬। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দ (Key words):
বাকস্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক সহিংসতা, হরতাল,পিকেটিং, জ্বালাও-পোড়াও, আইনের শাসন(Rule of Law), offs corruption), রাজনৈতিক অঙ্গীকার, স্বজনপ্রীতি, সামরিক হস্তক্ষেপ (military intervention) জন অংশগ্রহণ, মিডিয়ার স্বাধীনতা, স্বাধীন কর্মকমিশন স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন।

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা

Problems of Good Governance

বর্তমান সময়ে প্রায় সব রাষ্ট্রই কল্যাণকর রাষ্ট্রের' (welfare state) রূপ পরিগ্রহ করছে। এরূপ কল্যাণকর রাষ্ট্রে জনগণের কল্যাণ ও ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে। দমন ও নিপীড়নের মাধ্যমে

মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র শাসন পরিচালনা করার দিন বদলে গেছে। শাসনের সাথে সেবা প্রদানের বিষয়টি এখন গুরুত্ব লাভ করেছে। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ যা কখনো আকস্মিকভাবে ঘটানো যায় না। একে অর্জন করতে হয় ধাপে ধাপে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো এখন সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দিচ্ছে। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলেও রয়েছে বহু সমস্যা। এগুলো নিম্নরূপঃ –

১. বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপঃ অধিকাংশ রাষ্ট্রেই, বিশেষ করে অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে তত্ত্বগতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও দেখা যায় যে, জনগণের বাক স্বাধীনতায় ক্ষমতাসীন সরকার হস্তক্ষেপ করে থাকে। জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে না। সংবাদপত্র তথা মিডিয়ার ওপর সরকার সেন্সরশীপ আরোপ করে। এর ফলে জনগণ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে পারে না। সরকার সব সময় মুক্ত আলোচনাকে ভয় পায় এবং বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। এর ফলে সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়।

২. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং সহিংসতা (Lack of Political Stability and violence)ঃ সদ্য স্বাধীন, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব লক্ষ করা যায়। নির্বাচিত সরকার নির্ধারিত মেয়াদ শেষের আগেই বিরোধী দলগুলো সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে। এসব আন্দোলন হয়ে ওঠে সহিংস। অকারণে হরতাল বা বন্ধ ঘোষণা এবং পিকেটিং, জ্বালাও-পোড়াও করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়। ফলে সময়ের আগেই সরকারের পতন ঘটে কিংবা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এর ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়। প্রশাসন ভেঙে পড়ে বা স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে সুশাসন ব্যাহত হয়।

৩.সরকারের জবাবদিহিতার অভাব (Lack of Accountability of the Govt.)ঃ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে এমনকি কোনো কোনো উন্নত রাষ্ট্রে জবাবদিহিতার অভাব লক্ষ করা যায়। লক্ষ করা যায় যে, সরকারের শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট জবাবদিহি করে না। মন্ত্রী ও আইনসভার সদস্যগণ একই দলের হওয়ায় এবং দলীয় শৃঙ্খলার কারণে জবাবদিহিতার বিষয়টি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এর ফলে সুশাসন বিঘ্নিত হয়।

৪. আমলাদের জবাবদিহিতার অভাবঃ আমলারা নিজেদেরকে জনগনের সেবক না ভেবে প্রভু ভাবেন। তারা নিজেদেরকে অভিজাত শ্রেণি বলে মনে করেন। তাদের মধ্যে জবাবদিহিতার মানসিকতা গড়ে না ওঠায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত হয়ে উঠেছে।

৫. আমলাতন্ত্রের অদক্ষতাঃ আমলাতন্ত্রে পূর্বের মতো দক্ষ, নিরপেক্ষ ও মেধাবী মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার প্রাধান্য, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব, আমলাদের কাজে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, রাজনীতিকরণ ইত্যাদি কারণে আমলার ক্রমশ অযোগ্য ও অদক্ষ হয়ে পড়ছে। ফলে সুশাসন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৬.আইনের শাসনের অভাব (Absence or Rule of Law) ঃ আইনের শাসনের মৌলিক তিনটি শর্ত রয়েছে। এগুলো হলো ক, আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান, খ. আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকা, গ. শুনানী গ্রহণ ব্যতীত কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। এই শর্ত তিনটি মেনে চললেই তবে বলা যাবে যে, আইনের শাসন কার্যকর রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আইনের শাসন কার্যকর থাকে না। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়ন মুক্ত স্বাধীন পরিবেশ ও নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকতে হয়। কিন্তু অনেক রাষ্ট্রেই এরূপ অবস্থা বিদ্যমান নেই।

৭. সরকারের অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা (Mismanagement of Govt)ঃ অনেক রাষ্ট্রেই দক্ষ ও যোগ্য সরকার সব সময় দেখতে পাওয়া যায় না। সরকারের অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা কিংবা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে দেশে অরাজকতা চলতে দেখা যায়। এর ফলে সুশাসন ব্যাহত হয়। যথার্থ নীতি প্রণয়নে সরকারের দক্ষতা, সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা শক্ত হাতে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, সমান সেবা বিতরণ, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন,আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তৎপর হওয়া, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা ইত্যাদি হলো কার্যকর সরকার বা দক্ষ সরকারের বৈশিষ্ট্য। এগুলোর অভাব ঘটলেই ধরে নিতে হবে সে দেশের সরকার অকার্যকর।

৮. দুনীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা **(Failure to Control Corruption)**ঃ বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সুশাসনের বড় অন্তরায় হলো দুনীতি। দুনীতির রাহুগ্রাস এসব রাষ্ট্রের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলছে। দুনীতির কারণে সম্পদের অপচয় হয়, বন্টনে অসমতা সৃষ্টি হয় এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। UNCAC-এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে,"দুনীতি সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে। কারণ এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা বিনষ্ট হয়, ন্যায়বিচার ও সবার সমান অধিকার, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হুমকির মুখে পড়ে।" অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দুনীতি দমন কমিশন বা ব্যুরো নামক প্রতিষ্ঠান থাকলেও সেগুলো স্বাধীন ও কর্মতৎপর নয়।

৯. রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব(Lack of Political Commitment)ঃ সদ্য স্বাধীন, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলেরই সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নেই। রাজনৈতিক নেতাদের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকে না, দলীয় ইশতেহারে যা লেখা থাকে তা বাস্তবায়িত করা হয় না, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা হয় তা পূরণ করার সদিচ্ছা থাকে না, রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠনে চরম উদাসীনতা দেখানো হয়। যুক্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে পেশি শক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা, শাসক ও বিরোধী দলসমূহের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ এবং এর পরে দেশজুড়ে সৃষ্ট সহিংসতা সমগ্র রাষ্ট্রে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ নষ্ট হয়।

১০. রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব এবং ব্যক্তিপূজা (Lack of Democratic culture in the Political Party) ঃ উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই অনেক দলে গণতান্ত্রিক চর্চা নেই। নেতা যা বলেন অধস্তন নেতা-কর্মীরা তা মেনে নিতে বাধ্য হন। কেননা তা না হলে তাকে দলের মধ্যেই কোণঠাসা করে রাখা হয়, পদ-পদবি থেকে বঞ্চিত করা হয় এমনকি দল থেকেই যেনতেন কারণ দেখিয়ে বহিষ্কার করা হয়। দলগুলোতে নিয়মিত কাউন্সিল করা হয় না অথবা করা হলেও নির্বাচনের পরিবর্তে দলীয় নেতার ওপরই পদপদবি বন্টনের একচ্ছত্র ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এর ফলে ব্যক্তিপূজা অর্থাৎ একক ব্যক্তির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দলে গণতন্ত্র চর্চার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। নেতা স্বৈরাচারী মনোভাবের অধিকারী হন। এরূপ স্বৈরাচারী নেতা ক্ষমতায় গিয়ে যে আচরণ করেন, যেভাবে দেশ পরিচালনা করেন তার ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকে না।

১১. রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ (Military intervention in Politics)ঃ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক রাষ্ট্রেই রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ-এর প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সামরিক শাসনামলে গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা হয় বা অকার্যকর করে রাখা হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত হয়ে পড়ে।

১২. স্বজনপ্রীতি (Napotism)ঃ বিশ্বের অনেক দেশেই স্বজনীতির ব্যাপক বিস্তার লক্ষ করা যায়। নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, সুযোগ-সুবিধা। বন্টন সম্মান-পদবি-খেতাব প্রদান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকার বা গোষ্ঠী স্বজনপ্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবী ব্যক্তিদের সেবা ও সহযোগিতা থেকে রাষ্ট্র তথা প্রশাসক বঞ্চিত হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

১৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকা (Absence of Independence of judiciary) : স্বাধীন বিচার বিভাগ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক। স্বাধীন বিচার বিভাগ না থাকায় বা বিচার বিভাগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পেলে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ বিনষ্ট হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার শেষ সুযোগটুকুও হাতছাড়া হয়।

১৪. জন অংশগ্রহণের(Lack of People's Participation)ঃ প্রশাসনে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের বা মতামত প্রদানের সুযোগের অভাব, জনগণের সাথে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের অভাব, গণমুখী প্রশাসন গড়ে তোলার অভাব, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী ও কার্যকর না করা প্রভৃতির ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

১৫.অকার্যকর জাতীয় সংসদ (Disrunctional Parliament)ঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়, বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। আইনসভা প্রণীত আইনের আলোকেই একটি দেশের প্রশাসনিক

কাজকর্ম পরিচালিত হয়। আইনসভার সদস্যগণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা জাতীয় সংসদে তুলে ধরবেন, সরকারের ভুলত্রুটি চিহ্নিত করবেন এবং সমাধান নির্দেশ করবেন। কিন্তু অনেক দেশে আইনসভা দুর্বল। অনেক দেশে শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আবার অনেক দেশে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ আইনসভা বয়কট করে রাজপথে আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী দলীয় জাতীয় সংসদ সদস্যগণ সংসদ বর্জন করে চলেছেন। যখনই যে দল বিরোধী দলের আসনে বসেন – সে দল বা জোটই সংসদ বর্জন করে রাজপথে মিছিল-মিটিং-হরতাল এমনকি জ্বালাও-পোড়াওয়ের মতো সহিংস পথে অগ্রসর হচ্ছেন। অথচ সংসদীয় গণতন্ত্রে সকল সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে সংসদে বসে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। ফলে জাতীয় সংসদ অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথও প্রশস্ত হচ্ছে না।

১৬. দারিদ্র্য (Poverty)ঃ দারিদ্র্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় বাধা। আর্থিক কারণে দরিদ্র জনগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। দরিদ্র ও অসচেতন জনগণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন থাকে। সুতরাং দারিদ্র্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় বাধা।

১৭. স্থানীয় সরকার কাঠামোর দুর্বলতা (weakness of local Government)ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হলো শক্তিশালী, দক্ষ ও কার্যকর স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। কিন্তু অনেক রাষ্ট্রেই, বিশেষ করে সদ্য স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে স্থানীয় সরকার কাঠামো খুবই দুর্বল ও অকার্যকর। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

১৮. জনসচেতনতার অভাব (Absence of Peoples awareness)ঃ জনগণের সচেতনতাই গণতন্ত্রের সফলতার মূল শক্তি। জনগণের সজাগ দৃষ্টি নাগরিক অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। এজন্যই জনসচেতনতা সুশাসনেরও চাবিকাঠি। জনগণ সচেতন না হলে সরকার, প্রশাসনযন্ত্র স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

১৯. ক্ষমতার ভারসাম্যের অভাব (Absence of Balance of Power) ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারের এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। এর ফলে সরকারের কোনো বিভাগের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করার প্রবণতা বাধাগ্রস্ত হবে। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া পৃথিবীর খুব কম রাষ্ট্রেই এরূপ ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি কার্যকর রয়েছে। এর ফলে অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

২০. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অভাব(Absence of Free & Neutral Election commission)ঃ অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই নির্বাচন কমিশন থাকলেও তা স্বাধীন বা প্রভাবমুক্ত এবং নিরপেক্ষ নয়। অনেক সময় নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকতে চাইলেও পারেন না। এর ফলে তাদের পক্ষে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠাও বাধাগ্রস্ত হয়।

২১. সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার অভাব (Absence of Freedom or Press) ঃ সুশাসনের জন্য প্রয়োজন স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম। স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম ছাড়া মানবাধিকার রক্ষা, মৌলিক অধিকার উপভোগের অনুকূল পরিবেশ রক্ষা, জবাবদিহিতার নীতি কার্যকর করা, প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সংবাদপত্রের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়।

২২. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব (Lack of Communal Harmony) ঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা বা সফল করা সম্ভব নয়। কেননা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে জঙ্গীবাদ, উগ্রতা, হিংস্রতা বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবে জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানবাধিকার ভুলুণ্ঠিত হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

সূচিপত্র

২.২ সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা সমাধানের উপায়

Measures to remove the problems of good governance

সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ

১. সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ ও তা বাস্তবায়ন ঃ বাক, ব্যক্তি স্বাধীনতাসহ সব ধরনের মৌলিক অধিকার সংবিধানে সন্নিবেশিত করতে হবে। শুধু তাই নয় এগুলো যেন কেউ ব্যক্তিস্বার্থে বা ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে খর্ব করতে না পারে সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমের ওপর সরকারি হস্তক্ষেপের অবসান ঃ অধিকাংশ রাষ্ট্রেই অকারণে ও সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে সরকার মিডিয়া ও প্রচার যন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ফলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জনমত গঠনের সুযোগ নষ্ট হয়, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়। সরকার আরো স্বৈরাচারী হয়। এ জন্য মিডিয়া ও প্রচার যন্ত্রের ওপর সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করতে হবে।

৩. সহিংসতা দূর ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ঃ রাজপথে সহিংস আন্দোলন করে, জ্বালাওপোড়াও নীতি অবলম্বন করে, অপ্রয়োজনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত হরতাল সংস্কৃতি চালু রেখে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খোঁজার কু-অভ্যাস বদলাতে হবে। জাতীয় সংসদে বসে এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায়েই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। সরকারের বিরোধিতার জন্য হরতালের বিকল্প উপায় খুঁজে বের করতে হবে। নির্বাচিত সরকারকে নির্বাচনের মাধ্যমেই সরানোর আশ্রয় নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সুশাসনের অন্তরায় ।

৪. জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা ঃ রাষ্ট্র পরিচালক বা সরকার থেকে শুরু করে প্রশাসনের সব স্তরে জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। লক্ষ্য অর্জনে কার কি দায়িত্ব এবং কোন সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করতে হবে, কার নিকট জবাবদিহি করতে হবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভাকে আইনসভার নিকট তাদের গৃহীত নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তা করতে ব্যর্থ হলে আইনসভায় অনাস্থা এনে মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যবস্থা বিধান করতে হবে। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ব্যর্থতার জন্য কী ব্যবস্থা নেয়া যাবে সেকথাও পরিষ্কার করে উল্লেখ থাকতে হবে।

৫. স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলা ঃ শাসন বা গভর্নেন্স-এর লক্ষ্য হবে স্পষ্ট, হীরকের মত স্বচ্ছ। শাসনের স্বরূপ, শাসকের কাজকর্ম, প্রণীত আইন-কানুন এমন হতে হবে যেন তা সকল নাগরিকের বোধগম্য হয়। এগুলো যেন কেউ ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থে বা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। দুর্নীতি দূর করে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে।

৬. নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা ঃ মানুষ সরকার এবং রাষ্ট্র প্রণীত আইন মেনে চলে শুধু শাস্তির ভয়ে নয়। মানুষ বিবেকবোধ, প্রজ্ঞা, উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ বিচার করেও রাষ্ট্র এবং সরকারকে মেনে চলে। নৈতিক মূল্যবোধ সরকার এবং সরকারের প্রশাসনযন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে পরিশীলিত করে। নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ও আমলা-প্রশাসকগণের আচরণ সীমা লংঘন করে না। তারা আইন অনুযায়ী, সংবিধান অনুযায়ী কাজ করেন। তারা সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তারা দুর্নীতিতে লিপ্ত হন না।

৭. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা : আইনের শাসনের প্রাণভোমড়া তিনটি প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে। এগুলো হলো শাসকের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশে ও আইনের শাসন প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ। আইন হতে হবে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট যেন সহজেই তা বোধগম্য হয় এবং সবাই তা পালন করতে বা মেনে চলতে পারে। আইন কার্যকর করবে আদালত। কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী বিচার কাজ চলবে না, তা চলবে আইনের আলোকে।

৮. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণ ঃ বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে বিচারক নিয়োগ করতে হবে। জেলা ও অধঃস্তন আদালতগুলোর বিচারক নিয়োগ করতে হবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে।

৯. সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ সরকারকে দক্ষ, দূরদর্শী ও কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তথ্যের সহজলভ্যতা সৃষ্টি করতে হবে, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০. দুর্নীতি প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ ঃ দুর্নীতির বিস্তার নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ করতে হবে। দুর্নীতি বিরোধী সভা-সমিতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতি বিরোধী আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে, প্রয়োজনে সিলেবাসে দুর্নীতি বিরোধী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়াও নৈতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারাজনগণের মনে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিকে ঘৃণা করার মানসিকতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১১. সুযোগ্য নেতৃত্ব ঃ দক্ষ, সৎ দূরদর্শী, অভিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, জনদরদি বা জনবান্ধব নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষিত, সৎ ও প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বের অভাবে একটি রাষ্ট্র কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন করতে পারে না।

১২. সার্বভৌম ও কার্যকর আইনসভা ঃ আইনসভার সার্বভৌমত্ব শুধু তত্বকথায় যেন পর্যবসিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। রাষ্ট্রের সকল সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে-আইনসভায় বসে যুক্তিতর্ক পেশ করে, আলাপআলোচনার মাধ্যমে। আইনসভাকে বাদ দিয়ে রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবিদাওয়া আদায়ের কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। অকারণে, ঘন ঘন সংসদ বয়কট বা এখান থেকে ওয়াকআউট করা যাবে না। সংসদে অনুপস্থিত থাকার সময়সীমা কমাতে হবে। সকল সদস্যের বিশেষ করে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের আলোচনার সুযোগ দিতে হবে।

১৩. জন অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ঃ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বনির্ভর ও স্ব-শাসিত করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নীতি প্রণয়নে নাগরিকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৪. স্বাধীন কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠা ঃ জনপ্রশাসনে নিয়োগ এবং পদোন্নতির জন্য মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থী বাছাই করতে হবে। এজন্য নিরপেক্ষ, সৎ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি সমন্বয়ে কর্মকমিশন গঠন করতে হবে।

১৫. স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ঃ রাজনৈতিক দল গঠন ও পরিচালনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করতে হবে। দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করতে হবে। দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা, স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।

১৬. স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ঃ মানবাধিকার লংঘন যেন না হয়, কারো ওপর যেন না করা হয়, সরকার যেন অন্যায়-নির্যাতন না করতে পারে—তা দেখার জন্য মানবাধিকার কমিশন গঠন হবে।

১৭. জনস্বার্থকে প্রাধান্য প্রদানঃ সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ সুশাসনের লক্ষ্য হওয়ায় এ প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। এ অংশগ্রহণ সম্ভবপর হয় যখন গভর্ন্যান্স উক্ত জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিণত হয়।

১৮. লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার বিবেচনায় পারঙ্গমতাঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার বিবেচনায় পারঙ্গম ও দূরদর্শী হতে হবে।

১৯. দারিদ্র্য দূরীকরণ ঃ দরিদ্র্য দূরীকরণে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২০. স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালীকরণ · স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে। স্থানীয় সরকারকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করার পাশাপাশি এর উপর থেকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করতে হবে।

২১. জনসচেতনতা বৃদ্ধি সুশাসন কী, কীভাবে সুশাসন নিশ্চিত করা যাবে, এক্ষেত্রে জনগণ ও সরকারের কী করণীয় সে সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২২. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য মৌলবাদী, জঙ্গী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলোর অপতৎপরতা নস্যাৎ করে দিতে হবে।

সূচিপত্র

২৩. ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয়

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ

১. সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশঃ সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ করতে হবে। বিশেষ করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলো ভোগের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে এবং তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে না। অর্থনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা না থাকলে নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে।

২. মত প্রকাশের স্বাধীনতাঃ প্রত্যেক নাগরিককে তার চিন্তা, মত ও বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। কেননা এসব অধিকার ব্যতীত কোন ব্যক্তি সভ্য ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে না। এসব অধিকারের অভাবে ব্যক্তিসত্তারও পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না।

৩. শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান ঃ সহিংসতার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যেন সমস্যার সমাধান বা দাবিদাওয়া মেটানো যায় তার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। আলোচনার পরিবেশ তৈরি ও সবসময় তা বজায় রাখতে হবে।

৪. দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা ঃ দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে শাসন বিভাগ সবসময় তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। আইনসভার আস্থা হারালে পদত্যাগ করবে। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার হলে সেক্ষেত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

৫. জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসনঃ দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সবসময় দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক আচরণ করবে।

৬. দক্ষ ও কার্যকর সরকারঃ দক্ষ ও কার্যকর সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার দক্ষ না হলে এবং কার্যকর প্রশাসন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে কোনোদিনই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

৭. জনসম্মতি ঃ সরকারের কাজের বৈধতা অর্থাৎ সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি জনগণের সম্মতি থাকতে হবে।

৮. সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে তৎপর হতে হবে। উচ্চাভিলাষী ও ভুল সিদ্ধান্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যাহত করে।

৯. স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা ঃ সরকারের কাজ এবং গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত হতে হবে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। জনগণ যেন সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বুঝতে পারেন। এরূপ হলে সরকারি কাজে জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

১০. একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিঃ একাধিক রাজনৈতিক দল থাকতে হবে এবং তারা যেন তাদের কার্যকলাপ স্বাধীনভাবে চালাতে পারে, মত প্রকাশ করতে পারে, সংঘটিত হতে পারে, তার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

১১. অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ঃ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। এজন্য নির্বাচন কমিশনকে মুক্ত, নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশনের হাতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

১২. ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ ঃ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব ও আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা দেখাতে হবে এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করতে হবে এবং তা প্রচার করতে হবে।

১৩. দক্ষ জনশক্তি ঃ আকস্মিক উদ্ভূত বিষয় মোকাবিলায় পারঙ্গম হতে হবে। এজন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে।

১৪. বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে সাবধানতা ঃ বিতর্কিত বিষয়ে সাবধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কোনো অবস্থায় যেন কোনো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তপ্ত করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১৫. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আইনের যথার্থ প্রয়োগ যেন ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৬. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। বিচারকদের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান এবং সামাজিক মর্যাদা প্রদান, বেতন-ভাতা প্রদান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে।

১৭. আইনসভাকে গতিশীল ও কার্যকর করা ঃ সংসদকে গতিশীল ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে দিতে হবে। সংসদ সদস্যদেরকে সংসদে বসেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। জাতীয় সংসদকে আইন প্রণয়নে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

১৮. সহিংসতা পরিহার ঃ রাজপথে সহিংস আন্দোলন, জ্বালাও-পোড়াও ছেড়ে সংসদে বসে আলোচনার টেবিলে সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।

১৯. স্পষ্ট ও সহজবোধ্য আইন প্রণয়ন ঃ এমন আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে হবে যেন তা হয় স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। আইন হবে সময়োপযোগী।

২০. ব্যাপক জনঅংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ঃ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কাজ ও নীতি প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত করে দিতে হবে এবং নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকতে হবে।

২১. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ঃ শক্তিশালী স্বশাসিত স্থানীয় সরকার গড়ে তুলতে হবে। এগুলোর ওপর ধরনের বাহ্যিক খবরদারি করা চলবে না। প্রশাসনিক কর্মকর্তা কিংবা জাতীয় সংসদ সদস্যদের খবরদারি না থাকাই শ্রেয়।

২২. সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন ঃ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। শুধু সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করলেই চলবে না, তা বাস্তবায়নও করতে হবে।

২৩. দারিদ্র্য দূরীকরণ ঃ সরকারকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বাস্তবসম্মত ও সুসমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২৪. জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ঃ সুশাসন সম্পর্কে, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে, সরকারের স্থায়িত্বশীলতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, জনগণকে অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে, সাম্প্রদায়িক শক্তির অপতৎপরতা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য সরকারের প্রচারযন্ত্রকে সবল করে তুলতে হবে।

২৫. ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ঃ সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য সংবিধানে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে ।

২৬. কার্যকর মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা ঃ স্বাধীন, ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন ও কার্যকর মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে আইনের শাসন ও মানবাধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

২৭. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি কোনো জঙ্গী, মৌলবাদী, অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তি যেন মাথাচাড়া দিতে না পারে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেন বিনষ্ট না হয়-সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সূচিপত্র

২.৪ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

Role of Citigens in order to establish good Governance

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিকার ভোগের বিনিময়ে নাগরিককে বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। একজন নাগরিক যখনই কোনো অধিকার ভোগ করতে চায় তখনই এর সাথে কিছু কিছু কর্তব্য পালনের বিষয়ও চলে আসে। অধিকার ও কর্তব্য সমাজবোধ থেকে এসেছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে শুধু সরকারকেই সচেষ্ট হতে হবে তা নয়। এজন্য নাগরিকেরও অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কেননা কর্তব্যবিমুখ জাতি কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপঃ

১. সামাজিক দায়িত্ব পালন ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি গড়ে ওঠে নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে। এগুলো হলো- সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং তা বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন বা নির্মাণ এবং তা পরিচালনা করা, সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং এতে অংশগ্রহণ করা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা, সমাজে বসবাসকারী মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত, পরমতসহিষ্ণু ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা ইত্যাদি হলো নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব।

২. রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন(Unconditional allegiance to the State)ঃ রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করা সকল নাগরিকের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাষ্ট্রের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলতে হবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে।

৩.আইন মান্য করা(Obedience to Law)ঃ রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আইন তৈরি হয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নততর সমাজজীবন প্রতিষ্ঠার জন্য। আইন অমান্য করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়। আইন শুধু নিজে মানলেই হবে না, অন্যেরাও যেন আইন মেনে চলে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪. সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন (selection of honest and qualified leadership)ঃ নির্বাচনে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সততা ও বিজ্ঞতার সাথে যোগ্য ও উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত করা উচিত। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

৫. নিয়মিত কর প্রদান (Regular Payment of Taxes)ঃ রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর বিভিন্ন ধরনের কর আরোপ করে। কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে রাষ্ট্রীয় কাজ সুসম্পন্ন হয়। নাগরিকগণ যদি স্বেচ্ছায় যথাসময়ে কর প্রদান না করে তাহলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে এবং সুশাসন বাধাগ্রস্ত হবে।

৬. রাষ্ট্রের সেবা করা (Public service) ঃ রাষ্ট্রের সেবা করা, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এবং রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত অবৈতনিক দায়িত্ব পালন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনগণের সেবা করা, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যে কোনো রাষ্ট্রীয় কাজে সহায়তা করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব।

৭. সন্তানদের শিক্ষাদান (To Educate the children) ঃ শিক্ষা ব্যতীত নাগরিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে না। শিক্ষা নাগরিককে কর্তব্য দায়িত্ব পালনে সচেতন করে। উপযুক্ত শিক্ষা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। পিতামাতার উচিত সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কুসংস্কার মুক্ত, পরমতসহিষ্ণু ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা, যেন তারা বড় হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮. রাষ্ট্রীয় উন্নয়ণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ(Participation in Development Activities)ঃ জনগণের জন্যই রাষ্ট্র। কাজেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। যে কোনো দুর্যোগে, আপদে-বিপদে জনগণকে তা মোকাবেলায় ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

৯. জাতীয় সম্পদ রক্ষা (Protect Public Property) ঃ রাষ্ট্রের সকল সম্পদই জনগণের সম্পদ (Public Property)। কাজেই জন সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হবে জনগণকেই। হরতালের সময় আবেগবশত কিংবা দুষ্কৃতিকারী ও অসৎ নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কেউ যেন রাষ্ট্রীয় তথা জনসম্পদ ভাংচুর বা বিনষ্ট করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধ্বংসাত্মক কাজে নিজে বিরত থাকতে হবে এবং অন্যদেরকেও বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১০. আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করা(to help law and order and Dicipline)ঃ দেশে যদি আইনশৃঙ্খলা দুর্বল হয় বা ভেঙে পড়ে তাহলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। এর ফলে সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়। এজন্যই সকল নাগরিককে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে চোর-ডাকাত-দুষ্কৃতিকারী, উগ্র, হিংস্র, জঙ্গীদের সন্ধান বা অবস্থান জানাতে হবে।

১১. সচেতন ও সজাগ হতে হবে (Become conscious and Alert) ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকগণকে সচেতন ও সজাগ হতে হবে। নাগরিকগণ সজাগ ও সচেতন হলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তাদের অধিকার হরণ করতে পারবে না, স্বেচ্ছাচারী হতে পারবে না, সরকার দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক আচরণ করতে বাধ্য হবে।

১২. সংবিধান মেনে চলা (To abide by constitution) ঃ সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সুতরাং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সকল নাগরিককে সংবিধান মেনে চলতে হবে, সবকিছুর ওপর সংবিধানকে স্থান দিতে হবে।

১৩. সুশাসনের আগ্রহ (Eagerness of Good governance)ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকদের আগ্রহ থাকতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একজন নাগরিককে প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশে দাড়াতে হবে, দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে, দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের পাশে এসে দাড়াতে হবে।

১৪. উদার ও প্রগতিশীল দলের প্রতি সমর্থন (selection of Liberal & Progressive Political Party) ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিককে উদার ও প্রগতিশীল দলের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে, সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয়দানকারী দল ও ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলতে হবে এবং ঘৃণা জানাতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো যেন হরতাল, ধর্মঘট, জ্বালাও-পোড়াও নীতি পরিহার করে এজন্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

২.৫ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব

Importance of Good Governance in Social, Political and Economic Sphere

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব ক্রমশ বেড়েই চলছে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. সামাজিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব ঃ প্রথমেই ধরা যাক সামাজিক ক্ষেত্রের কথা। সুশাসন ছাড়া সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলাও তা বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংষগ্রহণ, সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষিত, রুচিবান ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কেননা এগুলো সবই সম্ভব সুশাসিত সমাজ ও রাষ্ট্রে।

২. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব ঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইন না মানলে শাস্তি পেতে হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সব থেকে বড় কথা আইন মানুষের অধিকার উপভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে। আইনের উপস্থিতি ছাড়া উৎকৃষ্ট নাগরিক জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে আইন সঠিকভাবে কার্যকর করা যায় না এবং নাগরিক অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে সততা ও সতর্কতার সাথে একজন নাগরিক তার ভোটাধিকার প্রয়োগ ও প্রার্থী বাছাই করতে পারে না, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

সূচিপত্র

৩. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সহিংস আচরণ এবং হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও নীতি অবলম্বনের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়ন সহযোগী দাতা সংস্থাগুলো মুখ ফিরিয়ে নেয়, বিদেশি উদ্যোক্তারা এসব দেশে শিল্প-কলকারখানা স্থাপনে বা পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় এবং বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে মানুষের মনোবল ভেঙে যায়। মানুষ হতোদ্যম ও নিরাশ হয়ে পড়ে। সুশাসন না থাকলে সামনে একটি অন্যায় কাজ সংঘটিত হলেও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস ও মনোবল মানুষ হারিয়ে ফেলে। তরুণ ও যুবকশ্রেণি এর ফলে নিরাশ হয়ে পড়ে।

সুতরাং নাগরিক অধিকারগুলোকে উপভোগ করতে চাইলে, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে চাইলে, রাষ্ট্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে চাইলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ সবাইকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। সবাইকে সৎ, দুর্নীতিমুক্ত মন নিয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (McQ)

(√চিহ্নটি সঠিক উত্তর)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। দুর্নীতি দমনের জন্য প্রয়োজন–
ক. নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন

খ. দক্ষ কর্মকমিশন

গ. মানবাধিকার কমিশন

ঘ. স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন √

২। সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়—

ক. আইনের শাসন না থাকলে √

খ. অর্থ সম্পদ না থাকলে

গ.সুসজ্জিত সেনাবাহিনী না থাকলে

ঘ. জনসংখ্যা কম থাকলে

৩। সুশাসনের একটি সমস্যা হলো-

ক. বড় বড় অট্টালিকার অভাব

খ. সম্মোহনী নেতার অভাব

গ, জবাবদিহিতার অভাব √

ঘ. দাতা দেশগুলোর সমর্থনের অভাব

৪। সরকারের কার্যকারিতা নষ্ট হয়—

ক. টাকা পয়সার অভাবে

খ. নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতার অভাবে √

গ. বিরোধী দলের সহিংস আচরণের জন্য

ঘ. দাতা দেশগুলোর সাহায্য না দেওয়ার কারণে

৫। নিচের কোন দেশে অকারণে ক্ষতিকর হরতাল ডাকা হয়?

ক. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

খ, জার্মানি

গ. জাপান

ঘ. বাংলাদেশ √

৬। নিচের কোন দেশটি প্রায় এক যুগের অধিক সময় ধরে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েই চলছে?

ক. জার্মানি

সূচিপত্র

খ. সুইডেন

গ. দক্ষিণ কোরিয়া

ঘ. বাংলাদেশ √

৭। কোন তিনটি মহাদেশে বারবার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে?

ক. ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা

খ, এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন (দক্ষিণ) আমেরিকা √

গ. ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ওসেনিয়া

ঘ. উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া

খ. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

১. ছকটি দেখ এবং নিমের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

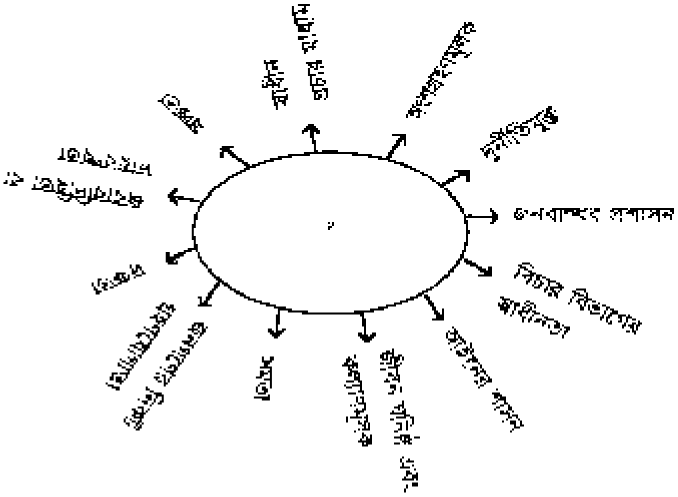

প্রশ্ন

ক. ছকের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির শূন্যস্থান পূরণ কর।

খ. সুশাসন কী?

গ. সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে কী কী সমস্যা দেখা দেয়? পত্র ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের পাশাপাশি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে-উক্তিটি কর ।

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য

Values, Law, Liberty and Equality

পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজ ও রাষ্ট্রের বিমূর্ত কিছু মৌল বিষয় বা ধারণা (concept) বা প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা করে। এ বিমূর্ত বিষয় বা প্রত্যয় বা ধারণা হলো মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য। এগুলো একটির সাথে অন্যটি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এর একটির সাথে অন্যটির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।

সমাজজীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যে সকল নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। যে সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা যত বেশি উন্নত, সে সমাজ ও রাষ্ট্র তত বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল। সুশাসনের সাথে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পর্ক খুবই নিবিড়।

মূল্যবোধ থেকে আসে আইন। আইন হচ্ছে নাগরিকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু বিধানের সমষ্টি যা রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক গৃহীত ও সমর্থিত এবং জনকল্যাণের জন্য অপরিহার্য। আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতার রক্ষক। জন লক বলেছেন যে, যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। স্বাধীনতার পাশাপাশি রয়েছে সাম্যের ধারণা। সাম্যের সাধারণ অর্থ হলো সমান। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নীতিগতভাবে স্বীকার করা হয় যে, সকল মানুষ সমান। পৌরনীতি ও সুশাসনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা এবং সকলকে সমানভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করাকে সাম্য বলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

শিখন ফল । এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২। মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।

৩। মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪ । মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে।

৫। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৬। নিজ জীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চায় আগ্রহী হবে।

৭। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৮। আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৯। স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে সম্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১০। স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১১। আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের পারস্পরিক সম্পর্ক মূল্যায়ন করতে পারবে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দ (key words)

মূল্যবোধ (values), সামাজিক মূল্যবোধ (social values), গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ(Democratic values), সামাজিক ন্যায়বিচার,শৃঙ্খলাবোধ, মর্যাদা, আইনের শাসন (Rule of Law), নাগরিক সচেতনতা, সুশাসন (Good Governance) প্রথা, ন্যায়বোধ, ফৌজদারি আইন (Criminal Law), নৈতিকতা, স্বাধীনতা (Liberty), সাম্য, সাংবিধানিক সরকার ইত্যাদি।

৩-১ মূল্যবোধ

Values

ধারণা ও সংজ্ঞা (conception and Definition) ঃ যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তাকেই আমরা সাধারণত মূল্যবোধ বলে থাকি। সমাজজীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যে সকল নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে মূল্যবোধের বিশেষ করে সামাজিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। স্টুয়ার্ট সি. ডড (Stuart c. Dodd) বলেন, "সামাজিক মূল্যবোধ হলো সে সব রীতিনীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে আশা করে এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে।"

এইচ. ডি. স্টেইন (H.D. stain)-এর মতে, “জনসাধারণ যার সম্বন্ধে আগ্রহী, যা তারা কামনা করে, যাকে তারা অত্যাবশ্যক বলে মনে করে, যার প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা বর্তমান এবং যা সম্পাদনের মাধ্যমে তারা আনন্দ উপভোগ করে তাকেই মূল্যবোধ বলে।"

এম. আর. উইলিয়াম M.R. william)-এর মতে, “মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড। এর আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই মানদণ্ডে সমাজে মানুষের কাজের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়।"

এম. ডব্লিউ. পামফ্রে-এর মতে, “মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তি বা সামাজিক দলের অভিপ্রেত ব্যবহারের সুবিন্যস্ত প্রকাশ।"

ক্লাইড কুখোন (Clyde Kluokhon)-এর মতে, “সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব প্রকাশ্য ও অনুমেয় আচারআচরণের ধারা যা ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত।"

নিকোলাস রেসার (Nicholas Rescher)-এর মতে, “সামাজিক মূল্যবোধ সেসব গুণাবলি, যা ব্যক্তি নিজের সহকর্মীদের মধ্যে দেখে খুশি হয় এবং নিজের সমাজ, জাতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে মূল্যবান মনে করে খুশি হয়।”

সমাজবিজ্ঞানী **জেন লেনন**-এর মতে, “সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কোনো স্থান বা এলাকার ধর্মীয়, ঐতিহ্যপূর্ণ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা জাতীয় গুণাবলিকে বোঝায়, যা ঐ স্থানের অধিকাংশ বা স্বল্পসংখ্যক লোক পালন করেন।"

(Social value embraces arrange of qualities for a place such as spiritual, traditional, economic, political or national qualities which are valued by the majority or minority group of the place.)

সমাজবিজ্ঞানী **এফ. ই. মেরিল** (F.E. Meri) বলেন, “সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিশ্বাসের এক প্রকৃতি বা ধরন, যা গোষ্ঠীগত কল্যাণে সংরক্ষণ করাকে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বলে ** ***" (A social value may be defined as a pattern of belief whose maintenance is considered important to group welfare.)

সুতরাং সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের সমষ্টি, যা সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে এবং সমাজজীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, সৌজন্যবোধ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি বা মানবীয় গুণাবলির সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল।

৩.২ মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Values

সামাজিক মূল্যবোধের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. সামাজিক মাপকাঠি মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করার ভিত্তিই হচ্ছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, চাল-চলন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার মাপকাঠি স্বরূপ।

সূচিপত্র

২. যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন ঃ মূল্যবোধ সমাজের মানুষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে। একই রীতিনীতি, আচারঅনুষ্ঠান ও আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের সকলে পরস্পর মিলিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে।

৩. নৈতিক প্রাধান্য ঃ মূল্যবোধ আইন নয়। এর বিরোধিতা বেআইনি নয়। এটা মূলত একপ্রকার সামাজিক নৈতিকতা। মূল্যবোধের প্রতি সমাজে বসবাসকারী মানুষের শ্রদ্ধাবোধ আছে বলে মানুষ এটা মেনে চলে।

৪. বিভিন্নতা ঃ মূল্যবোধ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। দেশ, জাতি, সমাজ ও প্রকৃতিভেদে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয় এবং স্থান, কাল, পাত্রভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেমন-পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরা স্লু পোশাক পরে আমাদের দেশে মেয়েদের জন্য সে পোশাক সমাজ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নয়।

৫. বৈচিত্র্যময়তা ও আপেক্ষিকতা ঃ মূল্যবোধ বৈচিত্র্যময় ও আপেক্ষিক। আজ যা মূল্যবোধ বলে পরিগণিত, কাল -সেভাবে বিবেচ্য নাও হতে পারে।

৬. পরিবর্তনশীলতা ও নৈর্ব্যক্তিকতাঃ মূল্যবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর পরিবর্তনশীলতা। সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর এ পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ অনুসৃত মূল্যবোধগুলোরও পরিবর্তন সাধিত হয়। অতীতের অনেক মূল্যবোধ বর্তমানে আমাদের কাছে অর্থহীন। যেমন- বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা। আবার বর্তমানের অনেক মূল্যবোধ ভবিষ্যতে নাও থাকতে পারে। মূল্যবোধ নৈর্ব্যক্তিক।

৩.৩ মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদান

Bases or Elements of Values

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে উপাদানগুলো মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদান বলে স্বীকার করা হয়, নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

১. নীতি ও ঔচিত্যবোধঃ সমাজ হচ্ছে স্বাভাবিক পরিবেশ, যাকে নৈতিকতা ও ঔচিত্যবোধের বিকাশ ভূমি বা শিক্ষাক্ষেত্র বলা যেতে পারে। নৈতিকতার সাথে তাই মূল্যবোধের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়। সমাজে কারও ক্ষতি না করা, কারো মনে কষ্ট না দেয়া, কটুক্তি না করা প্রভৃতি হচ্ছে নীতি ও ঔচিত্যবোধ নীতি ও ঔচিত্যবোধের অনুমোদন ব্যক্তি তার নিজের কাছ থেকেই পেয়ে থাকে। এর ফলে সে ন্যায়, অন্যায়, ভালো, মন্দ, উচিত, অনুচিতের পার্থক্য করে তার নিজের ভালো বা মঙ্গলের চেষ্টা করে ।

২. সামাজিক ন্যায়বিচারঃ সামাজিক ন্যায়বিচারের অর্থ, ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন সকলের প্রতি বিচারের মানদণ্ড এক ও অভিন্ন। আইনের চোখে সবাই সমান। সমাজে বসবাসকারী সকলের সুবিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হলেই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষিত হবে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি।

৩. শৃঙ্খলাবোধঃ সমাজজীবনের অগ্রগতির প্রধান সোপান হলো শৃঙ্খলাবোধ। বিশ্বে যে জাতি যত বেশি সুশৃঙ্খল সে জাতি তত বেশি উন্নত। সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ব্যক্তির নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয় এবং সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তাই সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবার থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালত, কলকারখানা, সর্বত্র শৃঙ্খলার প্রয়োজন। শৃঙ্খলা মানুষের মানবিক মূল্যবোধগুলোকে সুদৃঢ় করে সমাজজীবনকে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

৪. সহনশীলতাঃ সহনশীলতা সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। সহনশীলতা গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম মূল্যবোধ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও কিশের জন্য সহনশীলতা একান্ত অপরিহার্য। অন্যের মতামত ও মনোভাবকে শ্রদ্দা করার মত সহিষ্ণুতা থাকতে হবে। সহনশীলতা উত্তেজনা প্রশমিত করে সুখী ও সুন্দর সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

৫. সহমর্মিতাঃ সহমর্মিতা একটি অন্যতম মানবীয় গুন। এ অনুভূতি মানুষকে পারষ্পরিক সুখে-দুঃখে আপন করে এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করে । "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"-এটাই সহমর্মিতার মূল কথা। সহমর্মিতার অনুভূতি সমাজের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

৬. শ্রমের মর্যাদাঃ সব ধরণের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা করাকে শ্রমের মর্যাদা বলে। এটা একটা অন্যতম মানবিক ও সামাজিক গুন। উন্নত দেশগুলোতে যেভাবে শ্রমের মর্যাদা দেয়া হয় আমাদের দেশে এখনো তা প্রচলিত হয়নি। একজন দিনমজুরের শ্রম, কৃষকের শ্রম, শিক্ষকের শ্রম, অফিসারের শ্রম, ব্যবসায়ীর শ্রম সবই সমান মর্যাদার অধিকারী। শ্রমের মর্যাদা মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে সমাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে।

৭. আইনের শাসনঃ ব্যক্তির স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার রক্ষার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি তার সামাজিক মর্যাদা খুঁজে পাবে এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। আইনের শাসন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। এ.ভি.ডাইসি (A.V. Dicey) এর মতে, আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে, আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য একই আইন, কাউকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার না করা এবং বিনাবিচারে আটক না রাখা ।

৮. নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ ঃ নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ নাগরিকের অন্যতম গুণ। অধিকার ও কর্তব্য সচেতন নাগরিককে সুনাগরিক বলা হয়। সচেতন নাগরিকই বুঝতে পারেন যে, কোন প্রার্থী ভালো, কোন দল নির্বাচিত হলে তাদের অধিক কল্যাণ সাধিত হবে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকদের যেমন অধিকার দান করেছে । তেমনি তাদের নিকট কিছু কিছু কর্তব্যও দাবি করে। বস্তুত নাগরিককে কর্তব্য সম্পাদনের শর্তে অধিকার ভোগ করতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, আইন মেনে চলা, ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করা, নিয়মিত কর প্রদান কর । সরকারি কাজে অংশগ্রহণ এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা, নিজ সন্তানকে শিক্ষাদান করা, দুস্থ মানুষের সেবা করা প্রভৃতি । হলো নাগরিকের কর্তব্য। সুতরাং আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককেই সচেতন এবং কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে।

৯. সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতা ঃ আধুনিক যুগের রাষ্ট্রগুলো জনকল্যাণকর। নিরাপত্তা, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়াও বর্তমানে সব রাষ্ট্রই মানব কল্যাণমূলক কাজ করে থাকে। বর্তমান জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব হলো উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে তোলা, সুষম বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা, বেকার সমস্যার সমাধান করা, শিক্ষা খাতকে গুরুত্ব প্রদান করা, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদার করা, প্রান্তিক ও গরিব চাষিদের সাহায্য ও সহজশর্তে ঋণ প্রদান করা এবং জনগণের আত্মবিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১০. সরকার ও রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা ঃ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারকে হতে হবে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক । সরকার কী করতে চাচ্ছেন, কেন করতে চাচ্ছেন তা জনগণকে বোঝাতে হবেজনপ্রতিনিধিসভা বা আইনসভায় আলোচনা করতে হবে এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। তবে জনগণ তথা নাগরিকদেরও দায়িত্ব সচেতন হতে হবে।

৩-৪ মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ

Classification of Values

যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তাকেই আমরা সাধারণত মূল্যবোধ বলে থাকি। মূল্যবোধ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. সামাজিক মূল্যবোধ (social values) ঃ যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহ. ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। স্টুয়ার্ট সি. ডডএর মতে, সামাজিক মূল্যবোধ হলো সে সব রীতিনীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে আশা করে এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে। ক্লাইড কুখোন-এর মতে, সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব প্রকাশ্য ও অনুমেয় আচার-আচরণের ধারা যা ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত। নিকোলাস রেসার-এর মতে, সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব গুণাবলি যা ব্যক্তি নিজের সহকর্মীদের মধ্যে দেখে খুশি হয় এবং নিজের সমাজ,

জাতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে মূল্যবান মনে করে খুশি হয়। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, সৌজন্যবোধ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি বা গুণাবলির সমষ্টি ।

২. রাজনৈতিক মূল্যবোধ (Political values) ঃ যে চিন্তাভাবনা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের রাজনৈতিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে তার সমষ্টিকে রাজনৈতিক মূল্যবোধ বলে। রাজনৈতিক সততা, শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ, রাজনৈতিক সহনশীলতা, রাজনৈতিক জবাবদিহিতার মানসিকতা, দায়িত্বশীলতার নীতি কার্যকর করা, পরমতসহিষ্ণুতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতি সংখ্যালঘিষ্ঠের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান, সংখ্যালঘিষ্ঠের মতের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিষ্ণু আচরণ, বিরোধী মতকে প্রচার ও kk kBBBSBBYB আইনসভাকে কার্যকর হতে সাহায্য করা ইত্যাদি হলো রাজনৈতিক মূল্যবোধ ।

৩. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ (Democratic values) ঃ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেসব চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের গণতান্ত্রিক আচার-ব্যবহার ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এসব মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে অন্যের মতামত ও মনোভাবকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। কেননা সহনশীলতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের অন্যতম গুণ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিককে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বর্থ, গোষ্ঠীস্বর্থ ও দলীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়। গঠনমূলক সমালোচনা করার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমালোচনা সহ্য করার মানসিকতা ও সংযম গড়ে তুলতে হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানুষকে পারস্পরিক সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে দাড়াতে হবে। সবসময় ভাবতে হবে সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। শৃঙ্খলাবোধে বিশ্বাসী হতে হবে। অধিকার ও কর্তব্য সচেতন হতে হবে। সরকারকে তাদের নীতি ও সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক আচরণ বা মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। নির্বাচনে জয়-পরাজয়কে মেনে নিতে হবে। আইনসভাকে কার্যকর করতে হবে। হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও নয়, বরং আইনসভায় বসে আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সব সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।

৪. ধর্মীয় মূল্যবোধ (Religious values) : যে সব ধর্মীয় অনুশাসন, আচার-আচরণ ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে ধর্মীয় মূল্যবোধ বলে। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, অপরের ধর্মমতকে সহ্য করা, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম-কর্ম ও ধর্ম প্রচারে বাধা না দেয়া, রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ কোন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ভাবা এবং সেভাবে বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করাই হলো ধর্মীয় মূল্যবোধ।

৫. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ (Cultural values) : যে সব চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সাংস্কৃতিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বলে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার, কর্মকাণ্ড ও সংগঠন থাকতে পারে। সেগুলোর প্রতি সকলের শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে। সব ধরনের সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহ প্রদান করতে হবে। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে সংস্কৃতি চর্চায় বাধনিষেধ আরোপ করা উচিত নয়। তবে সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি চর্চা, পশ্চিমা সংস্কৃতির রুচিহীন চর্চা, আকাশ-সংস্কৃতির মন্দ দিকগুলোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারে।

৬. নৈতিক মূল্যবোধ (Moral values) ঃ নীতি ও উচিত-অনুচিত বোধ হলো নৈতিক মূল্যবোধের উৎস। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব মনোভাব এবং আচরণ যা মানুষ সবসময় ভালো, কল্যাণকর ও অপরিহার্য বিবেচনা করে মানসিকভাবে তৃপ্তিবোধ করে। সত্যকে সত্য বলা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলা, অন্যায়কে অন্যায় বলা, অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং অন্যকে বিরত রাখতে পরামর্শ প্রদান করা, দুঃস্থ মানুষের পাশে দাড়ানো, বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাড়ানো ও বিপদ থেকে উদ্ধারে তাকে সাহায্য করা, অসহায় ও ঋণগ্রস্ত মানুষকে ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করাকে নৈতিক মূল্যবোধ বলা যেতে পারে। শিশু তার পরিবারেই সর্বপ্রথম নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা পায়।

৭. অর্থনৈতিক মূল্যবোধ (Economic values) ঃ মানুষের যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন রয়েছে তেমনি রয়েছে অর্থনৈতিক জীবন। অর্থনৈতিক জীবনে তাকে কিছু কাজ-কর্ম করতে হয়, বিধি-নিষেধ, রীতি-নীতি ও আদর্শ মেনে চলতে হয়। এগুলোর সমষ্টিকেই বলা হয় অর্থনৈতিক মূল্যবোধ। আর্থিক লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প কলকারখানায় উৎপাদন ও বিপণনের সাথে এসব মূল্যবোধ জড়িত।

সূচিপত্র

৮. আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ (spiritual values) ঃ মানুষের কিছু আধ্যাত্মিক বা আত্মিক মূল্যবোধ রয়েছে। এজন্যই মানুষ ভালোভাবে, সৎভাবে বাঁচতে চায়, সৎ থাকতে চায় এবং সৎ মানুষকে পছন্দ করে, মিথ্যেবাদীকে ও অসৎ মানুষকে ঘৃণা করে, ভালো কাজ করতে পারলে মনে মনে স্বস্তি ও তৃপ্তিবোধ করে। অন্তর্নিহিত আত্মিক শক্তিই spiritual Power) মানুষকে এসবে উদ্বুদ্ধ করে। আত্মিক মূল্যবোধ সহজাত ।

৯. আধুনিক মূল্যবোধ (Modern values) ঃ সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর এ পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে। এজন্যই অতীতের অনেক মূল্যবোধই এখন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। অতীতে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল, এখন মানুষ বাল্যবিবাহকে অপছন্দ করে। রাষ্ট্র আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করে দিয়েছে। অতীতে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা, সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এগুলো আজ আর নেই। মূল্যবোধ এজন্যই নৈর্ব্যক্তিক। বর্তমানের অনেক মূল্যবোধ একদিন ভবিষ্যতে হয়তো থাকবে না। গড়ে ওঠবে নতুন মূল্যবোধ ।

৩-৫ মূল্যবোধ ও সুশাসন
Values and good Government

সমাজজীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যে সব নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে মূল্যবোধ বলে। মূল্যবোধ হচ্ছে শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, সৌজন্যবোধ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি বা মানবীয় গুণাবলির সমষ্টি। মূল্যবোধের সাথে সুশাসনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধের উন্মেষ ঃ মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধ-এর উন্মেষ ঘটায়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও মূল্যবোধ রক্ষা পায়। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ সমাজজীবনে অগ্রগতির প্রধান সোপান হলো শৃঙ্খলাবোধ। শৃঙ্খলাবোধ মানবিক মূল্যবোধগুলোকে সুদৃঢ় করে সমাজ জীবনকে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধ সুশাসনেরও বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয় উপাদান। যে সমাজ বা রাষ্ট্রে মূল্যবোধের এ দুটো উপাদান অনুপস্থিত সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

২. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ আইনের শাসন মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি তার সামাজিক মর্যাদা খুঁজে পাবে এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। আইনের শাসন সুশাসনেরও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় উপাদান। আইনের শাসন না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না।

৩. সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ঃ মূল্যবোধ সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে এবং সমাজজীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে।

৪.নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে ঃ মূল্যবোধ মানুষের নৈতিক গুণাবলি জাগ্রত ও বিকশিত করে।

৫. কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে ঃ কর্তব্যবোধ-মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান। কর্তব্যবোধ না থাকলে সুশাসনও প্রতিষ্ঠিত হয় না। এজন্যই নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধকে নাগরিকের অন্যতম গুণ বলা হয়।

৬. সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতা সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতাকে মূল্যবোধের যেমন উপাদন মনে করা হয় তেমনি তা সুশাসনেরও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বা বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়।

৭. জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে ঃ জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতাকে যেমন সুশাসনের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয় তেমনি তা মূল্যবোধেরও আবশ্যকীয় উপাদান মনে করা হয়।

সুতরাং সুশাসন পেতে হলে মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এজন্যই বলা হয় যে, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মূল্যবোধ ও সুশাসনের সম্পর্ক খুবই নিবিড়।

৩.৬ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
Democratic Values

ধারণা (concept) ঃ যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকেই আমরা সাধারণত মূল্যবোধ বলে থাকি। মূল্যবোধের বিভিন্ন দিক রয়েছে, যথা- সামাজিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রভৃতি। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেসব লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এসব মূল্যবোধ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এসব মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড। এসব মূল্যবোধের আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু তাই নয়, এ মানদণ্ডে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজের ভালোমন্দ বিচার করা হয়। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রে এসব মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাসকারী মানুষের এসব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে বলেই তারা এগুলোকে মেনে চলে।

নিচে কয়েকটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

ক. সহনশীলতা : সহনশীলতা গণতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সফল করার জন্য তা একান্ত অপরিহার্য। গণতন্ত্রের অন্যের মতামত ও মনোভাবকে শ্রদ্ধা করার মতো সহিষ্ণুতা থাকতে হবে। সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। উত্তেজনা প্রশমন ও সুখী সুন্দর সমাজ গঠনে সহনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ. আত্মসংযম ঃ আত্মসংযম সুনাগরিকের একটি বড় গুণ। এই মহৎ গুণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিককে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলীয় স্বার্থকে বিসর্জন দেয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়। গ্রহণ ও শ্রদ্ধার শিক্ষাই সংযম। একটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের অন্য দলের মতামত শোনা, তা প্রকাশ করতে দেওয়ার এবং তার -নমূলক সমালোচনা করতে দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। গঠনমূলক সমালোচনা সহ্য করার মানসিকতা বা -ষম থাকতে হবে। সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

গ.সহমর্মিতাঃ সহমর্মিতা একটি মানবীয় গুণ। সহমর্মিতার অনুভূতি একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাসকারী -নুষকে পারস্পরিক সুখে-দুঃখে আপন করে এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করে। সকলের তরে সকলে আমরা, -তাকে আমরা পরের তরে সহমর্মিতার এই অনুভূতিই গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

ঘ. শৃঙ্খলাবোধ ঃ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অগ্রগতির প্রধান ধাপ বা সোপান হলো শৃঙ্খলাবোধ। যে জাতি যত বেশি সুশৃঙ্খল সে জাতি তত বেশি উন্নত। সমাজ বা রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ব্যক্তির নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। এর ফলে রাষ্ট্রের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

ঙ. আইনের শাসনঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবশ্যই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার রক্ষার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। আইনের শাসন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি তার --মাজিক মর্যাদা খুঁজে পাবে এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবে।

চ. নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধঃ অধিকার ও কর্তব্য সচেতন নাগরিককে সুনাগরিক বলা হয়। সচেতন -শরিক বুঝতে পারেন কোন দল তাদের জন্য ভালো এবং কোন প্রার্থী ভালো। দেশের জন্য কেমন শিক্ষাব্যবস্থা, -জনীতি, শ্রমনীতি, বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করা উচিত এবং তা কোন দলের মাধ্যমে তারা যেতে পারেন তা একজন -চতন নাগরিক বুঝতে পারেন। এজন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিককে সচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ হতে হয়।

ছ. রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলোর একে অপরের প্রতি -দ্ধাবোধ থাকতে হবে। অপরের মতামত প্রকাশের অধিকারকে শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। নিজ দলের নেতা-কর্মীকে এ ত্রয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

জ. জনগণের রায় বা নির্বাচনি ফলাফলকে মেনে নেওয়া ঃ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচনের বিকল্প নেই। নির্বাচনে জনগণের রায়কে মেনে নিতে হবে। জয়-পরাজয়কে মেনে নিতে হবে। পরাজিত হলে নির্বাচনের

ফলাফলকে মেনে নিয়ে খুঁজে দেখতে হবে-কেন জনগণ তাদের দলকে বর্জন করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতামতকে প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে।

ঝ. দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা ঃ সরকারকে তাদের নীতি ও সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্বশীল ও আচরণ বা মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তাদের কর্মকাণ্ড হতে হবে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত।

৩-৭ - গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গুরুত্ব

Importance of Democratic Values

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। যে সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা যত বেশিউন্নত, সে সমাজ ও রাষ্ট্র তত বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গুরুত্ব নিম্নরূপঃ

১. জাতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তি : গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হলো একটি জাতির রাজনৈতিক সম্পদ। --তান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর একটি জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে।

২. জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন জকর্মঠ ও পরিশ্রমী হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ জাতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে।

৩. দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিজের প্রতি দেশের প্রতি প্রেম-ভালোবাসার সৃষ্টি করে। দেশকে ভালোবাসা ও দেশের মঙ্গলের জন্য কর্তব্য পালন করার তাগিদ সু হয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে।

৪. সামাজিক বন্ধন ও জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করে : গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রত্যেকের প্রতি প্র সৌভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করে। এর ফলে সামাজিক বন্ধন এবং জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

৫. নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য এবং পরিপূর্ণতা প্রদান করে।

৬. উদারতা ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয় ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ফলে রাজনৈতিক সততা, শিষ্টাচার সৌজন্যবোধ, রাজনৈতিক সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতি সংখ্যালঘিষ্ঠের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সংখ্যালঘিষ্ঠের মতের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিষ্ণু আচরণ, বিরোধী মতকে প্রচার ও প্রসারের সুযোগ প্রদান, নির্বাচনে জয়পরাজয়কে মেনে নেয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। এর ফলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

৭. জবাবদিহিতার মানসিকতা ও দায়িত্বশীল আচরণ ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ফলে নাগরিকদের ম: জবাবদিহিমূলক মানসিকতা দায়িত্বশীল আচরণের সৃষ্টি হয়। যারা সরকার পরিচালনা করেন তারা তাদের কাজের জনপ্রতিনিধিদের নিকট তথা জনগণের নিকট তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করেন, আইনসভায় জনপ্রতিনিধিদের উত্তর দেন বা কৈফিয়ত প্রদান করেন। সরকার এবং বিরোধী দল দায়িত্বশীল আচরণ করে।

৮. শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করে ঃ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ধাপ বা সোপান শৃঙ্খলাবোধ। যে জাতি যত বেশি সুশৃঙ্খল সে জাতি তত বেশি উন্নত। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ একটি জাতিকে শৃ হতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়।

৯. নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নির্বাচনি রায় বা জনগণের ম্যান্ডেটকে নেওয়ার মানসিকতা, সরকারকে নির্দিষ্ট মেয়াদে কাজ করতে দেওয়া এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকার গঠন ও বিশ্বাসী করে তোলে।

সুতরাং একটি সুখী, সুন্দর গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হলে সে সমাজ ও রাষ্ট্রে মানবিক, নৈতিক = সামাজিক মূল্যবোধের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।

সূচিপত্র

৩.৮ সুশাসন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

Good Governance and Democratic value

সুশাসন যেমন গণতন্ত্রের প্রাণ, তেমনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও সুশাসনের প্রাণ। উভয়ের সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে আলোচনা করা হলো ঃ

১. জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার ওপর গুরুত্ব আরোপ ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। যে সরকার ব্যবস্থায় বা প্রশাসনে জবাবদিহিতার নীতি কার্যকর হয় এবং যে সরকার ও প্রশাসন যত বেশি স্বচ্ছ সেখানে তত বেশি সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. দায়িত্বশীলতার নীতি কার্যকর হয় ঃ দায়িত্বশীলতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রাণ। গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্বশীল বলেই সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

৩. পরমতসহিষ্ণুতার পরিবেশ তৈরি হয় : গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান হলো তা -সহনশীলতা। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পরমতসহিষ্ণু হতে সাহায্য করে বলেই সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়।

পারষ্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে হবেঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জনগনের মধ্যে পারষ্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি করে। সরকারি দল ও বিরোধী দলের পারষ্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হলে রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

৫. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ঃ আইনের শাসন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান। আইনের শাসন না -লে একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়।

৬. মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করে ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের -ত শ্রদ্ধাশীল। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পরিবেশ তৈরি হয়।

৭. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সফলতার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত -অত্যাবশ্যক। অপরদিকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথাও চিন্তা করা যায় না।

সুশাসনের সাথে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পর্ক এজন্য খুবই নিবিড়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত না হলে গণতন্ত্র সফল বা অর্থবহ হয়ে ওঠে না। তেমনি সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলেও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো বিকশিত হয় না।

৩.৯ আইনের ধারণা ও সংজ্ঞা

Conception and Definition of Law

আইনের সাধারণ অর্থ হলো নিয়ম-কানুন বা বিধি-বিধান। ফার্সি আইন' শব্দটির অর্থ সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম। ইনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Law, ইংরেজি aw শব্দটির আভিধানিক উৎপত্তি টিউটনিক মূল শব্দ Lag থেকে। Law দের অর্থ স্থির বা অপরিবর্তনীয় এবং সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য' । সমাজের আইন কানুনও স্থির। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিবা-রাত্রি, জোয়ার-ভাটা সবই স্থির নিয়মের অধীন। সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় এক নিয়মের রাজত্ব বিরাজমান। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানোর ক্ষমতা কারো নেই। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রও একটি প্রতিষ্ঠান। সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সমাজজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সুস্থ রাষ্ট্রীয় জীবনযাপনের জন্য মানুষকে কিছু কিছু বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এসব বিধি-নিষেধ বা নিয়মভানুনকে আইন বলে। সুতরাং আইন হচ্ছে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মের সমষ্টি যা সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এরিস্টটল বলেছেন, "যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন।" (Law is the passionless reason)। টমাস হবস, জঁ্যা বোঁদা,

অধ্যাপক হল্যান্ড, জন অস্টিন প্রমূখ "বিশ্লেষণপন্থি লেখক" আইনকে "সার্বভৌম শক্তির আদেশ" বলে বর্ণনা করেছেন।

টমাস হবস (Thomas Hobbes)-এর মতে, "জনগণের ভবিষ্যৎ কার্যাবলি নির্দিষ্ট করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ যে আদেশ প্রদান করে তাই আইন"।

অধ্যাপক **হল্যান্ড** (Prof. Holand)-এর মতে, "আইন হচ্ছে, সেই সাধারণ নিয়ম যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যা প্রয়োগ করেন। " (A Law is a general rule of external action orced by the sovereign political authority.)

জন অস্টিন (John Austin) বলেন, "আইন হচ্ছে নিম্নতমের প্রতি উর্ধ্বতন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আদেশ " (Law – the command of the political superior i.e. sovereign to the political inferior.)

স্যার হেনরি মেইন, স্যাভিনি (Savigny), মেইটল্যান্ড, স্যার ফ্রেডরিক পোলক প্রমূখ "ঐতিহাসিকপন্থি লেখকের" (Historical School) এর মতে রাষ্ট্রের মধ্যে সাংবিধানিক আইন, সাধারণ আইন, প্রথা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের আইন রয়েছে। এসব আইনকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে গণ্য করা যায় না।

অধ্যাপক স্যালমন্ড (Prof. Salmond)-এর মতে, "ন্যায় সংরক্ষণের তাগিদে রাষ্ট্র যেসব নীতি স্বীকার করে এবং প্রয়োগ করে তাই আইন।"

অধ্যাপক গেটেল (Prof. Gette) বলেন, "রাষ্ট্র যেসব নিয়ম-কানুন সৃষ্টি বা স্বীকার করে এবং বলবৎ করে তাই শুধু আইন বলে পরিগনিত হয়।" (Only those rules which the state creates or which as recognises, enforces become law.)

আইনের একটি সর্বজনগ্রাহ্য ও চমৎকার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি **উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson)**। তার মতে, "আইন হলো মানুষের স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার সেই অংশ যা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে।" (Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of the government.)

সুতরাং আইন হচ্ছে নাগরিকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু বিধানের সমষ্টি, যা রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক গৃহীত ও সমর্থিত এবং জনকল্যাণের জন্য অপরিহার্য। আইন হচ্ছে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মের সমষ্টি যা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করে থাকে।

৩.১০ আইনের উৎস

Sources of Law

জন অস্টিনের মতে, আইনের উৎস একটি এবং তা হচ্ছে সার্বভৌমের আদেশ। অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে, আইনের উৎস হলো ছটি; যথা ঃ (১) প্রথা, (২) ধর্ম, (৩) বিচারকের রায়, (৪) ন্যায়বিচার, (৫) বিজ্ঞানসন্মত আলোচনা, (৬) আইনসভা। ও**পেনহাইম** জনমতকেও আইনের উৎস বলে মনে করেছেন। কেননা জনমতের প্রভাবে অনেক সময় সরকার আইন প্রণয়ন বা প্রচলিত আইন পরিবর্তন ও সংশোধন করে থাকে ।

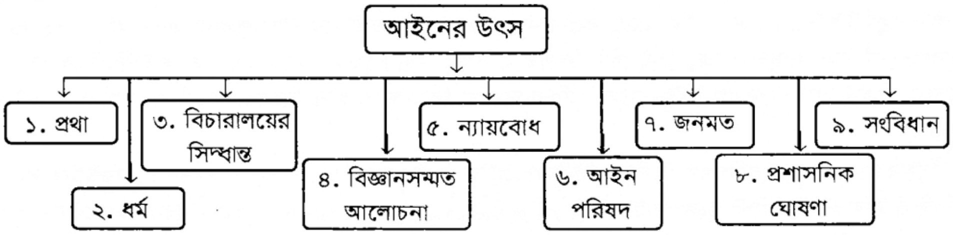

আইনের উৎসসমূহ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

সূচিপত্র

১. প্রথা (Custom) ঃ প্রথা আইনের একটি সুপ্রাচীন উৎস। প্রাচীনকাল থেকে যেসব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজে অধিকাংশ জনগণ কর্তৃক সমর্থিত, স্বীকৃত ও পালিত হয়ে আসছে, তাকে প্রথা বলে। প্রাচীনকালে কোনো আইনের অস্তিত্ব ছিল না। তখন প্রচলিত প্রথা, অভ্যাস ও রীতি-নীতির সাহায্যে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো। কালক্রমে অনেক প্রথাই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে আইনের মর্যাদা অর্জন করে। গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ আইন এরূপ প্রথাভিত্তিক ।

২. ধর্ম (Religion) ঃ ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের জীবনবোধের খুব গভীরে নিহিত থাকায় অনেক বিধি-নিষেধ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এ সমস্ত ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ রাষ্ট্রীয় সমর্থন লাভ করে পরে আইনে পরিণত হয়। প্রাচীন রোমক আইন ধর্মীয় বিধানের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু ছিল না। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি আইন ধর্মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মুসলিম আইন প্রধানত কুরআন ও সুন্নাহর ওপর নির্ভরশীল। পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনগুলো মূলত ধর্ম থেকে এসেছে।

৩. বিচারালয়ের favors (Judicial Dicision or Adjudication) ঃ বিচারকরা দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকেন। অস্পষ্ট শব্দগত ব্যাখ্যার কারণে অথবা পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচারকরা যখন দেশে বিরাজমান আইন দ্বারা মামলা মকদ্দমার নিস্পত্তি করতে সমর্থ হন না, তখন তারা নিজেদের বিবেক, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা থেকে নতুন নতুন আইন সৃষ্টি করেন এবং প্রয়োজনবোধে আইনের যথার্থতা বিশ্লেষণ করেন। পরবর্তীতে এসব বিচারক প্রণীত আইন' (Judge-Made law) অন্যান্য বিচারকগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি মার্শাল, হিউজেস প্রমুখ বিচারক এভাবে বহু নতুন আইন সৃষ্টি করেছেন।

৪. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (Scientific Discussion) ঃ প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান ও সারগর্ভ আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং লিখিত গ্রন্থসমূহ আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে। বিচারকরা যখন কোনো বিতর্কিত জটিল বিষয়ে আইনজ্ঞদের এসব মতামত গ্রহণ করেন তখন তা প্রচলিত আইনের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ডের কোক ও ব্লাকস্টোন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্টোরি ও কেন্ট প্রমুখ আইনবিদের ব্যাখ্যা উভয় দেশের আইনের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম আবু হানিফার ব্যাখ্যা, হেদায়া-ই-আলমগিরি প্রভৃতি গ্রন্থ ইসলামি আইনের ব্যাখ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. ন্যায়বোধ (Equity) ঃ আইন নির্দিষ্ট ও স্থিতিশীল বিধান। কিন্তু সমাজজীবন পরিবর্তনশীল ও গতিময়। দেশে প্রচলিত আইন যখন যুগোপযোগী বিবেচিত হয় না বা পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে কঠোর বা অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে বিচারকরা তখন তাদের শুভবুদ্ধি, সচেতন বিচারবুদ্ধিমাফিক সেই আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন কিংবা নতুন আইন তৈরি করেন। বিচারকের ন্যায়বোধ থেকে এভাবে অনেক নতুন আইন প্রণীত হয়েছে।

৬. আইন পরিষদ (Legislature) ঃ আধুনিককালে আইনের প্রধানতম উৎস হচ্ছে আইন পরিষদ। আইনসভা জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন করে। আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইনের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন। আইন পরিষদ শুধু নতুন আইন তৈরি করে না, পুরনো আইন সংশোধন করে তা যুগোপযোগী করে তোলে ।

৭. জনমত (Public opinion) ঃ ওপেনহাইম, হল প্রমুখ মনীষী জনমতকে আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন প্রকৃতপক্ষে জনমতের অভিব্যক্তি। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত আইনসভার সদস্যদের প্রধান দায়িত্ব হলো জনমতের যথার্থ প্রতিফলন। আইন প্রণয়নের সময় তাই জনমতের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়।

৮. প্রশাসনিক ঘোষণা (Administrative declaration) ঃ বর্তমানে আইন বিভাগের দায়িত্ব ও পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। এই জটিলতার কারণে আইন বিভাগ তার কর্তব্য সুচারুরূপে সমাধা করতে সমর্থ হয় না। তাই আইনসভা তার নির্বাহী কর্তৃত্বের বহুলাংশ শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের হাতে অর্পণ করে। এভাবে অর্জিত ক্ষমতাবলে জারিকৃত ঘোষণা ও আইনসমূহকে প্রশাসনিক আইন বলে।

৯. সংবিধান (Constitution) ঃ সংবিধান আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সংবিধানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও কাজের পরিধি সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। সংবিধানের নির্দেশিত পথ ধরে আইনসভা আইন তৈরি করে।

৩.১১ আইনের শ্রেণিবিভাগ

Classification of Law

আইনজ্ঞ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানিগণ বিভিন্নভাবে আইনের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। কাজের পরিধি এবং ধরনের ভিত্তিতে অধ্যাপক হল্যান্ড আইনকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন; যথা ঃ (ক) জাতীয় আইন (Municipal Law) এবং (খ) আন্তর্জাতিক আইন (International Law)। জাতীয় আইনকে আবার তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা ঃ

(ক) সরকারি আইন (Public Law) এবং (খ) বেসরকারি বা ব্যক্তিগত আইন (Private Law)। সরকারি আইনকে তিনি আবার তিনভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা ঃ (ক) শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law), (খ) শাসনসংক্রান্ত আইন (Administrative Law) এবং (গ) ফৌজদারি আইন (Criminal Law)।

অধ্যাপক ম্যাকাইভার শাসনসংক্রান্ত আইনকে সরকারি আইনের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। তবে তিনি শাসনতান্ত্রিক আইনকে সরকারি আইন বলে স্বীকার করেননি।

আইনের আধুনিক শ্রেণিবিভাগ নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো ঃ

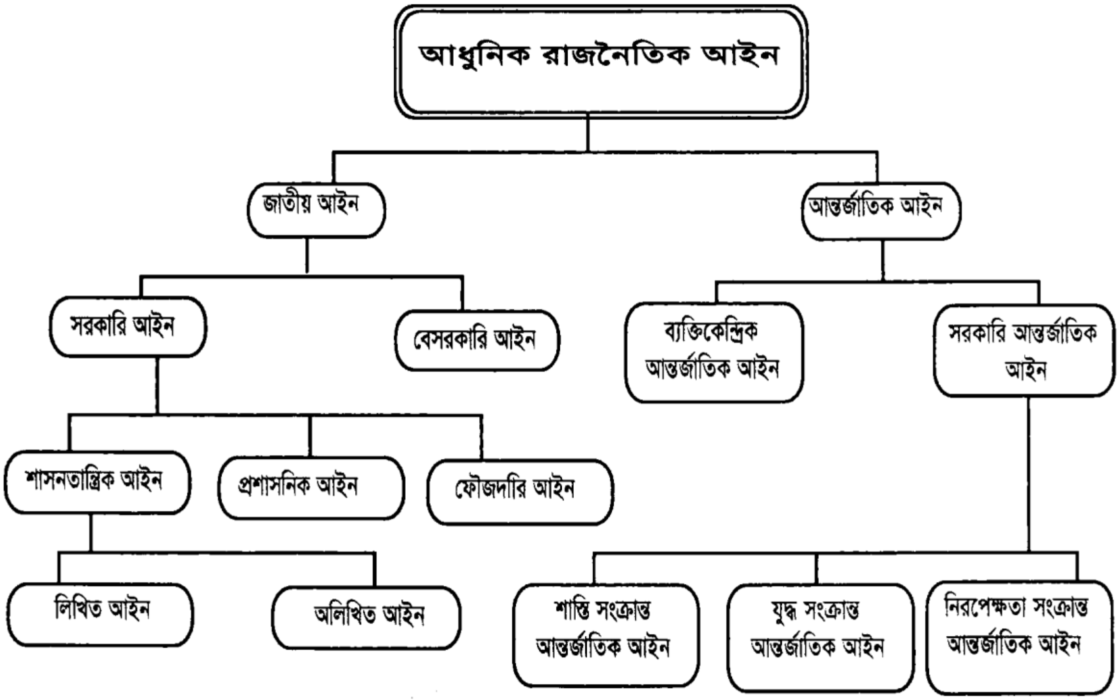

জাতীয় আইন (Municipal Law) ঃ জাতীয় আইন হচ্ছে সেসব আইন যা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রয়োগ ও কার্যকর হয়। জাতীয় আইন সরকারি কিংবা বেসরকারি দু'রকমের হতে পারে।

আন্তর্জাতিক আইন (International Law) ঃ যে আইনের দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয় তা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন।

সূচিপত্র

শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law) ঃ যে নীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে সাংবিধানিক আইন বলে। এই আইন দ্বারা সরকার গঠন, ক্ষমতা বন্টন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও সীমারেখা নির্ধারিত হয়। শাসনতান্ত্রিক আইন লিখিত এবং অলিখিত-দু প্রকারের হতে পারে।

প্রশাসনিক আইন (Administrative Law) ঃ ব্যক্তি এবং শাসন কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক নির্ধারণকারী আইনই হচ্ছে শাসন সংক্রান্ত আইন। এই আইন রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ। শাসন সংক্রান্ত আইন শাসন বিভাগের গঠন ক্ষমতার পরিধি নির্ধারণ করে এবং ব্যক্তিগত অধিকার ভঙ্গের বেলায় প্রতিকার নির্দেশ করে।

ফৌজদারি আইন (Criminal Law) ঃ সমাজে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, নাগরিক জীবনে নিরাপত্য বিধান এবং অপরাধীকে দণ্ড দেয়ার জন্য প্রণীত আইনকে ফৌজদারি আইন বলে।

৩.১২ আইন মান্য করার কারণ

Reasons for Obeying Law

আইন কেন মেনে চলা হয়- এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে। হবস, বেন্থাম, অস্টিন প্রমুখ লেখক মনে করেন যে, “মানুষ আইন মেনে চলে শাস্তির ভয়ে।” হবসের মতে, “আইন না মেনে চললে সমাজে পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এ জন্যই মানুষ আইন মেনে চলে।” অস্টিনের মতে, লোকে আইন মেনে চলে, কেননা তা রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত এবং প্রযুক্ত। আইন ভঙ্গ করলে অভিযুক্ত এবং শাস্তি পেতে হয়।

মার্কসবাদীদের মতে, উৎপাদনের উপাদানগুলো যাদের হাতে থাকে তারাই সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারাই নিজেদের শ্রেণি স্বার্থে বা প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জনগণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করে। অপরদিকে জ্যা জ্যাক রুশো, টি. এইচ. গ্রিন প্রমুখ লেখক মনে করেন যে, কতগুলো সুস্পষ্ট যুক্তির কারণেই মানুষ আইন মেনে চলে। আইন ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করে এবং এর পিছনে জনমতের সমর্থন রয়েছে বলে মানুষ আইন মেনে চলতে আগ্রহী হয়।

উপরোক্ত মতবাদগুলো চরম ও একপেশে মতবাদ। এসব মতবাদের সমন্বয় সাধন করে স্যার হেনরি মেইন বলেছেন যে, শাস্তির ভয় এবং যৌক্তিকতার উপলব্ধি উভয় কারণেই মানুষ আইন মেনে চলে। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) মনে করেন যে, নির্লিপ্ততা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, শাস্তির ভয় এবং যৌক্তিকতার উপলব্ধি–এই পাঁচটি কারণে মানুষ আইন মেনে চলে ।

মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার উপভোগ করতে সাহায্য করা, স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা এবং সুন্দর সুশৃঙ্খল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গঠনে সাহায্য করে বলেই মানুষ আইন মেনে চলে। আইনের উপস্থিতি ছাড়া মানুষের পক্ষে উৎকৃষ্ট জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এজন্য এরিস্টটল বলেছেন যে, “মানুষ যখন আইন ও নৈতিকতা থেকে দূরে থাকে, তখন সে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়।” জন লক বলেছেন, “যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।" আইন স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক। মানুষ তাই আইন মেনে চলে।

৩-১৩ নৈতিকতা

Morality

নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘Morality” । ইংরেজি Morality শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ‘Moralitas' থেকে যার অর্থ সঠিক আচরণ বা চরিত্র। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল সর্বপ্রথম নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। সক্রেটিস বলেছেন, সৎ গুণই জ্ঞান (virtue is knowledge)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা অন্যায় করতে পারেন না এবং ন্যায় বোধের উৎস হচ্ছে জ্ঞান (knowledge) এবং অন্যায়বোধের উৎস হচ্ছে অজ্ঞতা (ignorance)। পরবতীতে রোমান দার্শনিকরা প্রথাগত আচরণের অর্থে "mas’ কথাটি ব্যবহার করেন। ল্যাটিন এই "mas’ শব্দ থেকেই Morals ও Morality (নৈতিকতা) শব্দের উদ্ভব ঘটেছে।

জোনাথন হেইট (Jonathan Haidt) মনে করেন, “ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ–তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব হয়েছে।’নীতিবিদ মুর বলেছেন, শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা।

Cambridge International Dictionary of English-তে বলা হয়েছে যে, নৈতিকতা হলো, "ভাল-মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি গুণ, যা প্রত্যেক ব্যক্তিই আইন কিংবা অন্য কোনো বিষয়ের থেকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

নৈতিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **Collins English Dictionary**-তে বলা হয়েছে যে, "Morality is concerned with on negating to human behaviour, esp. the distinction between good and bad and right and wrong behaviour."

ধারণা ঃ নৈতিকতা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত ধ্যান-ধারণার সমষ্টি যা মানুষকে সুকুমার বৃত্তি অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করে। নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ মানসিক বিষয় । এটি হলো মানবমনের উচ্চ গুণাবলি। নৈতিকতা বা নীতিবোধ একান্তভাবেই মানুষের হৃদয়-মন থেকে উৎসারিত। নৈতিকতা বা নীতিবোধের বিকাশ ঘটে মানুষের ন্যায়-অন্যায়, ভালো মন্দ, উচিত-অনুচিত বোধ বা অনুভূতি থেকে।

শুধুমাত্র আইন বা রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানই নাগরিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়। আর. এম. ম্যাকাইভার এ জন্যই বলেছেন যে, "Law does not and can not cover all grounds of morality'।

নৈতিকতা বা ন্যায়নীতিবোধের ধারণা বা এর প্রতি যে দেশের জনগণের শ্রদ্ধাবোধ বেশি, যারা জীবনের চলারপথে নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত হন, তারা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে লিপ্ত হন না। আইন অপেক্ষা বিবেক দ্বারা তারা পরিচালিত হন। নীতিবান মানুষ ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির মানদণ্ডে নিজেরাই চলার চেষ্টা করে।

নৈতিকতার পিছনে সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সমর্থন বা কর্তৃত্ব থাকে না। কেননা নৈতিকতা বিবেক-ও মূল্যবোধ দ্বারা_ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত রাষ্ট্রনৈতিকবিধি প্রয়োগ করে না। নৈতিকতা বিরোধী ব্যক্তিকে রাষ্ট্র কোনো প্রকার দৈহিক শাস্তি প্রদান করে না। বিবেকের দংশনই নৈতিকতার বড় রক্ষাকবচ ।

নৈতিকতা মূলত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ব্যাপার। নৈতিকতা মানুষের মানসিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের কল্যাণ সাধনই নৈতিকতার লক্ষ্য। যে রাষ্ট্রের মানুষের নৈতিক মান সুউচ্চ, সেদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ। কেননা সেদেশের নাগরিকগণ নিজেরাই অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকেন, ঘুষ দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন।

৩-১৪ আইন ও নৈতিকতা

Law and Morality

অতীতে নীতিবিজ্ঞান ছিল পৌরনীতিরই অংশবিশেষ। নৈতিকতার কষ্টিপাথরে রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও আচারআচরণকে তখন বিচার করা হতো। প্লেটো এবং এরিস্টটল তাদের আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় নৈতিক আদর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ইতালির প্রখ্যাত রাষ্ট্র দার্শনিক নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি সর্বপ্রথম আইন ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন।

পার্থক্য ঃ আইন ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপঃ

ক. পরিধি ও বিষয়বস্তুগত পার্থক্য ঃ আইন মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের মন বা মানসিক অনুভূতির সাথে আইনের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। আইন মানুষের গোপন চিন্তা বা উদ্দেশ্যকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না। অপরদিকে নৈতিকতা মানুষের বাহ্যিক ও মানসিক আচরণসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং নৈতিকতার পরিধি আইনের পরিধি অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক।

খ. নির্দিষ্টতা ও স্পষ্টতা সম্পর্কিত পার্থক্য ঃ আইন নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট, কিন্তু নৈতিকতা অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট। আইন সর্বজনীন। দেশের সর্বত্র একই রকম আইন কার্যকর হয়। নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আইন কার্যকর ও ব্যাখ্যা করে থাকেন। অপরদিকে নৈতিকতা আইনের মতো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। দেশ-কাল-পাত্রভেদে নৈতিকতা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এক সময়ে ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহ অনৈতিক মনে করা হতো

কিন্তু এখন তা মনে করা হয় না। অস্পৃশ্যতাকে ও বর্ণ প্রথাকে এক সময় অনৈতিক মনে করা হতো না। কিন্তু বর্তমানে অস্পৃশ্যতা, বর্ণপ্রথাকে অনৈতিক বিবেচনা করা হয়। তাছাড়া নৈতিকতা মূলত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ব্যাপার, অপরদিকে আইন রাষ্ট্রীয় ব্যাপার।

গ. উচিত-অনুচিতের মানদণ্ডগত পার্থক্য ঃ নৈতিকতা কোনো কাজকে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির মানদণ্ডে বিচার করে। আইন সেভাবে বা সে মানদণ্ডে বিচার করে না। আইনের মানদণ্ড ভিন্ন। আলো ছাড়া গাড়ি চালানো কিংবা রাস্তার বামদিক দিয়ে না চলে ডানদিক দিয়ে চলা নৈতিকতা বিরোধী নয়, কিন্তু বেআইনি। অন্যদিকে মিথ্যা কথা বলা, অকারণে কারো মনে কষ্ট দেয়া, গালমন্দ করা বেআইনি নয়, কিন্তু নৈতিকতা বিরোধী। সুতরাং আইনবোধ সব ক্ষেত্রে এবং সব সময় এক হতে পারে না।

ঘ. বলবৎকরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ আইনের পিছনে রয়েছে সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সমর্থন; কিন্তুৈেনতিকতা বিবেকত্তমূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) আইন প্রয়োগ করে থাকে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগকারী শক্তি। আইন ভঙ্গকারীকে আইনের আলোকে শাস্তি পেতে হয়। অপরদিকে, নৈতিকতার পিছনে রাষ্ট্রের মতো কোনো বলপ্রয়োগকারী শক্তি নেই। রাষ্ট্র নৈতিক বিধি প্রয়োগ করে না। নৈতিকতা বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকলে কাউকে কোনো নির্দিষ্ট দৈহিক শাস্তিও ভোগ করতে হয় না। নৈতিকতা বিরোধী ব্যক্তিকে বড় জোর বিবেকের দংশন সহ্য করতে হয় এবং জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়।

সাদৃশ্য ঃ আইন ও নৈতিকতার মধ্যে মিল বা সাদৃশ্য নিম্নরূপঃ

১. লক্ষ্যের অভিন্নতা ঃ আইন ও নৈতিকতার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। উভয়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের আচরণ। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং নৈতিকতা মানুষের মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের কল্যাণ সাধন করাই উভয়ের লক্ষ্য।

২ ঘনিষ্ঠতা ঃ আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।(আইন হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বোধের প্রতিফলন) যে দেশের নৈতিক মূল্যবোধের মান খুব নিচু, সে দেশের আইন কখনো উচ্চমান সম্পন্ন হতে পারে না। মানুষের নৈতিকতাবোধ রাষ্ট্রীয় আইনকে প্রভাবিত ও সাহায্য করে। সমাজ জীবনে উৎকর্ষতা সাধনে আইন ও নৈতিকতা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। ।

৩. একে অপরকে প্রভাবিত করে ঃ ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা যেমন অনেক সময় আইনে পরিণত হয়, তেমনি আইনও অনেক সময় কুনীতিকে দূর করে সুনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে। সতীদাহ বা সহমরণ প্রথাকে এক সময় ভারতে নীতি বা ধর্মের অঙ্গ মনে করা হতো। ব্রিটিশ সরকার আইন করে এই প্রথা বন্ধ করে। বর্তমানে প্রায় সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই অস্পৃশ্যতা ও বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে সাংবিধানিক আইন রচিত হয়েছে। অস্পৃশ্যতা ও বর্ণ প্রথা এখন তাই শুধু নৈতিকতা বিরোধীই নয়, বরং প্রায় সব রাষ্ট্রে এখন তা বেআইনি। সুতরাং আইনের কার্যকারিতা যেমন মানুষের নৈতিক বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি সময় ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সামঞ্জস্যহীন নৈতিক বিশ্বাসও আইনের দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়। রাষ্ট্র সাধারণত নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করে।

৪. সমাজ ও রাষ্ট্র নির্ভরতা আইনের মতোই নৈতিকতাও সমাজ এবংরাষ্ট্র-নির্ভর সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে নৈতিক ধারণা ও আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্পত্তি অর্জন এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবাধ ও নির্মম প্রতিযোগিতা চলে। স্বার্থপরতা ও লোভই সেখানে প্রতিষ্ঠালাভের ভিত্তি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি হলো সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়া।

উপরোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় যে, আইন ও নৈতিকতার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও উভয়ের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ও মধুর। উভয়ই একে অপরের পরিপূরক। যখন কোনো আইন-নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তখনই তা জনগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়। নৈতিকতা বিরোধী আইন কোনো দিনই জনসমর্থন লাভ করেনি এবং টিকেও থাকেনি।

সূচিপত্র

৩.১৫ স্বাধীনতার সংজ্ঞা

Definition of Liberty

স্বাধীনতা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Liberty । Liberty শব্দটি ল্যাটিন 'Liber' থেকে এসেছে। যার অর্থ "free বা স্বাধীন। সুতরাং শাব্দিক অর্থে মানুষের ইচ্ছানুযায়ী কিছু করা বা বলার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলা হয়। সাধারণ ভাষায় স্বাধীনতা বলতে মানুষের ইচ্ছামত কোনো কিছু করা বা না করার অধিকারকে বোঝায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অধীনতামুক্ত অবস্থাই স্বাধীনতা।

কিন্তু কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। পৌরনীতিতে স্বাধীনতাকে এ অর্থে ব্যবহার করা হয় না। কেননা স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য এতে ব্যাহত হয়। অবাধ স্বাধীনতার অস্তিত্ব কোনো সমাজেই থাকতে পারে না। সমাজে প্রতিটি মানুষ যদি অনিয়ন্ত্রিত ও সীমাহীন স্বাধীনতা উপভোগ করতে চায় তাহলে একের ইচ্ছা ও প্রয়োজনের সাথে অন্যের সংঘাত দেখা দেবে। সমাজে সকলের নিরাপত্তা ও সম্মান ব্যাহত হবে। তাই সমাজের সকল সদস্যের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও নিশ্চিত নিরাপত্তা বিধানের জন্য ব্যক্তির আচার-আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা আবশ্যক।

লেখক ও চিন্তাবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাধীনতার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তার 'Essay on Liberty' গ্রন্থে বলেছেন, "মানুষের মৌলিক শক্তির বলিষ্ঠ, অব্যাহত ও বিভিন্নমুখী প্রকাশই স্বাধীনতা। স্বাধীনতার অর্থ মানুষ কর্তৃক নিজস্ব উপায়ে কল্যাণ অনুধাবন করা।" তিনি আরো বলেন, "নিজের ওপর, নিজের দেহ ও মনের ওপর ব্যক্তিই সার্বভৌম।"

হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) বলেন, "স্বাধীনতা বলতে খুশিমত কাজ করাকে বোঝায়, যদি উক্ত কাজ দ্বারা অন্যের অনুরূপ স্বাধীনতা উপভোগে বাধার সৃষ্টি না হয় " (Every man is free to do whatever he wills, provided he infringes not the equal freedom of any other man.)

টি. এইচ. গ্রিন (T, H. Green) বলেন, "যা উপভোগ করার এবং সম্পন্ন করার যোগ্য তা উপভোগ ও সম্পাদন করার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলে" (Freedom consistsin a positive power or capacity of doing or enjoying something worth-doing or worth enjoying)

শেলী (Shelly) বলেছেন যে, অতি শাসনের বিপরীত ব্যবস্থাই হলো স্বাধীনতা।' (Liberty is the opposite of over government.)

অধ্যাপক **হ্যারল্ড জে. লাস্কি** (Prof. H. J. Laski)-এর মতে, নেতিবাচক অর্থে "স্বাধীনতা বলতে বোঝায় সে সকল সামাজিক অবস্থার ওপর থেকে বাধা-নিষেধের অপসারণ, যা আধুনিক সভ্যজগতে মানুষের সুখী জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যক। " (By liberty I mean the absence of restraints upon the existence of those social conditions which in modern civilization are the necessary guarantees of individual happiness.)

হ্যারল্ড জে. লাস্কি-এর মতে, ইতিবাচক অর্থে, "স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সেই পরিবেশের আগ্রহ সংরক্ষণ যেখানে মানুষ তার সত্তাকে পূর্ণ উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করতে পারে।" (By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have opportunity to be their best selves.) অতএব, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী অনুকূল সামাজিক ব্যবস্থা বা পরিবেশই স্বাধীনতা। স্বাধীনতার অর্থ যা কিছু করার ক্ষমতা নয়।

৩-১৬ স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ

Forms of Liberty

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ

১. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা পৌর স্বাধীনতা (Individual or Civil Liberty) ঃ যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটাতে পারে, তাকে ব্যক্তিগত বা পৌর স্বাধীনতা বলে। এ স্বাধীনতা ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যক্তির বাহ্যিক কিছু আচরণের ওপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণবিহীনতা। যেমন-ইচ্ছামত রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডে চলাফেরার অধিকার, নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার প্রভৃতি।

২. প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural Liberty) ঃ রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে যে স্বাধীনতা উপভোগ করতো, তাকে স্বাভাবিক স্বাধীনতা বলা হয়। সামাজিক চুক্তিবাদী দার্শনিক হবস, লক, রুশো এরূপ স্বাধীনতার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। রুশোর বক্তব্যে এ স্বাধীনতা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন-"মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্বত্র সে **Too " (Man is born free, but everywhere he is in chain.) নৈরাজ্যবাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের মাধ্যমে এরূপ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

৩. আইনগত স্বাধীনতা (Legal liberty) ঃ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাকে আইনগত স্বাধীনতা বলা হয়। স্বাধীনতা নির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট এক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।

৪. সামাজিক স্বাধীনতা (social Liberty) ঃ সমাজে সভ্য-সুন্দর জীবনযাপন করতে গেলে যে অনুকূল পরিবেশ ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন তাকে সামাজিক স্বাধীনতা বলে। যেমন- চলাফেরার স্বাধীনতা, জীবনযাত্রার স্বাধীনতা ইত্যাদি। মানুষের অধিকার বোধের ধারণা থেকে সামাজিক স্বাধীনতার জন্ম।

৫. রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty) ঃ হ্যারল্ড জে. লাস্কির মতে, "রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে ভূমিকা *so of Tofoo oftos of " (Political liberty means the power to be able in the affairs of state.) রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার বোঝায়। ভোটদানের অধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার, নিরপেক্ষভাবে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার ইত্যাদি হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

৬. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty) ঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী জীবিকা নির্বাহের স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবস্থা এবং দৈনন্দিন অভাব, অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি। লাস্কির মতে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হচ্ছে, "প্রতিনিয়ত বেকারত্বের আশঙ্কা ও আগামীকালের অভাব থেকে মুক্ত এবং দৈনিক জীবিকার্জনের সুযোগ প্রদান।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মতে, "অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ অভাব থেকে মুক্তি।" অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত হবার অধিকার, বেকার ও বৃদ্ধ বয়সে ভাতা পাবার অধিকার, রুগ্ন-অক্ষম অবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিপালন, উপযুক্ত মজুরি লাভ ইত্যাদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

৭. জাতীয় স্বাধীনতা (National liberty) ঃ বৈদেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করে যখন একটি জাতি পূর্ণ সার্বভৌমত্ব অর্জন করে তখন তাকে জাতীয় স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব বলে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ একটি জনসমষ্টি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন ও রাষ্ট্র গড়ে তুলে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করে। জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতীত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। জাতীয় স্বাধীনতা সব ধরনের স্বাধীনতার মূলভিত্তি।

নিম্নে একটি চিত্র বা ছকের সাহায্যে স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ তুলে ধরা হলো ঃ

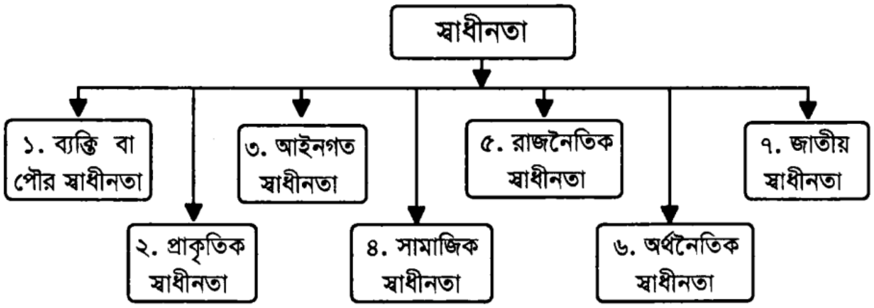

সূচিপত্র

৩.১৭ স্বাধীনতার রক্ষাকবচ

Safeguards of Liberty

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জন যেমন দুরুহ প্রক্রিয়া, স্বাধীনতা সংরক্ষণ ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কেননা নানা কারণে জনগণের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ জন্যই লাস্কি বলেছেন, "সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত অধিকাংশ লোক স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে না।"

স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন ও অটুট রাখার জন্য কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এ পদ্ধতিগুলোকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে। এগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

১. আইন (Law) ঃ আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে তোলে। রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা সকলের নিকট সমভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। লকের মতে, "যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।" আইনের লক্ষ্য ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও অধিকারগুলোকে নিশ্চিত করা; খর্ব করা নয়। আইন স্বাধীনতার শর্ত ও সহায়ক।

২. সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সমাবেশ (Fundamental rights in the Constitution) ; নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকলে সেগুলো সম্পর্কে সন্দেহ বা দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না। মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলে সেগুলো সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ এসব মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন বা ভঙ্গ করলে জনগণ সাংবিধানিক উপায়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে পারে।

৩. দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা (Responsible Government) ঃ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলির জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে সাহসী হয় না। সুতরাং জবাবদিহিমূলক বা দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ ।

৪. প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি (Direct Democratic method) ঃ গনভোট, গণ-উদ্যোগ,, পদচ্যুতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণ নিজেদের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারিতা প্রতিরোধ করে। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি জনগণের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে।

৫. আইনের অনুশাসন (Rule of Law) ঃ আইনের অনুশাসন বলতে বোঝায় (ক) আইনের দৃষ্টিতে সমতা অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষই আইনের দৃষ্টিতে সমান (খ) আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ এবং (গ) শুনানী ব্যতীত কারও বিরুদ্ধে শাস্তি বা ক্ষতিকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। যে সমাজে আইনের অনুশাসন কার্যকর থাকে স্বাধীনতা সেখানে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে। অধ্যাপক এ. ভি. ডাইসি মনে করেন যে, স্বাধীনতা সংরক্ষণে আইনের শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (separation of Power) ঃ কোনো একক কর্তৃপক্ষের ওপর আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা অর্পিত হলে ব্যক্তিস্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ কারণে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের এবং শাসনব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের তিনটি বিভাগের দায়িত্ব পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে অর্পিত হওয়া উচিত। এভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হলে সরকারের কোনো বিভাগের পক্ষে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক মন্টেকু ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ বলে বর্ণনা করেছেন। তার মতে, "আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার ক্ষমতা যখন কেন্দ্রীভূত হয় তখন স্বাধীনতা নষ্ট হয়। এর সাথে বিচার বিভাগের ক্ষমতা সংযুক্ত হলে বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদে মরে।".

৭. বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা (Independence of Judiciary) ঃ বিচার বিভাগকে যদি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন করে গড়ে তোলা যায় তাহলে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতার লোলুপ আগ্রাসন থেকে মুক্ত করা সম্ভব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ আইনের বৈধতা নির্ণয় করে এবং শাসন বিভাগ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাজ কতখানি সংবিধান সম্মত তা যাচাই করে। সুতরাং বিচার বিভাগকে শাসন ও আইন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে।

৮. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Power) ঃ রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রের ওপর এককভাবে বা চূড়ান্তভাবে ন্যস্ত না করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা বিভিন্ন পেশাগত ও কার্যভিত্তিক গোষ্ঠীর ওপর অর্পণ করতে হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে কেন্দ্রীয় সরকার এককভাবে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। ফলে স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন যে, "যে রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা অতিমাত্রায় পুঞ্জীভূত, সেখানে কোনো প্রকার স্বাধীনতা থাকতে পারে না।"

৯. সামাজিক ন্যায়বিচার (social Justice) ঃ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাধীনতা ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা পায়। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ বলে স্বীকৃত।

১০. সাম্য (Equality) ঃ সাম্য ও স্বাধীনতা একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক। স্বাধীনতা ভোগ করতে চাইলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সাম্য ও স্বাধীনতার সহাবস্থান গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি।

১১. সুসংগঠিত দল ব্যবস্থা (Organised party System) : সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত দল ব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। বিরোধী দলসমূহ সরকারের কার্যাবলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে এবং সরকারের জনস্বার্থবিরোধী কাজের তীব্র বিরোধিতা করে। এভাবে সদাজাগ্রত অতন্দ্র প্রহরীর মতো বিরোধী দলসমূহ স্বাধীনতা সংরক্ষণে নিয়োজিত থাকে।

১২. সাংবিধানিক সরকার (Constitutional Government) ঃ সাংবিধানিক সরকার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে সাংবিধানিক প্রাধান্য ও সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৩. সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক (Proper understanding between the Govt. and the People) ঃ স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে হলে সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা আবশ্যক। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য জনকল্যাণ সাধন—এই সত্য সরকার ও জনগণ উভয়কেই উপলব্ধি করতে হবে। যদি উভয় পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক, সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বিরাজ না করে, তবে স্বাধীনতা ব্যাহত হতে বাধ্য।

১৪. শোষণমুক্ত সামাজিক কাঠামো (Exploitation free Social structure) ঃ শোষণমুক্ত সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। শোষণমুক্ত সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষণ সম্ভব। যে সমাজে সুযোগ-সুবিধা একটি নির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্র শ্রেণি একচেটিয়াভাবে ভোগ করে সেখানে স্বাধীনতা অর্থহীন। এ জন্য অনেকেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাদের ভাষায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন।

১৫. সদা জাগ্রত জনমত (vigilant Public opinion) ঃ স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হলো সদাজাগ্রত জনমত অর্থাৎ নাগরিকদের সতর্কও সজাগ দৃষ্টি স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণকে সর্বদা সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে, যেন স্বাধীনতার ওপর হুমকি না আসে। যে কোনো মূল্যে, প্রয়োজনবোধে চরমতম ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষণের মানসিক প্রস্তুতি তাদের থাকতে হবে। নিজের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় সচেতন, আগ্রহী ও সাহসী না হলে বাহ্যিক কোনো পদ্ধতির দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। এই অর্থে, স্বাধীনতা-সংগ্রাম হলো অন্তহীন। গ্রিক দার্শনিক পেরিক্লিসের মতে, "চিরন্তন সতর্কতা স্বাধীনতার মূল্য এবং সাহসিকতা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র।" (Eternal vigilance is the price of liberty and the secret of liberty is courage.) লাস্কির মতে, চিরন্তন সতর্কতার মধ্যেই স্বাধীনতার মূল্য নিহিত। জনগন যদি নির্লিপ্ত না হয় এবং নিজেদের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকে তাহলে স্বাধীনতা সংরক্ষণ অনেক সহজ হয়। সুতরাং স্বাধীনতা ভোগ করতে চাইলে তা সংরক্ষণের

ব্যবস্থা করতে হবে। হেনরি নেভিনসনের মতে, “স্বাধীনতার সংগ্রাম কোনোদিন শেষ হয় না, এর সংগ্রামের ক্ষেত্র কোনো দিন নীরব থাকে না।”

৩-১৮ আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক

Relation between Law and Liberty

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক সংক্রান্ত পরস্পর বিরোধী দুটি মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। প্রথম দলটি মনে করেন, আইন ও স্বাধীনতা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং স্বাধীনতা আইনের ওপর নির্ভরশীল। এরিস্টটল, মন্টেস্কু, রিচি, উইলোবিবার্কার, লক প্রমুখ মনীষী এই মতের সমর্থক। **বার্কারের** ভাষায়, “স্বাধীনতা ও আইনের বিরোধ নেই।" (Liberty and law do not quarrel.)

আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী। জন ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার, এ. ভি. ডাইসি, গডউইন প্রমুখ মনীষী এই দলের সমর্থক। ডাইসির মতে, "একটি বেশি হলে, অপরটি কমে যায়।” (The more there is of the one, the less there is of the other.) স্পেন্সার বলেন, “আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী ।”

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উভয় মতবাদেই অযৌক্তিক অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি রয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত, অবাধ স্বাধীনতা একদিকে যেমন স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর তেমনি সব আইনস্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করে না।

গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, আইন ও স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উভয়ের সম্পর্ক নিম্নরূপ ঃ

১. আইন স্বাধীনতার শর্ত ও ভিত্তিঃ আইন স্বাধীনতাকে সহজলভ্য করে তোলে। আইনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যথার্থভাবে স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। আইনের অবর্তমানে সবলের অত্যাচারে দুর্বলের অধিকার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আইন না থাকলে সমাজজীবনে ভয়াবহ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার রাজত্ব শুরু হয়। উইলোবি বলেছেন, “নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই স্বাধীনতা রক্ষা পায়।বিস্তৃত স্বাধীনতার গ্রন্ধনভিত্তিত শতই হলো আইন।

২. আইন স্বাধীনতার রক্ষাকবচঃ আইন আছে বলে স্বাধীনতা ভোগ করা যায়। আইনের কর্তৃত্ব আছে বলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে। আইনের অবর্তমানে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। ংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ থাকার কারণে সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ জনগণের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে না। স্বাধীনতা লঙ্ঘন ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতে সাংবিধানিক ও সাধারণ আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা চলে। এ জন্যই লক বলেছেন যে, “যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।”

৩. আইন স্বাধীনতার অভিভাবক ঃ আইন শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করে। আইন সংযত ও নির্দিষ্ট সীমারেখার গণ্ডিতে সকলকে আবদ্ধ রেখে স্বাধীনতা বজায় রাখে। আইন আছে বলেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের ফলে স্বাধীনতা-বিঘ্নিত হয় না।

৪. আইন স্বাধীনতার রক্ষক ঃ আইন আছে বলে স্বাধীনতা উপভোগ করা যায়। আইন না থাকলে প্রকৃত স্বাধীনতা থাকতে পারে না। স্বাধীনতাকে রক্ষা করা এবং সকলের নিকট উপভোগ্য করে তোলাই আইনের লক্ষ্য।

৫. আইন স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে ঃ আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতার পরিধি সম্প্রসারিত হয়। রাষ্ট্র আইনের দ্বারা এমন এক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে সুন্দর, সভ্য জীবনযাপনের অনুকূল অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আইন ও স্বাধীনতার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ করেই রিচি বলেছেন, "স্বাধীনতা বলতে যদি আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বোঝায় তা হলে তা নিশ্চিতভাবেই আইনের দ্বারা সৃষ্টি হয়।”

তবে আইন যে সব ক্ষেত্রেই স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করে একথা বলা যায় না। কিছু সংখ্যক আইন রয়েছে যেগুলো অকারণে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করে। কেবল জনমতের ওপর ভিত্তি করে যেসব আইন গড়ে ওঠেছে সেগুলোই স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে।

সূচিপত্র

সুতরাং উপসংহারে বলা যায় যে, আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনো বৈরী সম্পর্ক নেই। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আইন যখন জনসম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই কেবল স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয় আইন স্বাধীনতার শর্ত ও ভিত্তি।

৩-১৯ সাম্যের সংজ্ঞা ও অর্থ

Definition and Meaning of Equality

সাম্যের অর্থ সমান। সাধারণ অর্থে সাম্য বলতে বোঝায় সব মানুষ সমান। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নীতিগতভাবে স্বীকার করা হয় যে, সকল মানুষই সমান। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সব মানুষ এক সমান নয়। শারীরিক ও মানসিক গঠন এবং ক্ষমতা ও যোগ্যতার দিক থেকে একজনের সাথে অন্যজনের পার্থক্য রয়েছে। এজন্যই রাষ্ট্রের কাছ থেকে সকলেই সমান ব্যবহার দাবি করতে পারে না। একজন ডাক্তার ও একজন ঠিকাদার সমাজের কাছ থেকে সমপরিমাণ মর্যাদা ও স্বীকৃতি দাবি করতে পারে না।

পৌরনীতিতে সাম্য কথাটির বিশেষ অর্থ রয়েছে। পৌরনীতিতে সাম্যের অর্থ হচ্ছে সুযোগ-সুবিধাদির সমতা (equality of opportunities)। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে ।

অধ্যাপক লাস্কি (Prof. Laski) বলেন, "সাম্যের অর্থ হলো প্রথমত সব ধরনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি এবং দ্বিতীয়ত সকলের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা উন্মুক্ত রাখা।" (Equality ...... means first of all the absence of special privilege ...... Equality means, an the second place, that adequate opportunities are laid open to all)* । তার মতে, সাম্যের তিনটি বিশেষ দিক রয়েছে। যথাঃ (১) বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি, (২) পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং (৩) বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়, সম্পদ ও দ্রব্যাদি জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমভাবে বন্টন।

বার্কার (Barker)-এর মতে, "সাম্য কথাটির অর্থ সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি না করা।"

সুতরাং সাম্য বলতে মানবজীবনের সেই পরিবেশ বা প্রক্রিয়াকেই বোঝায়, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়, সুষম পরিবেশ গড়ে তোলা হয় এবং সকলকে সমানভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ প্রদান করা হয়।

৩.২০ সাম্যের বিভিন্ন রূপ বা শ্রেণিবিভাগ

Different Forms or Classification of Equality

সাম্য একটি অখণ্ড ধারণা। সাম্যের কোনো প্রকারভেদ হয় না। যেমন অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যান্য সাম্য আপনা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তবুও বিভিন্ন ধরনের সুযোগের জন্য সাম্যকে নিম্নলিখিত উপায়ে শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে।

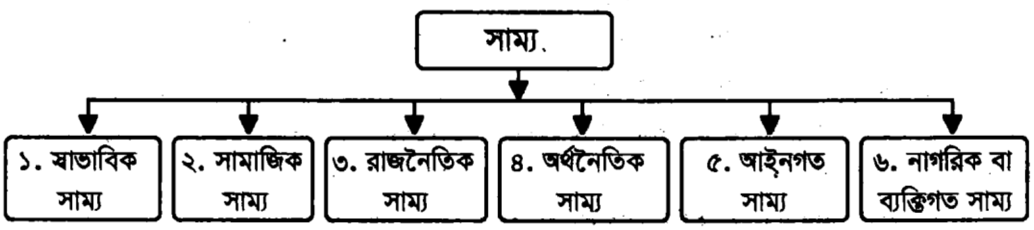

১. স্বাভাবিক সাম্য (Natural Equality) স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক সাম্যের অর্থ হলো জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এবং সমান। জন্মগতভাবে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায়

স্বাভাবিক সাম্যের তত্ত্ব প্রচারিত হয়। কিন্তু জন্মগতভাবে সব মানুষ দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে সমান হতে পারে না। এজন্য স্বাভাবিক সাম্যের ধারণা বর্তমানে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে।

২. সামাজিক সাম্য (social Equality) ঃ জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও পেশাগত কারণে যখন মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য করা হয় না তখন তাকে সামাজিক সাম্য বলে। সামাজিক সম্যের মূল কথা হলো সমাজে বসবাসরত সকল মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।

৩. রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality) ঃ রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগের বেলায় সমান সুযোগ থাকাকেই রাজনৈতিক সাম্য বলে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্ক নাগরিক যখন নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বা সাধারণ ভোটদাতা হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে তখনই কোনো দেশে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪, অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality) ঃ অর্থনৈতিক সাম্যের অর্থ সকল সম্পদ সবার মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সকল মানুষ যখন কাজ করার, ন্যায্য মজুরি পাবার সুবিধা লাভ করে, তখন তাকে অর্থনৈতিক সাম্য বলে। অর্থনৈতিক সাম্যের মূল কথা হচ্ছে, যোগ্যতা অনুযায়ী সম্পদ ও সুযোগের বন্টন। লাস্কির মতে, "ধন বৈষম্যের সাথে অর্থনৈতিক সাম্য অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না, যদি এই বৈষম্য দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত সামাজিক বা রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন।"

৫. আইনগত সাম্য (Legal Equality) ঃ আইনের চোখে সকলেই সমান এটিই হচ্ছে আইনগত সাম্যের মূল কথা। সমাজে যখন বৈষম্যমূলক আইন থাকে না, সকল মানুষের আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ থাকে—তখনই আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনের অনুশাসন অর্থাৎ বিনা অপরাধে গ্রেফতার এবং বিনাবিচারে আটক না রাখার বিধান কার্যকর হলে আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

৬. নাগরিক সাম্য বা ব্যক্তিগত সাম্য (Individual Equality) ঃ নাগরিক সাম্য বা ব্যক্তিগত সাম্যের অর্থ হলো সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকা। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্ক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ নাগরিকের নাগরিক সাম্য বা ব্যক্তিগত সাম্য থাকতে হবে।

৩-২১ স্বাধীনতায় সাম্যের গুরুত্ব

Importance of Equality in Liberty

স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

আইন সাম্যকে অর্থবহ করে তোলে। রাষ্ট্র আইন প্রয়োগ করে অসাম্যকে দূর করতে পারে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে যুগে যুগে অনেক আইন সহায়তা করছে। ভারতে আইন করে অস্পৃশ্যতা দূর করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন করে বর্ণভেদ প্রথা দূর করা হয়েছে এবং পৃথিবীর অনেক দেশেই আইন করে সকল প্রকার অসাম্য দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সাম্য নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতার শর্ত পূরণ না হলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবার স্বাধীনতাকে ভোগ করতে চাইলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা না হলে দুর্বলের সাম্য সবলের সুবিধায় পরিণত হবে। সাম্য ও স্বাধীনতা একই সাথে বিরাজ না করলে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করার প্রশ্নই ওঠে না। সাম্য উচু নীচুর ভেদাভেদ দূর করে, আর স্বাধীনতা সমাজের সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার দান করে। **কোল** (Cole) এ জন্যই বলেছেন যে, "অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন।" (Political liberty in the absence of economic equality is held to be a mere myth.)

আর. এইচ. টনি (R. H. Tawney)-এর মতে "স্বাধীনতা বলতে যদি মানবতার নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রসারণ বোঝায়, তাহলে সেই স্বাধীনতা সাম্যভিত্তিক সমাজেই শুধু সম্ভব।" এজন্যই অধ্যাপক পোলার্ড (Prof. Pollard)

বলেছেন যে, “স্বাধীনতার সমস্যার একটিমাত্র সমাধান রয়েছে। সাম্যের মাঝেই তা নিহিত।” (There is only one solution of problem of liberty. It lies in equality.)

আদর্শ হিসেবে সাম্য ও স্বাধীনতার সুসমন্বিত রূপ প্রকাশ পায় ১৭৭৬ সালে, আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে এবং ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের’ ঘোষণায় ।

সুতরাং বলা যায় যে, স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। স্বাধীনতা ও সাম্য একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক। স্বাধীনতা ও সাম্য একই সাথে বৃহত্তর পরিসরে ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে সাম্য থাকতে হবে। সাম্য না থাকলে ব্যক্তি তথা সমাজজীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং স্বাধীনতা ও সাম্য বৃহত্তর পরিসরে ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এজন্যই বলা হয় যে, স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে রয়েছে একটি দ্বি-মাত্রিক সমগ্রতা।

সূচিপত্র

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

(√ চিহ্নটি সঠিক উত্তর)

১। আইনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Law. এটি এসেছে—
ক. গ্রিক শব্দ থেকে
খ. ল্যাটিন শব্দ তেকে
গ. জার্মান শব্দ থেকে
ঘ. টিউটনিক শব্দ থেকে √
২। ইংরেজি Law শব্দটি কোন টিউটনিক শব্দ থেকে এসেছে?
ক. Low
খ. Lego
গ. Lag √
ঘ. Log
৩। 'যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই আইন—উক্তিটি কার?
ক. সক্রেটিস
খ, এরিস্টটল √
গ. টমাস হবস
ঘ জন অষ্টিন
৪। আইন হচ্ছে নিম্নতমের প্রতি উর্ধ্বতন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আদেশ-উক্তিটি কার?
ক. টমাস হবস
খ. অধ্যাপক হল্যান্ড
গ. জন অস্টিন √
ঘ. স্যাভিনি
৫।আইনের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞাপ্রদান করেছেন কে?
ক. অধ্যাপক হল্যান্ড
খ, জন অস্টিন
গ. টমাস হবস
ঘ. উড্রো উইলসন √
৬। আইন হলো মানুষের স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার সেই অংশ যা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে-উক্তিটি কারঃ
ক. জন আনি
খ উড্রো উইলসন √
গ, অধ্যাপক হল্যান্ড
ঘ. অধ্যাপক গেটেল
৭। অধ্যাপক ইলাভের মতে আইনের উৎস কয়টি?
ক, ৬টি √
খ. ৫টি
গ. ৪টি
ঘ. ৩টি
৮। আইনের উৎস একটি এবং তা হচ্ছে সার্বভৌমের আদেশ-উক্তিটি কার?

ক, টমাস হবস
খ. অধ্যাপক হল্যান্ড
গ. জন অস্টিন √
ঘ মেইটল্যান্ড
৯। নিজের ওপর, নিজের দেহ ও মনের ওপর ব্যক্তিই সার্বভৌম’-উক্তিটি কার?
ক. লাস্কি
খ. ম্যাকাইভার
গ. জেমস মিল
ঘ জন স্টুয়ার্ট মিল √
১০। স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সেই পরিবেশের সাগ্রহ সংরক্ষণ যেখানে মানুষ তার সত্তকে পূর্ণ উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করতে "- উক্তিটি কার?
ক. হার্বার্ট স্পেন্সার
খ. টি.এইচ. গ্রিন
গ, হ্যারল্ড জে লাস্কি √
ঘ. জন স্টুয়ার্ট মিল
১১। স্বাধীনতা বলতে বোঝায় সে সকল সামাজিক অবস্থার ওপর থেকে বাধা নিষেধের অপসারণ, যা আধুনিক সভ্যজগতে মানুষের সুখী-জীবন যাপনের জন্য অত্যাবশ্যক-উক্তিটি কার?
ক. টি.এইচ. গ্রিন
খ. হার্বার্ট স্পেন্সার
গ, জন স্টুয়ার্ট মিল
ঘ, হ্যারল্ড জে লাস্কি √
১২। স্বাধীনতা ও আইনের বিরোধ নেই- উক্তিটি কার?
ক, মন্টেস্কু
খ, বার্কার √
গ. লক
ঘ, উইলোবি
১৩। “যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না—উক্তিটি কার?
ক, জন লক √
খ. বার্কার
গ. উইলোবি
ঘ. এ.ভি. ডাইসি
১৪। আইন হলো আবেগ বিবর্জিত যুক্তি'—উক্তিটি কার?
ক, এরিস্টটল √
খ, জন অস্টিন
গ. জন লক
ঘ. অধ্যাপক হল্যান্ড
১৫। আইন সার্বভৌম শাসকের আদেশ’—এটি কার মত?
ক. এরিস্টটল
খ. অধ্যাপক হল্যান্ড
গ. জন অস্টিন √
ঘ. জন লক

সূচিপত্র

১৬। চিরন্তন সতর্কতার মধ্যেই স্বাধীনতার মূল নিহিত-কে বলেছেনঃ
ক. জন লক
খ. লাস্কি √
গ. মন্টেস্কু
ঘ. অষ্টিন
১৭। জনমত আইনের অন্যতম উৎস’-এটি কার উক্তি?
ক, ওপেন হাউস √
খ. লক
গ. অধ্যাপক লাস্কি
ঘ, অধ্যাপক হল্যান্ড ।
১৮। Liberty’ শব্দের বাংলা অর্থ কী?
ক, স্বাধীনতা √
খ. পরাধীনতা
গ, ন্যায়বিচার
ঘ. সাম্য
১৯। হেদায়া ও আলমগিরী কী?
ক. রোমান আইনগ্রন্থ
খ, হিন্দু আইনগ্রন্থ
গ, মুসলিম আইনগ্রন্থ √
ঘ, বৌদ্ধদের আইনগ্রন্থ
২০। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান—কে বলেছেন?
ক. অধ্যাপক ডাইসি √
খ. অধ্যাপক গার্নার
গ. অধ্যাপক লাস্কি
ঘ. অধ্যাপক স্পেন্সার
২১। আইন মানুষের কোন ধরনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে?
ক. অভ্যন্তরীণ
খ, বাহ্যিক √
গ, পারিবারিক
ঘ, সামাজিক
২২। অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব পালন করে কোন বিভাগ?
ক. আইন বিভাগ
খ. শাসন বিভাগ
গ, বিচার বিভাগ √
ঘ, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল
২৩। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া-এটা নিচের কোন আইনের সাথে সম্পৃক্ত –
ক, ধর্মীয় আইন
খ, নৈতিক আইন √
গ. প্রথাভিত্তিক আইন
ঘ সামাজিক আইন

সূচিপত্র

২৪। স্বাধীনতা বলতে খুশিমত কাজ করাকে বোঝায় যদি উক্ত কাজের দ্বারা অন্যের অনুরূপ কাজে বাধার সৃষ্টি না হয়—এ উক্তি কার?
ক. হার্বার্ড স্পেন্সার √
খ. অধ্যাপক ডাইসি
গ. অধ্যাপক লাস্কি
ঘ. অধ্যাপক ম্যাকাইভার
২৫। সাম্য হলো সেসব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা যাতে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অন্যের সুবিধার সাথে বিসর্জন দিতে না হয়_এ উক্তিটি কার-
ক. এরিস্টটল
খ. অধ্যাপক উইলোৰি
গ অধ্যাপক গার্নার
ঘ অধ্যাপক লাস্কি √
২৬। কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থায় জনগণ বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে?
ক. সমাজতন্ত্র
খ. ধর্মতন্ত্র
গ. গণতন্ত্র √
ঘ. একনায়কতন্ত্র
২৭। কোনটি আইনের উৎস নয়?
ক, ধর্ম
খ. আইন পরিষদ
গ, চিরাচরিত প্রথা
ঘ. আমলাতন্ত্র √
২৮। কোন দেশের সাধারণ আইন প্রথানির্ভর?
ক. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের
খ, বাংলাদেশের
গ, গ্রেট ব্রিটেনের √
ঘ, ফ্রান্সের
২৯। নিচের কোনটিকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা হয়?
ক. গণতন্ত্র √
খ, ধর্মতন্ত্র
গ, সমাজতন্ত্র
ঘ, রাজতন্ত্র
৩০। অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার জন্য নিচের কোন আইনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. দেওয়ানি আইন
খ, ফৌজদারি আইন √
গ. আন্তর্জাতিক আইন
ঘ, সাংবিধানিক আইন
৩১। সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কোনটি?
ক. সত্তা
খ. সমিতি
গ, আইন √
ঘ. প্রশাসন

৩২। নিচের কোনটি রাজনৈতিক স্বাধীনতা?
ক. চলাফেরার স্বাধীনতা
খ, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার √
গ. নিজ ধর্ম পালনের অধিকার,
ঘ. অন্য দলকে কথা না দেয়া
৩৩। কোন ধরনের স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন?
ক. সামাজিক
খ, আইনগত
গ.সাংস্কৃতিক
ঘ অর্থনৈতিক √
৩৪। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?
ক. খেয়াল খুশিমত খরচ করার সামর্থ্য
খ. বিপুল সম্পদের মালিকানা
গ. উচ্চশিক্ষা ও বিপুল অর্থের মালিকানা
ঘ, অভাব হতে মুক্তি √
৩৫। সভ্য সমাজের মানদণ্ড কোনটি?
ক. গণতন্ত্র
খ. বিচার ব্যবস্থা
গ. সংবিধান
ঘ. আইনের শাসন √
৩৬। পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের উৎস কোনটি?
ক. প্রথা
খ, ধর্মগ্রন্থ √
গ, বিচারকের রায়
ঘ. রাষ্ট্রপতির নির্দেশ
৩৭। ধর্মচর্চা কোন ধরনের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত?
ক. সামাজিক স্বাধীনতা
খ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা
গ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা √
ঘ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
৩৮। সভ্য সমাজের মানদণ্ড কোনটি?
ক. নারী স্বাধীনতা
খ. বিজ্ঞানের উন্নতি
গ. উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
ঘ, আইনের শাসন √
৩৯। যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না—উক্তিটিতে কী প্রকাশ পাচ্ছেঃ
ক. আইন স্বাধীনতার প্রচারক
খ, আইন স্বাধীনতার সম্পূরক
গ, আইন স্বাধীনতার রক্ষক √
ঘ. আইন স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক

বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪০ । অবাধ ও নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা—
i, উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর
ii. অরাজকতার নামান্তর
iii, প্রকৃত স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii
খ. ii ও iii
গ. i ও ii √
ঘ. Iii
৪১। জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতীত অর্থহীন—কোনটি অর্থহীন?
i. সামাজিক স্বাধীনতা
ii. রাজনৈতিক স্বাধীনতা
iii. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii √
৪২। ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল—
i, সাম্য, স্বাধীনতা ও আইন
ii.আইন, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব
iii. সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ. iii √
ঘ. ii ও iii
৪৩। আমাদের দেশের সকল নাগরিক সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে—
i, সামাজিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে
ii. রাজনৈতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে
iii. অর্থনৈতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii √
৪৪। রঞ্জ রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করবে—
i, রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের অধিকার
ii. নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার
iii. কর্মে নিযুক্ত হবার অধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. iii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
∗I. iii
ঘ. i,ও ii √
৪৫। শিউলি আক্তার, মুনী সাহা, মাইকেল জনার্ধন একটি টেলিভিশন চ্যানেলে কাজ করে। এ চ্যানেলে যারা কাজ করেন তারা সকলেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। তাদের চ্যানেলের ক্যান্টিনে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ খেতে পারে। এখানে কীরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?
i, সাংস্কৃতিক সাম্য
ii. সামাজিক সাম্য
iii, অর্থনৈতিক সাম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii √
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii
৪৬। বাংলাদেশ সরকার সকল নাগরিককে বেকারত্ব হতে মুক্তি এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। এর ফলে কোন ধরনের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে?
i, অর্থনৈতিক সাম্য
ii. রাজনৈতিক সাম্য
iii. সামাজিক সাম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i √
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii
৪৭। সমাজ ও রাষ্ট্রে আন্দোলন ও বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে−
i, আইনের শাসনের অভাবে
ii. শাসক ও শাসিত জনগণের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায়
iii. সকলেই শাসক হতে চায় বলে
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক. i ও ii √
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের ৪৮ ও ৪৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
আইনের শাসন গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। আইনের শাসনের অর্থ হলো আইনের চোখে সকলেই সমান। সকলেরই আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার রয়েছে। কাউকেই বিনাবিচারে গ্রেপ্তার বা আটক রাখা যাবে না। অর্থাৎ এর অর্থ আইনের প্রাধান্য ও আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠা।

সূচিপত্র

৪৮। আইনের অনুশাসন বলতে যে প্রধান দুটো ধারণাকে বোঝায়, তা হলো—
i ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার
ii. আইনের প্রাধান্য ও আইনের দৃষ্টিতে সাম্য
iii. আইনের প্রাধান্য ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
নিচের কোনটি সঠিক ।
ক. i
খ. ii √
গ. iii
ঘ. Ii ও iii
৪৯। আইনের অনুশাসন থাকলে—
i. সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে না
ii. বিনা বিচারে কাউকে আটক বা শাস্তি প্রদান করা যায় না
iii, র্যাব বা পুলিশ ক্রসফায়ারে মানুষ হত্যা করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক? -
ক. i
খ. ii
গ. i ও ii √
ঘ. iii
৫০। খলিল ও মোবারক দুই প্রতিবেশী। জমির সীমানা নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। মোবারক খলিলকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিল। খলিল আইনের আশ্রয় নিল। কিন্তু মোবারকের কোন শাস্তি হলো না। খলিলকে গালি দিয়ে মোবারক কোন ধরনের অপরাধ করেছে?
i. আইন বিরোধী
ii.নৈতিকতা বিরোধী
iii. রাষ্ট্রবিরোধী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. iii
গ. Iii
ঘ. I ও iii

খ. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

১. ছক বা চিত্রটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

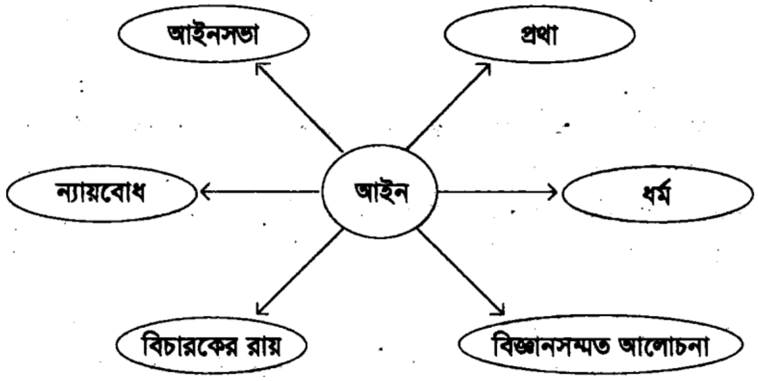

ক, উপরের ছক বা চিত্রটি দ্বারা কী দেখানো হয়েছে?
খ, উড্রো উইলসন প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞাটি লেখ।
গ. আইন মেনে চলা হয় কেন? রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মন্তব্য উল্লেখ করে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ, যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না"—জন লকের এই উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আজম খান ছিলেন একজন গুণী সংগীত শিল্পী । এদেশের পপ সংগীতের তিনি ছিলেন দিকপাল। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে দেশবাসী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষকসহ সমাজের সব পেশার মানুষ তার পাশে এসে দাঁড়ায়, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। সরকারও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, সহমর্মিতা প্রদর্শন করে।

প্রশ্ন

ক. মূল্যবোধ কী?
খ. সহমর্মিতা কাকে বলে?
গ. প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী আজম খান ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে সরকার এবং সমাজের সকলে এসে পাশে দাঁড়ায়। এতে সামাজিক মূল্যবোধের কোন উপাদানটির প্রকাশ বা প্রয়োগ ঘটেছে?
ঘ, সামাজিক মূল্যবোধ সেসব গুণাবলি, যা ব্যক্তি নিজের সহকমীদের মধ্যে দেখে খুশি হয় এবং নিজের সমাজ, জাতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে মূল্যবান মনে করে খুশি হয়—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৩. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মহিবুল কবীর, শাহজাহান সিরাজ, আনসার আলী, হোসনে আরা মাহমুদা, জোনায়েদ হোসেন এঁরা সকলেই সহপাঠী এবং একই বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। দেশ-বিদেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের সময় এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই আইন আছে কিন্তু অনেকক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নেই। কেউ কেউ মনে করেন বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এদের আলোচনায় একটি সত্য বেরিয়ে আসে এবং তা হলো আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

প্রশ্ন

ক, আইনকে কোন মনীষী যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তি' বলেছেন? তিনি কোন যুগের এবং কোন দেশের মানুষ ছিলেন?
খ. আইনের উৎস কয়টি ও কী কী?
গ. বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই আইন আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নেই –উদ্দীপকে বর্ণিত অধ্যাপকগণের উপলব্ধির কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অধ্যাপকগণের উপলব্ধি ঘটেছে যে, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর'। তাদের উপলব্ধি মূল্যায়ন কর।

৪. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

সাম্যের অর্থ সমান। সাধারণ অর্থে সাম্য বলতে বোঝায় সব মানুষ সমান। তবে পৌরনীতিতে সাম্য বলতে বোঝায়
জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা। আইন আছে বলে স্বাধীনতা ও সাম্য
অর্থবহ হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

ক. অধ্যাপক লাস্কি প্রদত্ত সাম্যের সংজ্ঞাটি লেখ ।
খ. আইন মেনে চলা হয় কেন? দুটি কারণ লেখ।
গ. স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
ঘ, বাংলাদেশে আইন আছে কিন্তু তার প্রয়োগ নেই –উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

সূচিপত্র

৫. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শিহাব ও সাহানা স্বামী-স্ত্রী। সংসারে তাদের অশান্তি। শিহাব যৌতুকের জন্য সাহানাকে নির্যাতন করে। সাহানার গরিব বাবার পক্ষে শিহাবের যৌতুকের দাবি মেটানো সম্ভব নয়। শিহাব সাহানাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় এবং তালাকের হুমকি দেয়। প্রতিবেশী সাগর এ ঘটনায় মর্মাহত হয়। সে বন্ধুদের বলে, আমি যৌতুককে ঘৃণা করি। আশা করি তোমরাও যৌতুককে ঘৃণা করবে। যৌতুকবিহীন বিয়ে করে আমরা সমাজে ভালো কাজের নজির স্থাপন করব।

প্রশ্ন

ক. আইন কী?

খ. আইনের উৎস হিসেবে আইনসভার ভূমিকা কতটুকু?

গ, কোন ঘটনা সাগরকে মর্মাহত করে এবং কেন?

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা যুবসমাজের ওপর কতটুকু প্রভাব ফেলবে? মতামত দাও।

৬. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নঈম সাহেব একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি সদালাপী, বিনয়ী, ধার্মিক এবং পরোপকারী। তার নির্দেশে তার বাড়িতে ছেলেমেয়ে, কাজের বুয়া, কাজের ছেলে, সবাইকে একই খাবার খেতে দেয়া হয়। তার প্রতিবেশী হারুন সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তার বাড়িতে নিজেদের ছেলেমেয়ের জন্য এক রান্না, কাজের বুয়া ও কাজের ছেলেদের জন্য অন্য ধরনের রান্না। গরিব-দুঃখী মানুষের প্রতি হারুন সাহেবের কোনো দয়া-মায়া নেই।

ক. সাম্য কী?

খ. ইতিবাচক অর্থে প্রদত্ত হ্যারল্ড জে. লাস্কির স্বাধীনতার সংজ্ঞাটি লেখ।

গ, নঈম সাহেবের পরিবারে কী ধরনের সাম্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে?

ঘ, নঈম সাহেবের এবং হারুন সাহেবের পরিবারে বিরাজমান স্বাধীনতা ও সাম্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর ।

এ অধ্যায়ের প্রশ্ন-সংকেত

১। মূল্যবোধ' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
২। মূল্যবোধ কী? -
৩। সামাজিক মূল্যবোধ কী?
৪। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কী?
৫। উৎপত্তিগত অর্থে আইনের অর্থ কী?
৬। 'Lag' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী? -
৭। আইনের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী এবং তা কোন্ শব্দ থেকে এসেছে?
৮। উড্রো উইলসন প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞাটি লেখ ।
৯। অধ্যাপক হল্যান্ড প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞাটি লেখ ।
১০ । জন অস্টিন প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞাটি লেখ ।
১১ । স্বাধীনতা কী?
১২। টি.এইচ. গ্রিন প্রদত্ত স্বাধীনতার সংজ্ঞাটি লেখ ।
১৩। হার্বার্ট স্পেন্সার প্রদত্ত স্বাধীনতার সংজ্ঞাটি লেখ ।
১৪। নেতিবাচক অর্থে প্রদত্ত হ্যারল্ড জে. লাস্কি প্রদত্ত স্বাধীনতার সংজ্ঞাটি লেখ ।
১৫। ইতিবাচক অর্থে প্রদত্ত হ্যারল্ড জে. লাস্কি প্রদত্ত স্বাধীনতার সংজ্ঞাটি লেখ ।
১৬। শাব্দিক অর্থে স্বাধীনতা' বা Liberty কী?
১৭। স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
১৮। Liberty শব্দটি এসেছে কোন্ শব্দ থেকে এবং তার অর্থ কী?

১৯। সাম্য কী?
২০। রাজনৈতিক সাম্য কী?
২১। অর্থনৈতিক সাম্য কী?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। মূল্যবোধ বলতে কী বুঝ?
২। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়?
৩। স্টুয়ার্ট সি. ডড প্রদত্ত সামাজিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা লেখ।
৪। নিকোলাস রেসার প্রদত্ত সামাজিক মূল্যবোধের সংজ্ঞাটি লেখ।
৫। মূল্যবোধের দুটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে বল।
৬। সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে কী বুঝ?
৭। সহনশীলতা বলতে কী বুঝ?
৮। শ্রমের মর্যাদা বলতে কী বুঝঃ
৯। আইনের শাসন বলতে কী বুঝঃ
১০। আইন বলতে কী বোঝায়?
১১ । আইনের একটি উৎস বর্ণনা কর।
১২। আইনের অনুশাসন বলতে কী বোঝায়?
১৩। আইনের উৎস হিসেবে প্রথার ভূমিকা কতটুকু?
১৪। আইনের উৎস হিসেবে ধর্মের ভূমিকা কতটুকু?
১৫। আইনের উৎস হিসেবে বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের ভূমিকা কতটুকু?
১৬। আইনের উৎস হিসেবে বিজ্ঞানসন্মত আলোচনার ভূমিকা কতটুকু?
১৭। আইনের উৎস হিসেবে জনমতের ভূমিকা কতটুকু?
১৮। আইনের উৎস হিসেবে আইনসভার ভূমিকা কতটুকু?
১৯। আইনের উৎস হিসেবে সংবিধানের ভূমিকা কতটুকু?
২০। জাতীয় আইন বলতে কী বোঝায়?
২১। জাতীয় আইন কত প্রকার ও কী কী?
২২। আইনের উৎস কয়টি ও কী কী?
২৩। আইন মান্য করার কারণ কী?
২৪। আন্তর্জাতিক আইন বলতে কী বোঝায়?
২৫। ফৌজদারি আইন বলতে কী বোঝায়?
২৬। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?
২৭। সামাজিক স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?
২৮। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?
২৯। জাতীয় স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?
৩০। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কাকে বলে?
৩১। সাম্যের সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক কীরূপ?
৩২। সাম্যের সাথে স্বাধীনতার সম্পর্ক কীরূপ?

প্রয়োগ দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১। আধুনিককালে আইন পরিষদকে আইনের প্রধানতম উৎস বলা হয় কেন—ব্যাখ্যা কর।
২। ওপেন হাইম, হল প্রমুখ জনমতকে আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলে অভিহিত করেছেন কেন তা ব্যাখ্যা কর ।

৩। আইনের আধুনিক শ্রেণিবিভাগ একটি ছকের সাহায্যে দেখাও।
৪ । একটি ছকের সাহায্যে আইনের উৎসসমূহ দেখাও।
৫। প্রথা আইনের একটি সুপ্রাচীন উৎস'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
৬। আইন ও নৈতিকতার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
৭। আইন ও নৈতিকতা একে অপরকে প্রভাবিত করে'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
৮। আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়—ব্যাখ্যা কর।
৯ । যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না”—ব্যাখ্যা কর ।
১০। আইনকে স্বাধীনতার শর্ত ও সহায়ক বলা হয় কেন? যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বল।
১১। 'আইনের চোখে সকলেই সমান—উক্তিটি দ্বারা এভি, ডাইসি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
১২। স্বাধীনতার অর্থ কী যা কিছু করার ক্ষমতা?—ব্যাখ্যা কর।
১৩। একটি ছকের সাহায্যে স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ দেখাও।
১৪। অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য কি সম্ভব?—ব্যাখ্যা কর।
১৫। আইন কীভাবে মানুষকে অধিকার ভোগ করতে সাহায্য করে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বল।
১৬। সামাজিক মূল্যবোধের উপাদান হিসেবে আইনের শাসন কী ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা কর।
১৭। সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহমর্মিতাবোধ কী ভূমিকা পালন করে? ১৮। ন্যায়বিচার কীভাবে সামাজিক মূল্যবোধের ওপর প্রভাব বিস্তার করে?

চিন্তন দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১ । আইন হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বোধের প্রতিফলন'-উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।
২। চিরন্তন সতর্কতা স্বাধীনতার মূল্য এবং সাহসিকতা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র-উক্তিটি মূল্যায়ন কর।
৩। যখন মানুষ আইন ও নৈতিকতা থেকে দূরে থাকে তখন সে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়—এরিস্টটলের এই উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
৪। বাংলাদেশের মতো অনেক দেশেই আইন আছে কিন্তু তার প্রয়োগ নেই—উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর।
৫। আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার ক্ষমতা যখন কেন্দ্রীভূত হয় তখন স্বাধীনতা নষ্ট হয়। এর সাথে বিচার বিভাগের ক্ষমতা সংযুক্ত হলে বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদে মরে—মন্টের এই উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি পেশ কর। ৬। আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক তুমি কিরূপে বিশ্লেষণ করবেঃ
৭। সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
৮। অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন'-উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর ।
৯। বাংলাদেশে মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?
১০। তুমি কী মনে কর যে, বাংলাদেশে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

সূচিপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

ই-গভর্নেন্স ও সুশাসন

E-Governance & Good Governance

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার মানুষের চিন্তা-চেতনাকে, জীবনযাত্রাকে, চিকিৎসাশাস্ত্রসহ সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের উন্মোচন করে। বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করার সাধনা থেকে ঘটে প্রযুক্তির বিকাশ। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আজ মানুষের জীবনযাত্রার ধরন ও মান পাল্টে দিয়েছে। রাষ্ট্র, সরকার ও প্রশাসনের ওপরও প্রযুক্তির প্রভাব পড়েছে বহুলভাবে। এ প্রেক্ষাপটে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ই-গভর্নেন্স' নামক এক নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। সরকারের কাজকর্মে স্বচ্ছতা, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এখন ই-গভর্নেন্স-এর বিকল্প নেই। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে ই-গভর্নেন্স' এখন সময়ের জোরালো দাবিতে পরিণত হয়েছে।
অপরদিকে সুশাসনও একটি আধুনিক ধারণা। ই-গভর্নেন্স রাষ্ট্রের নাগরিকদের শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করে দিয়ে এবং সেখানে স্বচ্ছতা সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে দিয়েছে।

শিখন ফল ঃ এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা- >

১। ই-গভর্নেন্সের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
২ । ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য বর্ণনা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩। ই-গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে ।
৪। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্সের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫। ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দ (Key Words) ঃ গভর্নেন্স, ই-গভর্নেন্স, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ফ্যাক্স, এস.এম.এস. সিসিটিভি, ট্র্যাকিং সিস্টেম, সরকারের স্বচ্ছতা (transparency), তথ্যের সহজলভ্যতা, অনলাইন সেবা।

৪.১ ই-গভর্নেন্স-এর ধারণা

Concept of E-Governance

ই-গভার্নমেন্ট এর অর্থ হলো ইলেকট্রনিক গভার্নমেন্ট। এ থেকে এসেছে ই-গভর্নেন্স'। শব্দটি Electronic Governance-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ হলো ইলেক্ট্রনিক গভর্নেন্স। অনেক সময় একে ডিজিটাল গভর্নেন্স', অনলাইন গভর্নেন্স' নামেও অভিহিত করা হয়। বাংলায় একে ইলেক্ট্রনিক সরকার বা শাসন' বলা যায়। অনলাইনের মাধ্যমে পাবলিক ডেলিভারি ও সেবা জনগণের কাছে সহজলভ্য করা ই-গভর্নেন্স-এর লক্ষ্য। এ প্রক্রিয়া আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এবং সরকারের কর্মসম্পাদনে ব্যাপক পরিবর্তন ও সংস্কার আনয়নে সক্ষম। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স-এর লক্ষ্য হলো জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, আইনের যথার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত ও শক্তিশালীকরণ, জনজীবনে এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে অগ্রাধিকার উন্নীতকরণ, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান বৃদ্ধি ইত্যাদি।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া (interaction) সাধিত হলে ই-গভর্নেন্স'-এর উদ্ভব ঘটে। এই মিথস্ক্রিয়া ঘটে সরকার ও জনগণের মধ্যে, সরকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে, সরকার ও চাকরিজীবীদের মধ্যে এবং এক সরকারের সাথে অন্য সরকারের মধ্যে ।

ই-গভর্নেমেন্ট' বা ই-গভর্নেন্স'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় যে, ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌছানকেই ই-গভর্নেন্স' বলে। কেউ কেউ বলেন যে, জনগণের নিকট বিভিন্ন সেবা পৌছে দেওয়ার দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অন্য ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তির ব্যবহারকে ই-গভার্নমেন্ট বা ই-গভর্নেন্স বলে।'

বিশ্ব ব্যাংক (world Bank) প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, "ই-গভর্নেন্স বলতে সরকারি তথ্য প্রযুক্তি (নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট, মোবাইল প্রভৃতি) ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ, ব্যবসায়ী এবং সরকারের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগের সক্ষমতাকে বোঝায়।" (e-Governance refers to the use by Governmentagencies of information technologies (such as networking internet, mobile etc.) that have the ability to transform relations with citizens, businesses and other arms of government.)

জাতিসংঘ (UN) ২০০৬ সালে প্রদত্ত এক সংজ্ঞায় বলেছে যে, "সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌছানের ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।" (e-Governance is defined as the employment of the internet and the worldwide web for delivering government information and service to the citizens.)

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ই-গভর্নেন্স আইন-২০০২'-এ বলা হয়েছে যে, "ই-গভর্নেন্স বলতে বোঝায় ওয়েব নির্ভর ইন্টারনেট এবং অন্যান্য তথ্য-প্রযুক্তি। " (The use by the government of web-based internet application and other information technologies.)

ইউনেস্কো প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, "সরকার বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্ব যার অন্তর্ভুক্ত হলো নাগরিকের আইনগত অধিকার ও দায়িত্বের প্রশ্ন। অপরদিকে ই-গভর্নেন্স হলো এসব কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা, দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে জনগণ এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনরত অন্যান্য সংস্থাকে তথ্য সরবরাহ করা। " (Governance refers to the exercise of political, economic and administrative authority in the management of a country's affairs, including citizens articulation of their interests and energies of their legal rights and obligations. e-Governnace may be understood as the performance of this governance via the electronic medium in order to facitiitate an efficient, speedy and transparent process of disseminating information to the public and other agencies and for performing government administration activities.)

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ড. এ.পি.জে আব্দুল কালাম বলেছেন যে, "স্বচ্ছ, নিশ্চিত, গ্রহণযোগ্য ও অবাধ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও অবিকৃত সেবা দেয়ার উৎকৃষ্ট মাধ্যমই হলো ই-গভর্নেন্স।" (A transparent smart e-Governance with seamless access, secure and authentic flow of information crossing the interdepeartmental barrier and providing a fair and unbiased service to the citizen)

পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগ, ইন্টারনেট খাত, সাবমেরিন কেবল, নেটওয়ার্ক, সরকারি হোমপেজ, ওয়েবসাইট ইত্যাদির প্রচলন শুরু হয়েছে। তবে ই-গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে অনলাইন এবং ইন্টারনেটকে প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে অনেক ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যা ইন্টারনেটের সাথে সরাসরি যুক্ত নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় টেলিফোন, ফ্যাক্স, সংক্ষিপ্ত মোবাইল বার্তা, ওয়্যারলেস সুবিধা, সিসি টিভি, ট্র্যাকিং সিস্টেম, মহাসড়কে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পরিচয়পত্র, ভোটসংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি, টেলিভিশন ও রেডিওর মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন সেবা ইত্যাদি।

উপরের আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় যে, ই-গভর্নেন্স একটি নতুন ধারণা। ই-গভর্নেন্স বলতে তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট ও কম্পিউটারভিত্তিক যোগাযোগ। এটি হলো শাসনের এমন এক পদ্ধতি যেখানে সরকারি সেবা ও তথ্যসমূহ জনগণ সহজে ঘরে বসেই পেতে পারে। ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ ত্বরান্বিত হয়।

সূচিপত্র

৪.২ ই-গভর্নেন্স-এর কার্যক্রম

ই-সরকার বা ই-গভর্নেন্স-এর পারস্পরিক লেনদেন সরকার ও জনগণ বা সেবাগ্রহণকারী, সরকার ও ব্যবসায়ী, এক সরকারের সাথে অন্য সরকারের কিংবা সরকার ও তার কর্মকর্তাদের মধ্যে হতে পারে। এরূপ লেনদেনের ক্ষেত্রে চার ধরনের কার্যক্রম লক্ষ করা যায় ঃ

১. বিভিন্ন তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠানো ঃ যেমন নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম, সাধারণ ছুটি, জনগণের জন্য বিভিন্ন ঘটনার দিন তারিখ, বিভিন্ন ইস্যুর ব্যাখ্যা, নোটিশ ইত্যাদি।

২. সরকার ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ ঃ এই প্রক্রিয়ায় যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে ইন্টারনেট সংলাপে বসতে পারে এবং তাদের সমস্যা, মন্তব্য ও অনুরোধ প্রতিষ্ঠানকে জানাতে পারে।

৩. বিভিন্ন ধরনের লেনদেন পরিচালনা ঃ যেমন আয়কর রিটার্ন জমা দেয়া, চাকরির জন্য আবেদন চাওয়া ও তা জমা দেয়া এবং অনুদান চাওয়া ও তা প্রদান করা।

৪. সরকার পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ঃ জনগণ ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করে, তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগ নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।

৪.৩ ই-গভর্নেন্স-এর উদ্দেশ্য

Aims & Objectives of E. Governance

ই-গভর্নেন্স-এর উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

১. ই-গভর্নেন্স-এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

২. সরকার পরিচালনা ও প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়ন করা।

৩. প্রশাসনকে গতিশীল করা।

৪. দ্রুত জনগণের নিকট বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ পৌছে দেওয়া।

৫. দক্ষ ও সাশ্রয়ী পন্থায় জনগণের নিকট সেবা পৌছানো।

৬. সরকারি তথ্য ও সেবা জনগণের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া।

৭. প্রশাসনের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো।

৮. জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি।

৯. ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের নিকট তথ্য প্রাপ্তিকে সহজলভ্য করা।

১০. দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের বা সংশ্লিষ্টতার সুযোগ সৃষ্টি।

১১. নাগরিকদের মধ্যে সেবার মান উন্নীতকরণ।

১২ জনগণকে ঘরে বসেই সেবা ও সুযোগ লাভের সুযোগ করে দেওয়া।

১৩. জবাবদিহিতা নিশ্চত করা।

১৪. তথ্যপ্রবাহে অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা।

১৫. গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করা।

১৬. ই-কমার্সের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধন করা।

১৭. সুশাসন নিশ্চিত করা।

৪.৪ ই-গভর্নেন্স-এর বৈশিষ্ট্য

Characteristics of E-Governance

ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে আলোচনা করলে এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়ে। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. ইলেক্ট্রনিক গভর্নেন্স ঃ ই-গভর্নেন্স শব্দটি এসেছে Electronic Government থেকে। বাংলায় একে বলা হয় ইলেক্ট্রনিক সরকার বা শাসন'। এ শাসন বা সরকার পরিচালনায় ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি বা কৌশল প্রয়োগই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. অনলাইন গভর্নেন্স ঃ অনলাইনের মাধ্যমে পাবলিক ডেলিভারি ও সেবা জনগণের কাছে সহজলভ্য করাই ই-গভর্নেন্স-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৩. প্রযুক্তিনির্ভর ঃ ই-গভর্নেন্স-এর প্রক্রিয়া আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর। প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারের কর্মসম্পাদনে ব্যাপক পরিবর্তন ও সংস্কার আনয়ন করা হয়।

৪. সেবার মান উন্নয়ন ঃ ই-গভর্নেন্স-এর লক্ষ্য হলো জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন করা। এর মাধ্যমে জনগণকে সার্বক্ষণিক সুবিধা দেয়া সম্ভব।

৫. সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ঃ ই-গভর্নেন্স-এর লক্ষ্য হলো সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। অনলাইনের মাধ্যমে পাবলিক ডেলিভারি ও সেবা সহজে জনগণের নিকট পৌছে দেয়ার ফলে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।

৬. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে অগ্রাধিকার উন্নয়ন ঃ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়।

৭. স্বচ্ছতা ঃ ই-গভর্নেন্স সরকারের স্বচ্ছতাকে সুনিশ্চিত করে। ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

৮. দ্বিমুখী যোগাযোগ ঃ ই-গভর্নেন্স সরকার ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যক্তি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে ইন্টারনেট সংলাপে বসতে পারে এবং তাদের সমস্যা, মন্তব্য ও অনুরোধ প্রতিষ্ঠানকে জানাতে পারে।

৯. লেনদেন পরিচালনা ঃ ই-গভর্নেন্স-এর সহযোগিতায় আয়কর রিটার্ন জমা দেয়া, চাকরির জন্য আবেদন চাওয়া ও তা জমা দেয়া এবং অনুদান চাওয়া ও তা প্রদান করাসহ বিভিন্ন ধরনের লেনদেন পরিচালনা করা সম্ভব।

১০. সরকার পরিচালনায় জন অংশগ্রহণ ঃ ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থা তথা তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য গ্রহণ করে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

১১. সুশাসনের সহায়ক ঃ ই-গভর্নেন্স সুশাসনের সহায়ক। ই-গভর্নেন্স সুশাসন নিশ্চিত করে।

৪.৫ সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স-এর সুবিধা

Advantage of Good Governance and E-Governance

সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স-এর পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই নিবিড়। ই-গভর্নেন্স নিম্নলিখিত উপায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন : ই-গভর্নেন্স-এর আওতাধীন যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। সময়, খরচ, শ্রম সবকিছুই এতে বেঁচে যায় বা কমে যায়।

২. স্বচ্ছতা আনয়ন: ই-গভর্নেন্সে স্বচ্ছতার বিষয়টিকে বড় করে দেখা হয়। সরকারের প্রশাসনিক সংগঠনগুলোতে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজকর্মে এবং মাঠপর্যায়ের প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়ন করা প্রয়োজন। সরকার কী

কী কাজ করছে, কেন করছে, কী কী মূলনীতির ওপর সরকার সিদ্ধান্ত বা নীতি প্রণয়ন করছে তা জনগণের জানা প্রয়োজন। ই-গভনেন্স তা জানতে সাহায্য করে।

৩. দক্ষ ও সাশ্রয়ী পন্থা ঃ ই-গভর্নেন্স-এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একটি দক্ষ ও সাশ্রয়ী পন্থায় জনগণের নিকট সেবা পৌছানো। ধরা যাক সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তনের ব্যাপারগুলো জনগণের জানানো প্রয়োজন। এজন্য বিপুল সংখ্যক কাগজ-কলম ও সময়ের প্রয়োজন হয়। এ ব্যাপারটি যদি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার সাহায্যে করা হয় তবে তা অনেক সহজে ও কম খরচে করা যেতে পারে। সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় কমিয়ে দেয় বলে এ ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের জন্য সুবিধাজনক ও সাশ্রয়ী।

৪. রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি ঃ রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স বা ই-সরকার কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। ভোটদানের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা জনগণের সংশ্লিষ্টতা ও আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করে।

৫. তথ্যের সহজলভ্যতা: ই-সরকার বা ই-গভর্নেন্স যেকোনো প্রক্রিয়াকে সহজ করে দিতে পারে। এছাড়া ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের নিকট তথ্য প্রাপ্তি অনেক সহজলভ্য করতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাষ্ট্র ইন্ডিয়ানাই সর্বপ্রথম সরকারি তথ্য ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় শনাক্তকরণ করে আইনগতভাবে তা প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহ করেছে। এর ফলে খরচও অনেক কমেছে। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বেই এই অনলাইন সেবা ছড়িয়ে পড়েছে।

৬. জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ঃ ই-সরকার বা ই-গভর্নেন্সের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারাদেশের মানুষ রাজনীতিবিদ ও সরকারি চাকরিজীবীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এবং তাদের বক্তব্য সকল ব্যক্তির নিকট পৌছাতে পারে। এছাড়াও রাজনীতিবিদ ও সরকারি চাকরিজীবীরা ব্লগারদের বক্তব্য থেকে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারে। চ্যাটরুমে প্রবেশ করে জনগণ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। ভোটাররা এ সুবিধার মাধ্যমে সরকারের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। এতে জনগণ বুঝতে পারে ভবিষ্যতে কাকে ভোট দেওয়া যেতে পারে এবং কীভাবে সহায়তা প্রদান করলে সরকারি কর্মচারীরা আরো উৎপাদনশীল কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারবে।

৭. প্রকৃত গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর ঃ ই-সরকার বা ই-গভর্নেন্সের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোনো সরকার প্রকৃত বা যথার্থ গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে পারে। কীভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং কীভাবে সরকারি কর্মচারীদের নিকট থেকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হয় তা জনগণ বুঝতে পারে।

৮. পরিবেশগত সুবিধা ঃ পরিবেশবিদ, সংবাদ মাধ্যম ও সচেতন জনগণের চাপে অনেক দেশের সরকার ইন্টারনেট ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। এর ফলে বিপুল সংখ্যক কাগজের ব্যবহার কমে গেছে। এর ফলে পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা কমে যাচ্ছে।

৯.দ্রুততা ও সুবিধা বৃদ্ধি ঃ বিভিন্ন সরকারি অফিসে না গিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে জনগণ সরকারি কাজকর্ম সম্পাদন এবং খুব সহজেই যেকোনো হিসাব সংরক্ষণ করতে পারে। চাকরিজীবী ও ছাত্রদের আবেদনপত্র সহজে সংগ্রহ ও তা জমা দিতে পুরো প্রক্রিয়াটি সহজে সম্পন্ন করা যায়। শারীরিক প্রতিবন্ধীরা খুব সহজেই ঘরে বসে বিভিন্ন রকম প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা ও সরকারি সেবা গ্রহণ করতে পারে।

১০ জনগণের অংশগ্রহণ ঃ সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, জনগণ আগ্রহ সহকারে ই-গভর্নেন্সের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছে। ক্রমবর্ধমানহারে জনগণ অনলাইনে রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে। এমনকি তরুণ প্রজন্মের যে অংশটি রাজনৈতিক বিষয়ে এতদিন উদাসীন ছিল তারাও ই গভর্নেন্সের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৯০% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অপরাধীদের শনাক্তকরণে ইন্টারনেটের ব্যবহারকে স্বাগত জানিয়েছে।

১১. অবাধ ও সার্বজনীন তথ্য প্রবাহ ঃ ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় ধনী-গরিব, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবার জন্য সরকারি তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ উন্মুক্ত থাকে। কোনো তথ্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য সংরক্ষিত থাকে না। এরূপ অবাধ ও সর্বজনীন তথ্য প্রবাহ মানুষে মানুষে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।

সূচিপত্র

১২. সময় বাচায় ঃ ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা বিকশিত হবার পূর্বে হাতে-কলমে বা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংবাদ প্রেরণ, কাগজপত্র বা ফাইল সংরক্ষণ থেকে শুরু করে সব ধরনের সরকারি কাজ করা হতো। এতে প্রচুর সময় ব্যয় হতো। ইগভর্নেন্স ব্যবস্থা সময় বাচিয়েছে এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।

১৩. সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ঃ ই-গভর্নেন্স এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্বচ্ছতা। সরকারের সব কার্যক্রম বা সকল পদক্ষেপ জনগণ জানতে ও বুঝতে পারে। এরূপ স্বচ্ছতাই জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করে।

১৪. দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ঃ ই-গভর্নেন্সে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আছে বলেই দুর্নীতি স্বভাবতই কমে যায়। সরকার কী করছে, কীভাবে করছে, আর্থিক লেনদেন কীভাবে হচ্ছে- জনগণ সহজেই জানতে পারে বলে দুর্নীতি প্রতিরোধে ই-গভর্নেন্স প্রশংসা অর্জন করেছে।

১৫. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস ঃ ই-গভর্নেন্স আমলাতান্ত্রিক জটিলতার দুর্ভোগের বা হয়রানির হাত থেকে জনগণকে রেহাই দেয়। কেননা এর ফলে সরকারি অফিসে গিয়ে তথ্যের জন্য দিনের পর দিন ঘুরতে হয় না বা ঘুষ দিতে হয় না। ঘরে বসেই জনগণ এগুলো জানতে পারে।

৪.৬ সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স-এর প্রতিবন্ধকতা

ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশকিছু প্রতিবন্ধকতা বা অসুবিধা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ ই-গভর্নেন্স-এর সুবিধাগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে সমানভাবে ইন্টরনেট ব্যবহার করতে পারে না। কেননা ইন্টারনেট ব্যবস্থা এখনো ব্যয়বহুল।

২. ইন্টারনেট হতে প্রাপ্ত তথ্য কতটা নির্ভরযোগ্য তা নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সংশয় থাকে।

৩. অনেক ক্ষেত্রে সরকারের অনেক গোপন কর্মপন্থা জনমতকে প্রভাবিত ও একমুখী করে থাকে।

৪. ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিবেচনা ও নির্দেশনা আছে, যেমন- সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব, সাইবার আক্রমণের ভীতি এবং এসব ক্ষেত্রে যে ভারসাম্যতা আছে তা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

৫. রাষ্ট্রীয় নীতির অকার্যকারিতা সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৬. সরকারি দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাবেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়।

৭. অনেক রাষ্ট্রের বিদ্যুৎ সমস্যা ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধার সৃষ্টি করে।

৮. দক্ষ কর্মীর স্বল্পতা ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্কার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

৯. অবকাঠামোগত সমস্যা ও ই-গভনেন্স-এর পথে বাধা হয়ে দাড়ায়।

১০. ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যে অনগ্রসরতা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

১১. সরকার ও জনগণের মধ্যে অতিরিক্ত যোগাযোগের বিভিন্ন রকম নেতিবাচক ফলও রয়েছে। যখন ই-সরকার স্থাপিত হয় এবং একটি শক্তিশালী পর্যায়ে গিয়ে পৌছায়, তখনই জনগণ ব্যাপক মাত্রায় সরকারের সাথে পারস্পরিক লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলস্বরূপ, যেহেতু সরকার জনগণ সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করে, সেহেতু জনগণ এক ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধহীন হয়ে পড়ে। এ অবস্থা আরো খারাপ পর্যায়ে পৌছলে দেশে এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কেননা যখনই জনগণের ব্যাপারে সরকারের কাছে সীমাহীন তথ্য থাকে, তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন হয়।

১২. ই-সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিশাল অংকের অর্থ ব্যয় হয়। তার বিনিময়ে প্রাপ্ত ফলাফল আশানুরূপ নয়। পরীক্ষামূলক ইন্টারনেট নির্ভর সরকার ব্যবস্থার ফলাফল ও প্রভাব নির্ণয় করা অনেকক্ষেত্রেই কঠিন ও হতাশাব্যঞ্জক।

১৩. ই-সরকারের সেবা ও সুবিধাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে পৌছায় না।

১৪. যেসব মানুষ নিরক্ষর বা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে তাদের জন্য এ সেবা গ্রহণ করা সত্যিই অচিন্তনীয়।

১৫.ই-সরকারের বিরোধিতাকারীরা যুক্তি দেখান যে, এর স্বচ্ছতার বিষয়টি অস্পষ্ট। কেননা সম্পূর্ণ বিষয়টি সরকার নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে। সরকার জনগণকে না জানিয়েই যেকোনো সময় যেকোনো তথ্য যোগ বা বিয়োগ করতে পারে।

১৬. জনগণকে না জানিয়ে তথ্য যোগ-বিয়োগ করার কথাকে ধরে নিলে বলতে হয় যে, জবাবদিহিতার প্রশ্নটিও এর ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

৪.৭ সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স-এর প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায়

ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতাগুলো উত্তরণের উপায় নিম্নরূপঃ

১. সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ যেন ই-গভর্নেমেন্ট-এর সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারে সেদিকে সচেষ্ট হতে হবে। ইন্টারনেট যেন সহজলভ্য হয় অর্থাৎ কম মূল্যে কেনা যায় বা ব্যবহার করার জন্য হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

২. ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্য যেন নির্ভরযোগ্য হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

৩. সরকারের গোপন কর্মপন্থা প্রকাশ পেলে যেন তা বিরূপ প্রভাব না ফেলে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪. সাইবার আক্রমণের ভীতি দূর করতে হবে এবং এরূপ আক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫ ই-গভর্নেন্স-এর সুবিধাভোগী জনগণ সরকারের খুব কাছে চলে আসায় তাদের গোপনীয়তা যেন নষ্ট না হয়, তারা যেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধহীন হয়ে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কেননা তা নাহলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়বে।

৬. ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার সময় মনে রাখতে হবে—এটা করতে গিয়ে যে ব্যয় হবে বিনিময়ে প্রাপ্ত ফলাফল যেন আশা ব্যঞ্জক হয়।

৭. ই-গভর্নেন্স-এর সেবা ও সুবিধাগুলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. ই-গভর্নেন্স-এর সেবা ও সুবিধাগুলো দেশের নিরক্ষর ও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণও যেন ভোগ করতে পারে বা তাদের জন্য সহজলভ্য হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ইন্টারনেট সার্ভিসের ব্যয় কমাতে হবে।

৯. জনগণকে না জানিয়ে কোনো তথ্য যোগ-বিয়োগ বা সংযোজন-বিয়োজন করা উচিত হবে না।

১০. কোনোভাবেই জবাবদিহিতার প্রশ্নটি যেন অনিশ্চিত হয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের জবাবদিহিমূলক মানসিকতা থাকতে হবে।

১১. আমলাদের মধ্যে জবাবদিহিমূলক মানসিকতা জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদেরকে ভাবতে হবে যে তারা জনগণের সেবক, প্রভু নন।

১২. সরকারের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু এবং তা সফল করা সহজসাধ্য নয়। এজন্য ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে সফল করার জন্য সরকারের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং তা বাস্তবায়নে সরকারের আন্তরিকতা থাকতে হবে।

১৩. দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে।

১৪. জনগণকে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে প্রযুক্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

১৫. টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।

১৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে দক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে।

সূচিপত্র

১৭. তথ্য ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে আরো মানসম্মত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

১৮. তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে সরকারকে ভর্তুকি প্রদান করতে হবে।

১৯. কর্মক্ষেত্রে ICT-এর ব্যবহার বাড়াতে হবে।

২০. সাইবার-অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCO)

(√ চিহ্নটি সঠিক উত্তর)

১। শাসন' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
ক. Governor
খ. Government
গ. Governance √
ঘ. Governing
২। সুশাসন শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
ক. Good Government
খ. Good Governor
গ. Good Gang
ঘ. Good Governance √
৩ । ই-গভর্নেন্স বলতে বোঝায়—
ক. ইলেকটেড গভর্নেন্স
খ, ইলেক্টিভ গভর্নেন্স
গ. ইজি গভর্নেন্স
ঘ, ইলেক্ট্রনিক গভর্নেন্স √
৪। ই-গভর্নেন্স ও সুশাসনের সম্পর্ক কীরূপ?
ক নিবিড় √
খ. পরস্পর বিরোধী
গ, শত্রুতামূলক
ঘ. সাপে-নেউলে
৫ । বাংলাদেশে কোন সরকার ডিজিটাল পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন?
ক. জিয়া সরকার
খ. এরশাদ সরকার -
গ. শেখ হাসিনার সরকার √
ঘ. বেগম খালেদা জিয়ার সরকার
৬। ইলেক্ট্রনিক গভর্নেন্স এর মূল লক্ষ্য কী?
ক. সুশাসন প্রতিষ্ঠা √
খ, ব্যক্তি শাসন প্রতিষ্ঠা
গ, একদলীয় শাসন
ঘ, বিদ্যুৎ গতিতে সরকার চালানো
৭। ই-গভর্নেন্স চালু হলে—
i.আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়
ii. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়
iii, প্রশাসনিক কাজে খরচ বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii √

গ. I ও ii

ঘ. iii

৮। ই-গভর্নেন্সের ফলে–
i, সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়
ii. সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়
iii. সরকারের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. Ii
গ. Iii
ঘ. I, ii ও iii √

খ. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সুদির্ঠির জন্মদিনে তার দাদু একটি ল্যাপটপ কিনে দিয়েছে। সে সারাক্ষণ ল্যাপটপের সামনে বসে গেম খেলে, ছবি দেখে। তার দাদুও এর মধ্যে ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে অনেকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে, কথা বলে।

প্রশ্ন

ক. ই-গভর্নেন্স এর অর্থ কী?
খ, ল্যাপটপ বলতে কী বোঝায়?
গ. সুদির্ঠি ও তার দাদু ল্যাপটপ এর সাহায্যে আর কী কী করতে পারবে?
ঘ. ক্রমেই ছোট হয়ে এসেছে পৃথিবী-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে অন্যপ্রান্তে কী ঘটছে তা জানা যাচ্ছে। ঢাকা শহরের একটি ছেলে লন্ডন নগরীতে কর্মরত তার ভাইয়ের সাথে কথা বলছে, মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা পাঠাচ্ছে। ব্লগাররা তাদের চিন্তাচেতনা জানিয়ে দিচ্ছে সবাইকে ব্লগে লিখে। ইন্টারনেটের সামনে বসে গোটা দেশের সাথে, পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে অনেকে। যার যে ধরনের সেবা প্রয়োজন তাকে তা অনলাইনে সরবরাহ করছে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন

ক. S.M.S-এর পূর্ণরূপ কী?
খ, ইন্টারনেট কী?
গ. ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী—এ কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে,
ঘ. ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌছানোকেই ই-গভর্নেল বলে—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৩. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সাধিত হলে ই-গভর্নেন্স'-এর উদ্ভব ঘটে। এই মিথস্ক্রিয়া ঘটে সরকার ও জনগণের মধ্যে সরকার-ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে, সরকার ও চাকরিজীবীদের মধ্যে এবং এক সরকারের সাথে অন্য সরকারের মধ্যে।

সূচিপত্র

প্রশ্ন

ক. ই-গভর্নেন্স'-এর অর্থ কী?

খ. ডিজিটাল পদ্ধতি বলতে কী বুঝ?

গ. ই-গভর্নেন্স চালু হলে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে?

ঘ. ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৪. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিম ঢাকায় গার্মেন্টস-এ চাকরি করে। প্রতি মাসে সে গ্রামে বাবা-মার কাছে টাকা পাঠায়। এজন্য তাকে আগে অনেক টাকা কমিশন দিতে হতো। একদিন সে মোবাইলে বিকাশে টাকা পাঠানোর কথা জানতে পারলো। সে খুব খুশি, তার বাবা-মা, ভাই-বোনও খুশি। যখন তখন রহিম টাকা পাঠাতে পারে। খরচও হয় অনেক কম।

ক. সুশাসন-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

খ. ডিজিটাল প্রযুক্তি বলতে কী বুঝ? তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর।

গ, উদ্দীপকটি পড়ে কেন মনে হয় যে, ডিজিটাল পদ্ধতি কার্যকর হলে অথবা হয়রানি, সময়ক্ষেপণ এবং আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রহিমের মত মানুষরা উপকৃত হবে? বুঝিয়ে বল। ।

৫. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব মাহমুদুল হাসান একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে লক্ষ করলেন যে, সেখানে বেশির ভাগ কাজই হাতে-কলমে করা হয়। কাজের গতিও খুব ধীর। তিনি যোগদান করেই প্রতিষ্ঠানের এম.ডি.-কে বুঝিয়ে ডিজিটাল সরঞ্জাম কিনে ফেললেন এবং সবাইকে এর সুফল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললেন। ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ শুরু করায় খুব দ্রুত প্রতিষ্ঠানটির কাজের গতি বৃদ্ধি পেল, উৎপাদনও বৃদ্ধি পেল।

প্রশ্ন

ক. এস.এম.এস. কী?

খ. ল্যাপটপ বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মাহমুদুল হাসান সাহেবের উদ্যোগকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বল।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ডিজিটাল পদ্ধতি কীভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে বলে তুমি মনে কর?

[এ অধ্যায়ের প্রশ্ন-সংকেত]

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন :

১। ই-গভর্নমেন্ট'-এর অর্থ কী?
২। ই-গভর্নেন্স'-এর অর্থ কী?
৩। সুশাসন' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
৪ । ফ্যাক্স কী?
৫। CCTV-এর পূর্ণরূপ কী?
৬। SMS-এর পূর্ণরূপ কী?
৭ oMR-এর পূর্ণরূপ কী?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। ই-গভর্নমেন্ট’ বলতে কী বোঝায়?
২। ই-গভর্নেন্স বলতে কী বুঝ?
৩। ট্রাকিং সিস্টেম বলতে কী বুঝ?
৪। হ্যাকিং বলতে কী বুঝ?
৫। ইন্টারনেট কী?
৬ । ডিজিটাল পদ্ধতি কী?
৭। অনলাইন যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়ঃ

প্রয়োগ দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, সরকার ও জনগণের মধ্যে কীভাবে মিথস্ক্রিয়া সাধিত হয় তা বুঝিয়ে বল।
২। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌছানোকেই ই-গভর্নেন্স' বলে – উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
৩। ই-গভর্নেন্স চালু হলে জনগণ ঘরে বসেই সেবা ও সুযোগ লাভের প্রত্যাশা করতে পারে'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

চিন্তন দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১। ই-গভনেন্স-এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা—বিশ্লেষণ কর।
২। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠিত হলে দক্ষ ও সাশ্রয়ী পন্থায় জনগণের নিকট সেবা পৌছানো যায়—উক্তিটির যথার্থতা প্রমাণ কর।
৩। সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স-এর সম্পর্ক খুবই নিবিড়–উক্তিটি মূল্যায়ন কর।
৪। ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী—উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

সূচিপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

RIGHTS AND DUTIES AND HUMAN RIGHTS

পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। পৌরনীতি ও সুশাসনে অধিকার বলতে বোঝায় সমাজের সকলের জন্য কল্যাণকর কতগুলো সুযোগ-সুবিধা। অপরদিকে অধিকার ভোগের বিনিময়ে একজন নাগরিককে বেশ কিছু দাসত্ব পালন করতে হয়। এসব দায়িত্বকেই নাগরিকের কর্তব্য বলা হয়। অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই একজন নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে এবং নাগরিক জীবন সুন্দর ও সার্থক হয়। অধিকার ও কর্তব্যের । মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার উপভোগ করা যায়। অধিকার ও কর্তব্য উভয়ই সমাজবোধ থেকে উদ্ভূত এবং উভয়েরই রক্ষক সমাজ। অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি এজন্যই বলেছেন যে, অধিকারের ধারণা কর্তব্যহীন হতে পারে না। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সহজাত মানবিক অধিকারগুলোই হচ্ছে মানবাধিকার। মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, অধিকারের প্রশ্নে মানুষ স্বাধীন ও সমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সব সময় সেভাবেই থাকতে চায়' (Man are born and always continue free and equal in respect to their rights) পৌরনীতি ও সুশাসনের এ অধ্যায়ে আমরা অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার সম্পর্কে জানবো।

শিখন ফল ঃ এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। নাগরিক অধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২। নাগরিক অধিকারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবে ।

৩। বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক অধিকারের তুলনা করতে পারবে।

৪ । তথ্য অধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৫ । নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইনের প্রভাব মূল্যায়ন ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৬। কর্তব্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৭। অধিকারের সাথে কর্তব্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে ।

৮। নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আগ্রহী হবে।

৯ । মানবাধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১০। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সুশাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১১। মানবাধিকার রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হবে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দ (Key Words) ঃ

অধিকার (Right), নৈতিক অধিকার, আইনগত অধিকার (Legal rights), সামাজিক অধিকার (Civil rights), রাজনৈতিক অধিকার (Political rights), তথ্য অধিকার, তথ্য কমিশন, কর্তব্য (Duties), রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য (Allegiance to the state), মানবাধিকার (Human Rights), মৌলিক অধিকার (Fundamental rights)।

৫.১ অধিকারের সংজ্ঞা ও অর্থ

Definition and Meaning of Right

পৌরনীতি ও সুশাসনে অধিকার বলতে বোঝায় সমাজের সকলের জন্য কল্যাণকর কতগুলো সুযোগ-সুবিধা। অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। অধিকার ব্যতীত ব্যক্তির জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং

সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তি যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তাই অধিকার। সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষের পারস্পরিক স্বীকৃত দাবিই অধিকার। সমাজেই অধিকারের জন্ম এবং সমাজই এর রক্ষক। এজন্যই অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন যে, "অধিকার সমাজ বহির্ভূত বা সমাজ নিরপেক্ষ নয়। অধিকার সমাজভিত্তিক।"

এল.টি. হব হাউস (LT. Hobhouse)-এর মতে, "প্রকৃত অধিকার বলতে সামাজিক কল্যাণের জন্য কতগুলো শর্তকে বোঝায়।"(Genuine rights are conditions of social welfare)।

অধ্যাপক হল্যান্ড (Prof. Holland)-এর মতে, 'এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাজকর্মকে সমাজের মতামত ও শক্তি দ্বারা প্রভাবিত করার ক্ষমতাই হলো অধিকার' (Rights are one man's capacity of influencing the acts of another by means of the opinion and force of the society).

অধ্যাপক আর্নেস্ট বার্কার (Prof. Earnest Barker)-এর মতে, "অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সেই সকল প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত।" (Rights are those necessaryconditions of the greatest possible development of the capacities of all individuals, which are secured and guaranteed by the State) ।

অধ্যাপক লাস্কি (Prof. Laski) বলেন, "অধিকার হচ্ছে সমাজজীবনের সে সকল শর্তাবলি যা ব্যতীত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে না।" (Rights are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best.)

টি. এইচ. গ্রিন (TH. Green) বলেন, "অধিকার হচ্ছে সেসব বাহ্যিক অবস্থা যা মানসিক পরিপুষ্টি সাধন করে থাকে।" (Rights are the outer conditions essential for man's inner development.)

বোসানকোয়েত (Bosanquet)-এর মতে, "অধিকার হলো এমন দাবি যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক প্রযুক্ত ।" (A right is a claim recognised by society and enforced by the state.)

সুতরাং অধিকার হচ্ছে এমন কতগুলো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা যা সকলের জন্য আবশ্যক। অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। অধিকার ছাড়া মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। অধ্যাপক লাস্কি এ জন্যই বলেছেন যে, "প্রত্যেক রাষ্ট্রই পরিচিত হয় তার প্রদত্ত অধিকার দ্বারা ।" (Every state is known by the rightsit maintains) ।

৫.২ অধিকারের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Right

অধিকারের সংজ্ঞা আলোচনা করলে এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় ঃ

প্রথমতঃ অধিকারের ধারণা মানুষের সামাজিক চেতনাবোধ থেকে উদ্ভূত। সমাজেই এর সৃষ্টি এবং সমাজেই এর বিকাশ ঘটে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত, স্বীকৃত ও সংরক্ষিত।

তৃতীয়তঃ সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে অধিকারও পরিবর্তিত হয়। অধিকার গতিশীল।

চতুর্থতঃ অধিকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির সর্বজনীন কল্যাণ সাধন।

পঞ্চমতঃ অধিকার ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটায়।

ষষ্ঠতঃ অধিকার নাগরিক ও নৈতিক গুণাবলিকে জাগ্রত করে।

সপ্তমতঃ অধিকার সর্বজনীন (universal)।

অষ্টমতঃ অধিকার হচ্ছে কতগুলো সুযোগ-সুবিধা।

নবমতঃ অধিকার অসীম বা অবাধ নয়। কর্তব্য সম্পাদন ব্যতীত অধিকার ভোগ করা যায় না।

৫.৩ অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

Classification of Rights

অধিকারকে প্রথমে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) নৈতিক অধিকার ও (২) আইনগত অধিকার।

১। নৈতিক অধিকার (Moral Rights) ঃ নৈতিক অধিকার বলতে আমরা সে সব অধিকারকে বুঝি যা নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত। সমাজের নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে নৈতিক অধিকারের উদ্ভব। যেমনদরিদ্রের সাহায্য পাবার অধিকার, পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন ও তাদের ভরণপোষণের অধিকার ইত্যাদি। নৈতিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত নয়। এ অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে না। Dictionary of social science গ্রন্থে বলা হয়েছে, "নৈতিক অধিকার, যা মানুষের নৈতিক অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল এবং এগুলো কোনো বৈধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুরক্ষিত নয়।" (Moral rights which are dependent on the ethical feelings of man and they are not guaranteed by any legal authority.) তবে নৈতিক অধিকারের পিছনে সমাজের সমর্থন রয়েছে। কোনো ব্যক্তি এ অধিকার ভঙ্গ করলে সমাজে তার তীব্র সমালোচনা হতে পারে। সার্থক ও সুন্দর সামাজিক জীবনের জন্য নৈতিক অধিকার অত্যাবশ্যক। নৈতিক অধিকার ব্যক্তি ও সমাজভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ।

২। আইনগত অধিকার (Legal Rights) ঃ আইনগত অধিকার বলতে ব্যক্তির সে অধিকারকে বোঝায় যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। আইনগত অধিকারের পিছনে রয়েছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব। আইনগত অধিকার ভঙ্গকারীকে রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া যায়। জীবন ধারণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, চাকরির অধিকার ইত্যাদি আইনগত অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। আইনগত অধিকারের উৎস হচ্ছে রাষ্ট্র।

আইনগত অধিকারকে আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- (ক) সামাজিক অধিকার (Civil Rights), (খ) অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights), (গ) রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) (ঘ)সাংস্কৃতিক অধিকার (Cultural Rights), ধর্মীয় অধিকার (Religions Rights)ব্যক্তিক অধিকার (Personal Rights).

নিম্নে বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

(ক) সামাজিক অধিকার (Civil Rights) ঃ যে সকল অধিকার নাগরিকের সভ্য জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য তাকেই সামাজিক অধিকার বলে। সামাজিক অধিকারসমূহ নিম্নরূপঃ

১. জীবনের অধিকার (Right to life) ঃ জীবনের অধিকার বা আত্মরক্ষার অধিকার নাগরিকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং প্রয়োজনে বাইরেও রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনের বা আত্মরক্ষার নিরাপত্তা বিধান করবে।

২. ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার (Right to liberty) ঃ ব্যক্তি স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রে বসবাস করবে। কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক বা শাস্তিদান করা যাবে না।

৩. চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার (Right to thought and speech) ঃ প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার, মতামত প্রকাশ করার এবং আইন ও সংবিধান মেনে গঠনমূলক সমালোচনার অধিকার ব্যক্তির রয়েছে।

8. সভা-সমিতির অধিকার (Right to association and Meeting): প্রত্যেক নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে, রাষ্ট্র কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি এমন অনুষ্ঠানে বা সভা-সমাবেশে সমবেত হবার, সভা-সমিতি করে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে।

৫. চলা-ফেরার অধিকার(Right to movement): রাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ এলাকা ব্যতীত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে।

৬. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom to Press) ঃ রাষ্ট্র অনুমোদিত সকল সংবাদপত্রের স্বাধীন, নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ খবর প্রকাশ করার অধিকার থাকতে হবে।

৭. চুক্তি সম্পাদনের অধিকার (Right to contract) ঃ যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা আইনানুগ পদ্ধতিতে অপর কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

৮. আইনের চোখে সমানাধিকার (Right to equality before the eye of law) ; জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল মানুষের আইনের চোখে সমানাধিকার থাকতে হবে।

৯. সম্পত্তির অধিকার (Right to Property) ঃ প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ভোগ দখল, বিক্রী ও হস্তান্তর করার অধিকার থাকবে। রাষ্ট্র সম্পত্তি ভোগের নিরাপত্তা বিধান করবে।

১০. ধর্মের অধিকার (Right to Religion) ঃ প্রত্যেক নাগরিক নিজের পছন্দ ও বিশ্বাস অনুযায়ী যে কোনো ধর্মগ্রহণ, পালন ও তা প্রচার করতে পারবে।

১১. পরিবার গঠনের অধিকার (Right to organise family) ঃ পরিবার মানুষের আদি প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক নাগরিকের ইচ্ছেমত বিয়ে করার মাধ্যমে পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে।

১২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার লাভের অধিকার (Right to economic and social justice) ঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুবিচার পাওয়ার অধিকার সকল নাগরিকের রয়েছে।

১৩. শিক্ষার অধিকার (Right to education) ঃ প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত রাখবে এবং শিক্ষা বিস্তারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৪. নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার ঃ প্রত্যেক নাগরিকের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও চর্চার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র তা সংরক্ষণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫. খ্যাতি বা সম্মান লাভের অধিকার (Right to fame) ঃ সকল নাগরিকের তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ খেতাব, সম্মান ও পুরস্কার পাবার অধিকার থাকবে।

(খ) অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights) ঃ যে অধিকার ব্যক্তিকে অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে তাকেই অর্থনৈতিক অধিকার বলে। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. কর্মের অধিকার (Right to work) ঃ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া এবং তা' করার ক্ষমতাকে কর্মের অধিকার বলে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং কর্মসম্পাদনের উপযোগী পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

২. ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার (Right to reasonable wages) ঃ ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের স্বীকৃত অধিকার। ন্যায্য মজুরি প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত না করা হলে কর্মের অধিকার গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে।

৩. বিশ্রাম বা অবকাশ লাভের অধিকার (Right to Rest) ঃ বিশ্রাম বা অবকাশ লাভের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায্য অধিকার। কাজের মাঝে বিরতি, বিশ্রাম, অবকাশ যাপনের সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। এছাড়াও রাষ্ট্রের উচিত কাজের সময়সীমা ও শ্রমঘন্টা নির্ধারণ করে দেওয়া।

৪. শ্রমিক সংঘ বা ইউনিয়ন করার অধিকার (Right to form trade union): আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে কর্মরত ব্যক্তি বা শ্রমিকের সংঘ বা ইউনিয়ন গঠন বা তার সভ্য হবার অধিকার একটি স্বীকৃত অধিকার।

৫. বৃদ্ধ ও অক্ষম অবস্থায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা (Right to economic security in old and incapable condition) : বৃদ্ধ ও কাজকর্ম করতে অক্ষম ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের নিকট থেকে আর্থিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিরা এ অধিকার ভোগ করে।

সূচিপত্র

(গ) রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) ঃ নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের জন্য যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে থাকে তাকেই রাজনৈতিক অধিকার বলে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত। রাজনৈতিক অধিকারসমূহ নিম্নরূপঃ

১. স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার (Right to residence) ঃ আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে যে কোনো নাগরিকের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার রয়েছে।

২. নির্বাচনের অধিকার (Right to election) ; জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ভোট দেবার, নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার রয়েছে।

৩. আবেদন করার অধিকার (Right to Petition) ঃ যে কোনো নাগরিকের তার অভাব-অভিযোগ, চাওয়াপাওয়া ইত্যাদি লিখিত আকারে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট জানানোর অধিকার রয়েছে।

৪. সরকারি চাকরি লাভের অধিকার (Right to hold Public office) ঃ জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের সরকারি চাকরি লাভের অধিকার থাকবে।

৫. বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভের অধিকার (Right to Protection in abroad) : একজন নাগরিক বিদেশে যে রাষ্ট্রেই বসবাস বা অবস্থান করুক না কেন, সেখানে কোনো সমস্যায় পড়লে তার নিজ রাষ্ট্রের সাহায্য এবং নিরাপত্তার সুবিধা লাভের অধিকার থাকবে।

৬. সরকারের সমালোচনা করার অধিকার (Right to criticise Gowerment) ঃ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রয়েছে সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের বা গণবিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনা করার।

(ঘ) সাংস্কৃতিক অধিকার (cultural Rights) ঃ সংস্কৃতি হচ্ছে নাগরিকের আত্মপরিচয়ের বাহন। সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নাগরিক তার ইচ্ছা ও অভিব্যক্তিকে অপরের নিকট প্রকাশ করে। নাগরিকের ব্যক্তিসত্তা ও জাতীয় সত্তাকে তুলে ধরতে হলে প্রত্যেক নাগরিকের সংস্কৃতি চর্চার অধিকার থাকা উচিত।

(ঙ) ধর্মীয় অধিকার (Religious Rights) ঃ ধর্মীয় অধিকার বলতে প্রত্যেক নাগরিকের ইচ্ছামত ধর্মমত গ্রহণ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন ও ধর্মীয় মতামত প্রকাশ সংক্রান্ত অধিকার বোঝায়। নাগরিকের ধর্মীয় অধিকারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বরং কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যেন কারো ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ বা আঘাত করতে না পারে তা দেখা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(চ) ব্যক্তিক অধিকার (Personal Rights) ঃ ব্যক্তিক অধিকার বলতে প্রত্যেক নাগরিকের একান্ত ব্যক্তিগত কিছু সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায়। ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার, চলাফেরার অধিকার, পরিবার সংগঠনের অধিকার, খ্যাতি লাভের অধিকার ইত্যাদি হচ্ছে ব্যক্তিক অধিকার ব্যক্তিক অধিকার ব্যতীত কোনো নাগরিক তার নিজ সত্তাকে বিকশিত করতে পারে না।

নিম্নে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে অধিকারের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো ঃ

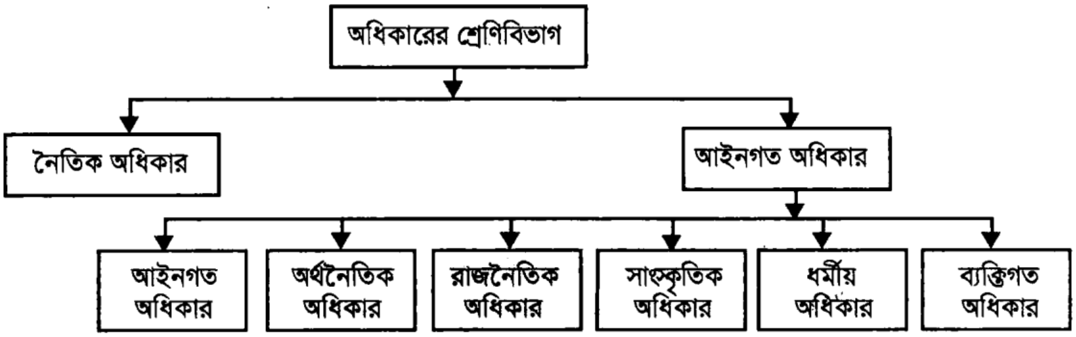

সূচিপত্র

৫.৪ অধিকারের রক্ষাকবচ

Safeguard of Rights

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং সুসভ্য সমাজ জীবনের জন্য অধিকার অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্রই নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রবর্তন ও তা সংরক্ষণ করে থাকে। গণতান্ত্রিক অধিকার ংরক্ষণের শর্তগুলোকে "অধিকারের রক্ষাকবচ" বলে। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. আইন (Law) ঃ আইন হচ্ছে অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ । আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের ফলে অধিকার নিশ্চিত হয়। আইন হচ্ছে অধিকার ভোগের আবশ্যকীয় শর্ত বা রক্ষাকবচ ।

২. গণতন্ত্র (Democracy) ঃ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকগণ নিজেরাই তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়।

৩. সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ঘোষণা (Declaration of Fundamental Rights): নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো রাষ্ট্রের সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলে তা সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। এর ফলে সরকার এ সমস্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। নাগরিকগণ তাদের অধিকার ভোগ করতে কোনো প্রকার সরকারি বাধার সম্মুখীন হয় না।

৪. আইনের অনুশাসন (Rule of Law) ঃ নাগরিক অধিকার নিশ্চিত ও নিরাপদ করতে হলে যথার্থ আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে আইনের চোখে ধনী, দরিদ্র, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবাই সমান। আইনের শাসন বলবৎ থাকলে সরকার স্বেচ্ছাচারমূলক গ্রেপ্তার বা আটক করতে পারে না।

৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of fudiciary): নাগরিক অধিকার রক্ষা করতে হলে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে। স্বাধীন বিচার বিভাগ নাগরিক অধিকারের রক্ষাকবচ। স্বাধীন বিচার বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

৬. জনগণের সজাগ দৃষ্টি (Eternal vigitance of the People) : জনগণের সজাগ দৃষ্টি নাগরিক অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ । প্রত্যেক নাগরিককে নিজের অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হলে কোনো শক্তিই নাগরিকের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। **অধ্যাপক লাস্কির** মতে, "জনগণের সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টিই স্বাধীনতা বা অধিকারের সতর্ক প্রহরী।"

৫.৫ নাগরিকের তথ্য অধিকার

Rights to Information of Citizen

আইনানুগ কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, দাপ্তরিক নথিপত্র, আর্থিক সম্পদের বিবরণ ইত্যাদিকে তথ্য বলা হয়। জনগণের অর্থে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য জানার অধিকারই হলো নাগরিক তথ্য অধিকার' (Right to informatin for citizen)। তথ্য জানার এবং জানানোর অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই রয়েছে।

ওয়েবস্টার ডিকশনারিতে বলা হয়েছে যে, "কোনো বিশেষ ঘটনা, পরিস্থিতি বা এরূপ কোনো কিছু সম্পর্কে ব্যক্তিগত অনুশীলন বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানই হচ্ছে তথ্য। অধিকার বলতে বোঝায় এমন কিছু যা মানুষ অন্যের কাছে বা রাষ্ট্রের কাছে আইনসম্মতভাবে দাবি করে থাকে।"

খ্রিস্টপূর্ব ৬০-২৭ সময়কালে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আমলে তথ্য অধিকার-এর ধারণা বিকশিত হয়। ১৭৬৫-৬৬ সালে ফিনিশীয় রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক এন্ডার্স সাইডিনিয়াস তথ্য অধিকারের ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তবে তথ্য অধিকার বিষয়টি আইনে পরিণত হয় সর্বপ্রথম সুইডিশ পার্লামেন্টে। ১৭৬৬ সালে সুইডিশ পার্লামেন্টে সর্বপ্রথম Ordinance on Freedom of writing and of the Press' আইনটি পাস করে। এরপর

১৯৬৬ সালের ৪ জুলাই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ ভারত, ২০০০ সালে গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি ২০০৫ সালে, ২০১০ সালে পাকিস্তান এবং ২০০৯ সালে বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন পাস করে।

পৃথিবীতে সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক বলেই জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি-বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

৫.৬ বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করে।

তথ্য অধিকার আইন প্রবর্তনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রবর্তনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সূচনাতেই বলা হয়েছে যে,

'যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল অধিকার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক; এবং যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং যেহেতু সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এ তথ্য আইন করা হইল ।

তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য

তথ্য অধিকার আইনের তৃতীয় ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রচলিত অন্য কোনো আইনের—

(ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলি দ্বারা ক্ষুন্ন হবে না; এবং (খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলির সাথে সাংঘর্ষিক হলে, এ আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাবে।

৪র্থ ধারায় বলা হয়েছে যে, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে ।

তথ্য সংরক্ষণ তথ্য

অধিকার আইনের ৫ম ধারায় বলা হয়েছে যে,

১. এ আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

২. প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যে সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলে মনে করবে সে সকল তথ্য, যুক্তিসংগত সময় সীমার মধ্যে, কম্পিউটারে সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে গোটা দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এর ংযোগ স্থাপন করবে।

৩. তথ্য কমিশন তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রবিধান দ্বারা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। সকল কর্তৃপক্ষ এসব নির্দেশনা অনুসরণ করবে।

সূচিপত্র

তথ্য প্রকাশ

তথ্য অধিকার আইনের ৬নং ধারায় বলা হয়েছে যে, -

১. প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকদের নিকট সহজলভ্য করার জন্য সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

২. তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো তথ্য গোপন করতে বা এর সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করতে পারবে না।

৩. প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যথা ঃ –

(ক) কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি; -

(খ) কর্তৃপক্ষের সকল নিয়ম-কানুন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল ইত্যাদির তালিকাসহ রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণিবিন্যাস;

(গ) কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোনো ব্যক্তি যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোনো প্রকার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন, এর বিবরণ এবং উক্তরূপ শর্তের কারণে তার সাথে কোনো প্রকার লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হলে সে সকল শর্তের বিবরণ।

(ঘ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা।

৪. কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সে সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে এবং প্রয়োজনে সে সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করবে।

৫. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করতে হবে এবং এর কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখতে হবে।

৬. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের নিকট উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করতে হবে।

৭. কর্তৃপক্ষ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো উপায়ে প্রচার বা প্রকাশ করবে।

৮. তথ্য কমিশন প্রবিধান দ্বারা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ তা অনুসরণ করবে।

তথ্য কমিশন

তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হবার অনধিক ৯০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশন’ নামে একটি কমিশন গঠিত হবে। তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হবে। তথ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে এবং প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে এর শাখা স্থাপন করা যাবে।

প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্য ২(দুই) জন তথ্য কমিশনার সমন্বয়ে এই কমিশন গঠিত হবে, যার মধ্যে অনূ্যন ১ জন মহিলা হবেন।

কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করলে, কোনো তথ্য চেয়ে না পেলে, কোনো তথ্যের জন্য অযৌক্তিক অংকের মূল্য দাবি করলে, অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করলে, প্রদত্ত তথ্য প্রাপ্ত ও বিভ্রান্তির মনে হলে কোনো ব্যক্তি তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগপত্র দায়ের করতে পারবে। তবে তথ্য কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়েও এই আইনের অধীন কোনো বিষয় বা অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান

করতে পারবে। কোনো অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তথ্য কমিশন কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট যে কোনো তথ্য সরেজমিনে তদন্ত করতে পারবেন।

যেসব তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

তথ্য অধিকার আইনে বলা হয়েছে যে, নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। এ আইনের ৭নং ধারায় বলা হয়েছে যে, এ আইনের অন্যান্য বিধানাবলিতে যা কিছুই থাক না কেন, কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না; যথাঃ

(ক) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে এরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয় যার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(গ) কোনো বিদেশি সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক *IW (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথাঃ

(অ) আয়কর, শুল্ক ভ্যাট ও আবগারি আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোনো আগাম তথ্য; -

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;

(চ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ তথ্য;

(ছ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কাজ ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;

(জ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঝ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য; (জ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য;

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তাধীন কোনো বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;

(ড) কোনো অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;

(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য।

তথ্য প্রাপ্তির উপায়

তথ্য অধিকার আইনের ৮নং ধারায় কীভাবে তথ্য পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

১। কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন।

২। উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবে, যথাঃ

(অ) অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্সের নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা:

(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;

(ই) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি; এবং

(ঈ) কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া, নোট নেওয়া বা অন্য কোনো অনুমোদিত পদ্ধতি।

৩। তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে বা, ক্ষেত্রমত, নির্ধারিত ফরমেটে হতে হবে। তবে তা সহজলভ্য না হলে কিংবা ফরমেট নির্ধারিত না হলে, সাদা কাগজে বা, ক্ষেত্রমত, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাবে।

৪ । তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

৫ । সরকার, তথ্য কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফিস এবং প্রয়োজনে, তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারবে এবং, ক্ষেত্রমত, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণিকে কিংবা যে কোনো শ্রেণির তথ্যকে উক্ত মূল্য প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

৬। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে, বিনামূল্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

তথ্য প্রদান পদ্ধতি

তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।

২। অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি তা অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

৪ । অনুরোধকৃত তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।

৫। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৬। কোনো অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে তিনি উক্ত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

সূচিপত্র

৭। মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের প্রকৃত ব্যয় যেমন- তথ্যের মুদ্রিত মূল্য, ইলেক্ট্রনিক ফরমেট এর মূল্য কিংবা ফটোকপি বা প্রিন্ট আউট সংক্রান্ত যে ব্যয় হবে তা হতে অধিক মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না।

৮। অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যথাযথ বিবেচিত হলে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত তথ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে কিংবা উক্ত তথ্যে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত রয়েছে এবং তৃতীয় পক্ষ তা গোপনীয় তথ্য হিসাবে গণ্য করেছে সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত অনুরোধ প্রাপ্তির ৫ (পাচ) কার্য দিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে এর লিখিত বা মৌলিক মতামত চেয়ে নোটিশ প্রদান করবেন এবং তৃতীয় পক্ষ এরূপ নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনো মতামত প্রদান করলে তা বিবেচনায় নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৯ । তথ্য প্রকাশের জন্য ৰাধ্যতামূলক নয়, এরূপ তথ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবার কারণে কোনো অনুরোধ সম্পূর্ণ । প্রত্যাখ্যান করা যাবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করতে হবে।

১০। কোনো ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধ ব্যক্তিকে কোনো রেকর্ড বা উহার অংশবিশেষ জানানোর প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য লাভে সহায়তা প্রদান করবেন এবং পরিদর্শনের জন্য যে ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন তা প্রদান করাও এই সহায়তার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

৫.৭ নাগরিক জীবনে তথ্য অধিকার আইনের প্রভাব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে। এটি নিঃসন্দেহে এদেশের জনগণের একটি বড় পাওয়া বা অর্জন । তথ্য অধিকার আইনটি প্রবর্তনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকার প্রারম্ভে যে বক্তব্যটি রেখেছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়েছে যে, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা খুবই প্রয়োজনীয়। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুনীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশের নাগরিক জীবনে তথ্য আইন কীভাবে কতটুকু প্রভাব ফেলবে তা উপরে বর্ণিত বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জনগণই এ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক, সকল অধিকারের উৎস। জনগণের ক্ষমতায়ন তখনই সার্থক হয়ে উঠবে যখন সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকে জনগণ সহজেই তথ্য জানতে পারবে। অর্থাৎ তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি হলে জনগণের ক্ষমতায়নের পথটি সুপ্রশস্ত হবে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাসের ফলে বাংলাদেশের জনগণের সে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তথ্য প্রবাহ আইন পাসের ফলে সরকারি-বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবন্ধ সংস্থাগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। কেননা জনগণ এসব প্রতিষ্ঠানের নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পাৰে। এর ফলে দুনীতি হ্রাস পাবে, প্রতিষ্ঠানগুলো আরো গতিশীল হবে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই অবাধ তথ্য প্রবাহের অভাবই দুনীতি বিস্তারের বড় কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৫.৮ বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক অধিকারের তুলনা

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার যুগ, জয় জয়কারের যুগ। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার এই যুগে পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই নাগরিক অধিকার স্বীকৃত। যদিও সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ভোগের প্রকৃতি একই রূপ নয়। এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর নাগরিক অধিকার ভোগের প্রকৃতি ও ইউরোপ-আমেরিকার অধিকার ভোগের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য বিদ্যমান।

পৃথিবীতে সব রাষ্ট্রের মানুষ একইভাবে বা একই পরিমাণ অধিকার ভোগ করে না। এর মূল কারণ হলো সমাজ, রাষ্ট্র তখন সরকার ব্যবস্থার প্রকৃতিগত ভিন্নতা। পৃথিবীতে যেসব রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত

রয়েছে সেখানে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থার অংশগ্রহণ করে নাগরিকগণ নিজেরাই তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে। এছাড়াও অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে। এর ফলে তা সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। এর ফলে সরকার এ সমস্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। নাগরিকরা তাদের অধিকার ভোগ করতে কোনো প্রকার সরকারি বাধার সম্মুখীন হয় না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অর্থ হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের চোখে ধনী, দরিদ্র, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র সবাই সমান। এছাড়াও আইনের শাসন বলবৎ থাকায় সরকার স্বেচ্ছাচারমূলক গ্রেপ্তার বা আটক করতে পারে না। এছাড়াও অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা নাগরিক অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্বাধীন বিচার বিজয় নাগরিক অধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করছে। এছাড়াও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণের সজাগ দৃষ্টিও নাগরিক অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে থাকে। ইউরোপ, আমেরিকার উন্নত রাষ্ট্রগুলোর জনগণ শিক্ষিত ও সচেতন। এজন্যই তারা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ অপেক্ষা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন ।

পৃথিবীতে আজও যেসব রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত রয়েছে সেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করা হয়। একনায়ক জনগণের সম্মতির, জনগণের অধিকারের তোয়াক্কাই করে না। এখানে সহনশীলতার কোনো স্থান নেই। জনগণ সুনাগরিকের গুণাবলির চর্চা ও অর্জনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বিরোধী। ব্যক্তিকে, ব্যক্তির অধিকারকে এখানে রাষ্ট্রের বেদীমূলে বিসর্জন দেয়া হয়। এর ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না। কোনো একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই অধিকারের বিষয়ে সংবিধানে উল্লেখ থাকে না। উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদী রাষ্ট্রগুলোতেও গণতন্ত্র চর্চা এবং অধিকার ভোগের সুযোগ দেয়া হয় না।

নাগরিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের (Globalization) প্রভাব রয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে পুঁজি, অর্থ, সম্পদ ও প্রযুক্তি আজ আর বিশেষ একটি দেশের কুক্ষিগত হয়ে থাকছে না। এগুলোর চলাচল ঘটছে এক দেশ থেকে আর এক দেশে। বিশ্বের সকল দেশের জনগণ এগুলোর সুযোগ-সুবিধা উপভোগের সুযোগ পাচ্ছে বিশ্বায়নের কারণেই। বিশ্বায়নের ফলে সারা পৃথিবী পরিণত হয়েছে একটি গ্লোবাল ভিলেজে (Global village)। সবার কাছে এখন সবকিছু উন্মুক্ত। সবাই সব কিছু জানতে পাচ্ছে। বিশেষ করে মুক্তবাজার অর্থনীতি' বিশ্বায়তনের ধারণাকে আরো কার্যকর করে তুলেছে। বিশ্বায়নের এই ধারণা সম্প্রসারিত হবার ফলে বিশ্বের কোন দেশে কী ধরনের শাসন চলছে, জনগণ কোন দেশে কতটুকু অধিকার ভোগ করছে, কোন দেশে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে ইত্যাদি বিষয় ঘরে বসেই জানতে পারছে। এর ফলে বিশ্বের সব প্রান্তের মানুষ বিভিন্ন দেশে অধিকার ভোগের তারতম্য বা তুলনা করতে পারছে, ভালো অধিকার নিজ দেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠছে।

বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানুষ আজ জানতে পারছে যে, গ্রেট ব্রিটেনের জনগণ যেভাবে, যতটুকু আইনের শাসন' (Rule of Law) ভোগ করে পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণের ভাগ্যে তা জোটে না। হেবিয়াস কর্পাস (Habeus Corpus) আইন ব্রিটিশ জনগণের নাগরিক অধিকারকে যেভাবে সুরক্ষা প্রদান করেছে, তা অনেক দেশেই নেই। বিশ্বের অনেক দেশে মৃত্যুদণ্ড থাকলেও ব্রিটিশ জনগণকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ব্রিটিশ জনগণকে সাধারণত বিনা অপরাধে কারাগারে আটক রাখা হয় না, কিন্তু পৃথিবীতে অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই এটি নেই। ব্রিটিশ জনগণসহ পশ্চিম ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রে স্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার রয়েছে পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তা নেই। ব্রিটিশ জনগণ রাষ্ট্রীয় জীবনে 'জেন্ডার বৈষম্যের শিকার হয় না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ প্রয়োজনবোধে নিজ সুরক্ষায় আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারে যা অনেক দেশেই স্বীকৃত নয়। মার্কিনী জনগণের নিজ দেহ এব নিজ দলিলপত্রাদি সুরক্ষার যে অধিকার ভোগ করে অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই তা দেখতে পাওয়া যায় না।

সূচিপত্র

কানাডায় নারী ও পুরুষের সমতাকে যেভাবে আইন দ্বারা স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, সকল প্রকার লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটানো হয়েছে, লিঙ্গভিত্তিক সন্ত্রাস ও জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়াকে রাষ্ট্রীয় আইনে অপরাধ হিসেবে দেখা হচ্ছে অনেক রাষ্ট্রেই তা কল্পনা করা যায় না।

বিশ্বায়নের ফলে অধিকারের প্রশ্নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর সব দেশেই অধিকার-এর ধারণা বিশ্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। জাতীয় সরকারগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিংবা জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদানে এবং আর্থিক সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণে উদ্যোগী হচ্ছে বা হতে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক, আই.এম,এফ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রভৃতি সংস্থার কল্যাণে বিশ্ব রাজনীতির প্রকৃতিতে বিশেষ করে অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে দেশে দেশে বিরাজমান তারতম্য হ্রাস পাচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ হতে ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নাগরিকের বিভিন্ন প্রকার অধিকারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জন্মসূত্রে ও অনুমোদন সূত্রে নাগরিকগণ যেসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে সেগুলো হলো জীবনধারণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার, ধর্ম চর্চার অধিকার, চুক্তি করার অধিকার, ভোটদানের অধিকার, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, সভা সমিতি করার অধিকার, চাকরি লাভের অধিকার, কর্মের অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার ইত্যাদি। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকেই এদেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্টের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ষড়যন্ত্র চলছে। এদেশে বেশ কয়েকবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। ফলে অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি এসেছে। সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এদেশের জনগণ আন্দোলন-সংগ্রাম করে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারসমূহ মেনে চলার চেষ্টা করছে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' প্রণয়ন করে দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে এদেশের জনগণের একটি বড় পাওয়া বা অর্জন।

৫.৯ নাগরিকের কর্তব্য ঃ ধারণা ও গুরুত্ব

Duties of Citizens : Conception and its Importance

ধারণা ঃ অধিকার ভোগের বিনিময়ে নাগরিককে বেশ কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসব দায়িত্বকেই নাগরিকের কর্তব্য বলা হয়। এজন্যই কর্তব্য বলতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য কোনো কিছু করা বা না করার দায়িত্বকে বোঝায়, যেমন আইন মেনে চলা, নিয়মিত কর প্রদান করা, সন্তানকে শিক্ষাদান করা, যোগ্য প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা, অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট প্রদান না করা ইত্যাদি। কর্তব্য হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গতিশীল, সচল, ন্যায়ানুগ ও প্রাণবন্ত করার জন্য নাগরিকের বিশেষ দায়িত্ব।

রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগের সাথে সাথে প্রত্যেক নাগরিককে কতগুলো দায়িত্ব এবং কর্তব্যও পালন করতে হয়। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। একজন নাগরিক যখনই কোনো অধিকার ভোগ করতে চায় তখনই এর সাথে কিছু কিছু কর্তব্য পালনের বিষয়ও চলে আসে। একজনের অধিকার বলতে অন্য জনের কর্তব্যকে বোঝায়। অধিকার ও কর্তব্য সমাজবোধ থেকে এসেছে। **ম্যাকেঞ্জী** বলেছেন যে, "কর্তব্য হলো এমন এক ধরনের বিশেষ কাজ, যা আমাদেরকে পালন করা উচিত।" (Duty is one kind of special work which we should observe.) **অধ্যাপক আর. সি. আগরওয়াল** (R. C. Aarwal)-এর মতে, "কর্তব্য হলো একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের সদস্যদের প্রতি এক ধরণের বাধ্যবাধকতা।" (A duty is an obligation to a member of a Society or State.)

অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি (Prof. Harold J. Laski)-এর মতে "কর্তব্য ৰলতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গণ কল্যাণের জন্য কোনো কিছু করা বা না করার অধিকারকে বোঝায়।" তিনি ব্যক্তির অধিকারের উপর হস্তক্ষেপকে নিন্দা করে বলেছেন যে, "আমার নিরাপত্তার অধিকারের মধ্যে অপরের অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করার কর্তব্য নিহিত।" একইভাবে **অধ্যাপক হবহাউস** (Prof. Hobhouse) বলেছেন, "ধাক্কা না খেয়ে

পথ চলার অধিকার যদি আমার থাকে তবে অপরের কর্তব্য হলো আমার প্রয়োজনমত জায়গা ছেড়ে দেয়া।" (If I have the right to walk also the street without being Pashed off the Pavement, yeur duty is to give me reasonable room.)

গুরুত্ব ঃ নাগরিকের কর্তব্য পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। কর্তব্যবিমুখ জাতি জীবনে কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্র ও সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি। কর্তব্য পালনের মাধ্যমে একজন নাগরিক তার রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারে। একজন নাগরিকের দেশপ্রেম জাগ্রত হয় কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই। স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা কর্তব্য পালনের মধ্যেই নিহিত।

ভারত, গণচীন, রাশিয়াসহ অনেক রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকের কর্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে নাগরিকের কর্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

৫-১০ কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ বা প্রকারভেদ

Classification of Duties

কর্তব্যকে বেশ কয়েক শ্রেণিতে ভাগ করা যায়; যেমন- ১. সামাজিক, ২. রাজনৈতিক ও ৩, অর্থনৈতিক কর্তব্য। এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

১. সামাজিক কর্তব্য (social Duties) ঃ মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ সমাজেই জন্মগ্রহণ করে, সমাজেই লালিত-পালিত হয় এবং সমাজেই মৃত্যুবরণ করে। এজন্যই এরিস্টটল বলেছেন যে, মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব এবং যে সমাজে বাস করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা। সমাজ জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য মানুষের তাই কর্তব্যও রয়েছে। সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং তা বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন এবং পরিচালনা করা, সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং অংশগ্রহণ করা, সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি হলো একজন নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব।

২. রাজনৈতিক কর্তব্য (Political Duties) ঃ মানুষ শুধু সামাজিক জীবই নয়, সে রাজনৈতিক জীবও। রাজনৈতিক জীব হিসেবে মানুষের রয়েছে বেশ কিছু রাজনৈতিক কর্তব্য। এগুলো হলো—রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, রাষ্ট্রপ্রণীত আইন মেনে চলা, সততা ও সতর্কতার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা, প্রয়োজনে রাষ্ট্রের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসা প্রভৃতি।

৩. অর্থনৈতিক কর্তব্য (Economic Duties) ঃ নাগরিকের বেশকিছু অর্থনৈতিক দায়িত্বও রয়েছে। কর্মক্ষম সকল নাগরিকের রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা, নিয়মিত খাজনা ও কর প্রদান করা প্রভৃতি হলো একজন মানুষের অর্থনৈতিক কর্তব্য।

অন্যান্য কর্তব্য ঃ অন্যান্য কর্তব্য দু প্রকার ঃ (ক) নৈতিক কর্তব্য ও (খ) আইনগত কর্তব্য।

ক. নৈতিক কর্তব্য (Moral Duty) ঃ ব্যক্তি ও সমাজের নীতিবোধ থেকে যে কর্তব্য জন্ম নেয় এবং যা নাগরিক স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে থাকে তাকে নৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন- বাবা-মা ও শিক্ষককে শ্রদ্ধা করা, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া, দরিদ্রকে সাহায্য করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান করা ইত্যাদি।

খ. আইনগত কর্তব্য (Legal Duty) ঃ যে কর্তব্য রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত এবং রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা কার্যকরী করা হয় তাকে আইনগত কর্তব্য বলে । আইনগত কর্তব্য রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য এবং নাগরিকের কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক। নিয়মিত কর দেওয়া, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, সততার সাথে ভোট প্রদান করা ইত্যাদি হলো আইনগত কর্তব্য ।

সূচিপত্র

৫-১১ নাগরিকের কর্তব্যসমূহ

Duties of Citizens

প্রত্যেক নাগরিককে অধিকার ভোগের সাথে সাথে কতগুলো কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই নাগরিক জীবন সংহত ও উন্নত হয়। অধিকার সম্পর্কে নাগরিকদের যেমন সচেতন থাকতে হবে তেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে। নিম্নে নাগরিকদের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

১. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য (Allegiance to the state) ঃ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা সকল নাগরিকের প্রধান কর্তব্য। রাষ্ট্রের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলতে হবে। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ওপর নাগরিকের অধিকার নির্ভরশীল। এজন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে।

২. আইন মান্য করা (Obedience to Law) ঃ রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আইন তৈরি হয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নততর সমাজজীবন প্রতিষ্ঠার জন্য। আইন অমান্য করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। আইন শুধু নিজে মানলেই চলবে না অন্যেরাও যাতে আইন মেনে চলে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। - তবে আইন মেনে চলা বাধ্যতামূলক হলেও সমাজজীবনের পরিপন্থী কোনো আইনের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় প্রতিবাদ করাও নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য ।

৩. সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা (Right to Honest Franchise) ঃ ভোটাধিকার প্রয়োগ করা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। জনপ্রতিনিধিগণ সরকার গঠন করে। সুতরাং নির্বাচনে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সততা ও বিজ্ঞতার সাথে ভোট প্রদান করা উচিত। ভোটাধিকার একটি পবিত্র আমানত। সুতরাং কোনো সচেতন নাগরিকেরই ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

৪. সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব foston (Selection of honest and qualified leadership): যোগ্য ও নির্বাচিত প্রার্থী নির্বাচিত হলে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

৫. নিয়মিত কর প্রদান (Regular Payment of Taxes) ঃ রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর বিভিন্ন কর আরোপ করে এ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। কাজেই নিয়মিত কর প্রদান করা উচিত। নাগরিকগণ যদি স্বেচ্ছায় যথাসময়ে কর প্রদান না করে তাহলে রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা ব্যাহত হবে। নিয়মিত কর প্রদান না করলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন বা অগ্রযাত্রা থেমে যাবে।

৬. রাষ্ট্রের সেবা করা (Public service) ঃ রাষ্ট্রের সেবা করা প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। রাষ্ট্র যদি কোনো নাগরিককে অবৈতনিক বিচারক বা জুরীর দায়িত্ব প্রদান করে কিংবা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সমন পাঠায় তখন তার উক্ত দায়িত্ব পালন করা উচিত। এছাড়া স্থানীয় সমস্যা সমাধান ও স্থানীয় উন্নতির জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করাও একান্ত কর্তব্য।

৭. সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা (To Educate the Children) ঃ শিক্ষা ব্যতীত নাগরিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে না। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষা নাগরিককে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেতন করে। উপযুক্ত শিক্ষা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। সুতরাং সন্তানদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৮. অন্যান্য কর্তব্য (other Duties) ঃ রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়াও নাগরিককে পরিবার, সমাজ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয় ঃ

(ক) পরিবারের প্রতি দায়িত্ব (Duty towards Family) ঃ পরিবারের প্রতিও নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে। যেমন, সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও শিক্ষাদান করা পিতামাতার কর্তব্য। অপরপক্ষে পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রুষা করাও সন্তানের পবিত্র কর্তব্য।

(খ) সমাজের প্রতি কর্তব্য (Duty towards Society) ঃ সমাজ মানুষকে নিরাপদ ও সুসভ্য জীবন দান করে থাকে। সুতরাং সমাজকে সুন্দর ও উন্নত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নাগরিকের। এজন্য নাগরিকের কর্তব্য হলো পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বজায় রাখা। সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করাও নাগরিকের কর্তব্য ।

(গ). আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য (Duty towards International Affairs) ; আধুনিক বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রই একা চলতে পারে না। প্রয়োজনের তাগিদেই এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে বিশ্বের মানুষ আজ পরস্পর বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং বিশ্ব শান্তি ও প্রগতির জন্য সকলের এগিয়ে আসা উচিত। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিশ্ব সমাজের সকল নাগরিকের।

৫.১২ অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

Relation Between Rights and Duties

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক। উভয়ের উৎসই সমাজ। উভয়ের রক্ষকও সমাজ। নাগরিকগণ নিজ নিজ অধিকারের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করে থাকে। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার উপভোগ করা যায়। **অধ্যাপক লাস্কি** বলেন, "আমার নিরাপত্তার অধিকারের মধ্যে অপরকে অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করার কর্তব্য নিহিত রয়েছে।" অধিকার ও কর্তব্যের কয়েকটি দিক সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ –

১. অধিকার ও কর্তব্য একই বস্তুর দুটি দিক ঃ অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। অধিকার ভোগের জন্য যে সকল কাজ সম্পাদন করতে হয় তাই কর্তব্য। কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার সুনিশ্চিত হয়। যেমন, ভোটদানের অধিকার বলতে ভোটাধিকার প্রয়োগের দায়িত্বকে বোঝায়।

২. একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্যকে বোঝায় ঃ আমার বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তেমনি আমার কর্তব্য হলো অন্যের জীবননাশের চেষ্টা না করা। অনুরূপভাবে অধিকার ভোগ করতে হলে আমার কিছু কর্তব্য পালন করতে হবে। যেমন, আমার সম্পত্তি ভোগের অধিকার আছে। সুতরাং অন্যের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ বা অন্য কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি ভোগের অধিকারে বাধা না দেওয়াও আমার কর্তব্য। তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অন্যটি কল্পনা করা যায় না।

৩. অধিকার ও কর্তব্য উভয়ই সমাজবোধ থেকে উদ্ভূত এবং উভয়েরই সংরক্ষক সমাজ ঃ সমাজ থেকে আমরা অধিকার পাই। আবার সমাজের কল্যাণের জন্য আমরা কর্তব্য পালন করে থাকি। অধিকার ভোগের মাধ্যমে সমাজজীবন সজীব হয় ও সচেতনতা লাভ করে। অপরদিকে কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা সমাজজীবন সুসংহত ও উন্নত হয়। যেমন, সমাজ যদি কাউকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয় বিনিময়ে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা সে অন্যকে শিক্ষাদান এবং সমাজের কল্যাণের জন্য কর্তব্য পালন করে থাকে। সুতরাং অধিকার ও কর্তব্যের উৎস সমাজ । সমাজ থেকে উভয়ের সৃষ্টি। উভয়ের সংরক্ষকও সমাজ।

৪. রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার রক্ষা করে। এজন্য নাগরিকগণও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে। নাগরিকের যা অধিকার, রাষ্ট্রের তা কর্তব্য। অপরদিকে রাষ্ট্রের যা অধিকার, নাগরিকের তা কর্তব্য। রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার উপভোগের নিশ্চয়তা দেয়। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নাগরিককে এগিয়ে আসতে হয়। সুতরাং দেখা যায়, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল ও পরিপূরক। এজন্যই বলা হয় যে, অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত (Rights imply duties) ।

৫-১৩ মানবাধিকার

Human Rights

ধারণা ঃ সব মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন। **রুশো** (Rousseau) বলেছেন যে, মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে (Man is born free)। শুধু তাই নয় মানুষ জন্মগতভাবে সমঅধিকার ও সমমর্যাদাসম্পন্ন। ব্যক্তি সমাজ জীবনে যেসব সুযোগ-সুবিধার দাবিদার হয় এবং যা ছাড়া তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে না, তাই মানবাধিকার। মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে এমন কতগুলো অধিকার মানুষের ভোগ করা উচিত যা তার নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। এসব oot t অধিকারই মৌলিক মানবাধিকার।

জাতিসংঘ ভবন

জাতিসংঘ (UNO)-এর মতে, জাতিসংঘ ভবন "মানবজীবনের যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগের দাবিদার হয় এবং যা ছাড়া তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না, সেগুলোই হলো মানবাধিকার।" অধ্যাপক আপাদোরাই (Prof. Appadoria)-এর মতে, "মানবাধিকার হলো প্রকৃতির শাশ্বত ও সর্বজনীন রূপ যা মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন।" এস.পি. হান্টিংটন (S.P. Huntington) বলেন, "মানবাধিকার মানুষের সহজাত, সম-সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এর ফলে মানুষের মানবিকতা পূর্ণতা লাভ করে।" (The human right are inherent, producing equal opportunity makes the humanity a perfect one that never feels dissatisfied at their achievement.) জাতিসংঘের ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, মানবাধিকার ভোগের বেলায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব যে ধরনের নাগরিকই হোক না কেন, তার রাজনৈতিক মতামত ও পদমর্যাদা যাই হোক না কেন, সে যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন, অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য বা পার্থক্য করা হবে না। জাতিসংঘ কর্তৃক মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ গৃহীত ও ঘোষিত হয়। এদিন ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, "অধিকারের প্রশ্নে মানুষ স্বাধীন ও সমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সবসময় সেভাবেই থাকতে চায়।" (Men are born and always continue free and equal in respect to their rights.)

৫.১৪ মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের সম্পর্ক

Relation between Fundamental Rights and Human Rights

মৌলিক অধিকার হলো নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য সে সমস্ত অপরিহার্য শর্তাবলি যা সার্বভৌম রাষ্ট্রের ংবিধান হতে প্রাপ্ত এবং যা সরকারের নিকট অলঙ্ঘনীয়। একমাত্র রাষ্ট্র ঘোষিত জরুরি অবস্থার সময় ব্যতীত কোনো সরকারই মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারে না। মৌলিক অধিকার সংবিধানে গৃহীত হওয়ায় তা সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করে। এর ফলে সরকার এসব অধিকার ভোগে বাধা দিতে পারে না।

অপরদিকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, এমনকি রাজনৈতিক মতামত ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত বা স্বীকৃত অধিকারগুলোই হচ্ছে মানবাধিকার। জাতিসংঘ সনদের ৩ নম্বর ধারা থেকে ৩০ নম্বর ধারা পর্যন্ত প্রায় ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য খুবই কম। অনেক মৌলিক অধিকারই জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারে স্থান পেয়েছে। তবুও উভয়ের মধ্যে যেসব পার্থক্য লক্ষ করা যায় তা হলো ঃ

১. মৌলিক অধিকারের উৎস হলো রাষ্ট্রের সংবিধান। অপরদিকে, মানবাধিকারের উৎস হলো জাতিসংঘ ।

২. মৌলিক অধিকারের রক্ষক হলো রাষ্ট্র এবং সংবিধান। অপরদিকে, মানবাধিকারের রক্ষক হলো জাতিসংঘ।

সূচিপত্র

৩. মৌলিক অধিকারের চেয়ে মানবাধিকারের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। মৌলিক অধিকারের পরিধি যেখানে নিজ রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ, সেখানে মানবাধিকারের পরিধি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত।

৪. এক রাষ্ট্রের স্বীকৃত মৌলিক অধিকার অন্য রাষ্ট্র অপেক্ষা ভিন্নতর হতে পারে। কিন্তু জাতিসংঘভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র একই ধরনের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে এবং তা রক্ষা করতে বাধ্য।

৫. মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রীয় অধিকার, কিন্তু মানবাধিকার আন্তর্জাতিক অধিকার।

৬. মৌলিক অধিকার বিকাশ লাভ করে রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ থেকে, কিন্তু মানবাধিকার বিকাশ লাভ করে আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকে ।

৭. মৌলিক অধিকার অনেকটা সহজে কার্যকর করা যায়, কিন্তু মানবাধিকার কার্যকর করার ক্ষেত্রে তা ততটা সহজ নয়।

৮. মানবাধিকার অপেক্ষা মৌলিক অধিকার অনেকটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ।

৯. ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রে নিরাপত্তা বোধ না করলে মানবাধিকার বলে অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মৌলিক অধিকার ব্যক্তিকে সে সুযোগ প্রদান করে না।

৫-১৫ মানবাধিকারসমূহ

Human Rights

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ গৃহীত ও ঘোষিত হয়। তারপর থেকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ প্রতি বছর এ দিনটিকে মানবাধিকার দিবস' হিসেবে উদযাপন করে থাকে। নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে মানবিক মৌলিক অধিকারগুলোর স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছা ও আদর্শের ওপর নির্ভর করে এর সুষ্ঠ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। রাষ্ট্রসমূহ যতদিন এ অধিকারসমূহ বাস্তবায়ন না করে ততদিন এটা শুধু ঘোষণাই থেকে যাবে। সুতরাং জাতিসংঘের সকল রাষ্ট্রসমূহের একক অথবা সমবেত প্রচেষ্টায় এ মানবাধিকার বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া উচিত। নিম্নে জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার প্রধান ধারাসমূহের বিবরণ দেয়া হলো ঃ

১. সকল মানুষই সম-মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অতএব সকলের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করতে হবে। জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, জন্ম, নির্বিশেষে সকলেই জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকারের অংশীদার। (ধারা-১ ও ধারা-২)

২. প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার থাকবে। (ধারা-৩)

৩. কাউকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা চলবে না। সকল প্রকার দাস প্রথা ও দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ। (ধারা-৪)

৪. কোনো ব্যক্তির প্রতি অমানুষিক নির্যাতন, অত্যাচার, উৎপীড়ন, মর্যাদাহানিকর ব্যবহার ও কোনো প্রকার শাস্তি দান করা চলবে না। (ধারা-৫)

৫. সকলেই আইনের চোখে সমান মর্যাদা পাবে। (ধারা-৬)

৬. আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং সকলেই আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী। (ধারা-৭)

৭. কারো মৌলিক অধিকার ভঙ্গ বা খর্ব করা হলে উক্ত ব্যক্তি বিচারালয়ের মাধ্যমে যথার্থ বিচার পাওয়ার অধিকারী। (ধারা-৮)

৮. কাউকে বিনা কারণে গ্রেফতার, আটক বা নির্বাসন দেয়া যাবে না। (ধারা-৯)

৯. প্রত্যেক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবে এবং এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ সুবিচার পাওয়ার অধিকারী হবে। (ধারা-১০)

১০. যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত না হবে ততক্ষণ সে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করতে পারবে। কেউ দোষী প্রমাণিত না হলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। (ধারা-১১)

১১. গৃহের নিরাপত্তা ও যোগাযোগের গোপনীয়তার অধিকার সকলের থাকবে। কোনো গৃহে বেআইনিভাবে হামলা করা যাবে না এবং কারো গোপন যোগাযোগে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। (ধারা-১২)

১২. প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ দেশের সব এলাকায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাস করতে পারবে এবং নিজ দেশ বা অন্য যে-কোনো দেশ ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন করার অধিকার থাকবে। (ধারা-১৩)

১৩. নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে কোনো ব্যক্তির নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণের অধিকার আছে। (ধারা-১৪)

১৪. প্রত্যেক ব্যক্তিরই জাতীয় অধিকার আছে। কাউকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। (ধারা-১৫)

১৫. জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বিৰাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করতে পারবে। বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার থাকবে। (ধারা-১৬)

১৬. প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত এবং যৌথভাবে সম্পত্তির মালিকানার অধিকার থাকবে। কাউকে জোরপূর্বক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। (ধারা-১৭)

১৭. প্রত্যেকের মুক্ত চিন্তা, ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা থাকবে। প্রত্যেকেই নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারবে। ধর্ম ও বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকার সকলে লাভ করবে। (ধারা-১৮)

১৮. প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন মতামত পোষণ ও প্রকাশ করতে পারবে। (ধারা-১৯)

১৯. প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মিলিত হওয়ার এবং সংঘ গঠন করার অধিকার থাকবে। কোনো ব্যক্তিকে রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনো পেশাভিত্তিক সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না। (ধারা-২০)

২০. আইন শাসনতন্ত্র থেকে প্রাপ্ত কারো মৌলিক অধিকার খর্ব করলে উক্ত ব্যক্তি বিচারালয়ের মাধ্যমে যথার্থ প্রতিকারের ব্যবস্থার অধিকার লাভ করবে।

২১. সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যেকের নিজ রাষ্ট্রের সরকার গঠনের অধিকার থাকবে। প্রত্যেকেই সরকারি চাকরি গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে। (ধারা-২১)

২২. প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের সদস্য হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে। (ধারা-২২)

২৩. প্রত্যেকের কর্মের অধিকার ও কর্মের উপযুক্ত শর্তাদি লাভের অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে যেকোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করার অধিকার ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভের অধিকার থাকবে। বেকারত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ এবং শ্রমিক সংঘ গঠন করার অধিকার থাকবে। (ধারা-২৩)

২৪. প্রত্যেকেরই কর্মজীবনে বিশ্রাম ও অবকাশ এবং কার্য থেকে অবসর এবং বেতনসহ ছুটিভোগের অধিকার থাকবে। (ধারা-২৪)

২৫. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার উপযোগী খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসা লাভের অধিকার থাকবে। এ ছাড়া বেকারত্ব, অসামর্থ্যতা, অসুস্থতা, বৈধব্য, বৃদ্ধ বয়সে কিংবা দৈব-দুর্বিপাকে পূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার লাভ করবে। মা ও শিশুর বিশেষ যত্ন লাভের অধিকার থাকবে। (ধারা-২৫)

২৬. প্রত্যেকের শিক্ষালাভের অধিকার থাকবে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও কাজের যোগ্যতা অর্জনের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের উচ্চ শিক্ষার অধিকার সকলেই সমভাবে ভোগ করবে। (ধারা-২৬)

২৭. প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রত্যেক ব্যক্তি শিল্প ও বিজ্ঞানের ' বিকাশে সুবিধা লাভের পূর্ণ অধিকার সমভাবে ভোগ করবে। (ধারা-২৭)

২৮. সন্ত্রাস, অশান্ত ও কলহপূর্ণ বিশ্বে জাতিসংঘ ঘোষিত মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ সব সময় উপভোগ করা সম্ভব নয় বলে সকলের জন্য সামাজিক ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার অধিকার থাকবে। (ধারা-২৮)

২৯. ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের জন্য প্রত্যেককে অধিকার ভোগের সাথে সাথে তার সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে। কিন্তু জাতিসংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোনো অধিকার ও স্বাধীনতা কেউ ভোগ করতে পারবে না। (ধারা-২৯)

৩০. জাতিসংঘের ঘোষিত অধিকার ও স্বাধীনতা ধ্বংসকারী কোনো রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তির প্রতি এ ঘোষণা আরোপ করা চলবে না। (ধারা-৩০)

৫-১৬ মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসন

সুদূর অতীত থেকেই মনে করা হতো যে, শাসকের লক্ষ্য হবে শাসিত জনগণের কল্যাণ সাধন। এরিস্টটল বলেছেন, রাষ্ট্রের প্রধানতম ও পরিত্রতম লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের জন্য উন্নততর ও কল্যাণকর জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা, জ্ঞানের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা এবং নৈতিক উৎকর্ষতা সাধন করা। এরিস্টটল নিয়মতন্ত্রবাদ ও আইনের শাসনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। এজন্য তিনি সরকারের আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার সম্পর্কিত কাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করারও পরামর্শ প্রদান করেছিলেন।

আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণের অধিকার সুরক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতে থাকে। কেননা এগুলো গণতন্ত্রকে সার্থক ও অর্থবহ করে তোলে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আরো অর্থবহ করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপায় অন্বেষণ করতে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে বর্তমানে নাগরিকের অধিকার ভোগের বিষয়টির প্রতিও খুবই গুরুত্ব প্রদান করা হয়। অনেক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

তবে মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার-এর নীতির প্রতি রাষ্ট্র বা সরকার কতটা আন্তরিক এবং কীভাবে তা বাস্তবায়িত করছে সে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার-এর নীতি কখনো বাস্তবায়িত হতে পারে না। আবার মানবাধিকার-এর নীতিসমূহ কোনো রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত বা প্রয়োগ করা না হলে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। কেননা সুশাসন ও মানবাধিকারের বিষয়টি একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক।

সূচিপত্র

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

(√ চিহ্নটি সঠিক উত্তর)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। অধিকার হচ্ছে সমাজজীবনের সে সকল শর্তাবলি যা ব্যতীত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে না'_উক্তিটি কার?

ক, এরিস্টটল

খ. অধ্যাপক লাস্কি √

গ. টি. এইচ. গ্রিন

ঘ. হব হাউস

২ । অধিকার হচ্ছে সেসব বাহ্যিক অবস্থা যা মানসিক পরিপুষ্টি সাধন করে থাকে—উক্তিটি কার?

ক. টি. এইচ. গ্রিন √

খ. অধ্যাপক লাস্কি

গ. হব হাউস

ঘ. ম্যাকাইভার

৩। অধিকার সমাজ বহির্ভূত বা সমাজ নিরপেক্ষ নয়। অধিকার সমাজভিত্তিক'-উক্তিটি কে করেছেন?

ক, হবহাউস

খ. অধ্যাপক লাস্কি √

গ. টি.এইচ. গ্রিন

ঘ. অধ্যাপক গার্নার

৪। কারা শুধু সামাজিক অধিকার ভোগ করতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না?

ক, বিদেশি √

খ. দেশবাসী

গ. প্রজা

ঘ. উন্মাদ

৫ । কোনটি রাজনৈতিক অধিকার?

ক. অন্ন

খ. বস্ত্র

গ, চিকিৎসা

ঘ, ভোট প্রদান √

৬। কোনটি সামাজিক অধিকার?

ক, সম্পত্তি ভোগের অধিকার √

খ. কর্মের অধিকার

গ. আবেদন করার অধিকার

ঘ. নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার

৭। ‘খ্যাতি লাভের অধিকার’ নাগরিকের কী ধরনের অধিকার?

ক. সাংস্কৃতিক অধিকার

খ, সামাজিক অধিকার √

গ. রাজনৈতিক অধিকার

ঘ, অর্থনৈতিক অধিকার

৮। নাগরিকের সামাজিক অধিকার কোনটি?

ক, পরিবার গঠনের অধিকার √

খ. ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার

গ. আবেদন করার অধিকার

ঘ. ইচ্ছামত ধর্মমত গ্রহণের অধিকার

৯। অধিকার যদি অবাধ হয় তাহলে তা হবে—

ক. কর্তব্য

খ. ন্যায়বিচার

গ. গণতন্ত্র

ঘ. স্বেচ্ছাচার √

১০। প্রত্যেক রাষ্ট্রই পরিচিত হয় তার প্রদত্ত অধিকার দ্বারা—উক্তিটি কার?

ক, অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি √

খ. অধ্যাপক গার্নার

গ. অধ্যাপক গেটেল

ঘ. অধ্যাপক উইলোবি

১১। ভোটদানের এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার কোন ধরনের অধিকার?

ক. সামাজিক

খ, রাজনৈতিক √

গ. নৈতিক

ঘ. অর্থনৈতিক

১২। নাগরিকের প্রধান কর্তব্য কী?

ক. রাষ্ট্রের সেবা করা

খ. নিয়মিত কর প্রদান করা

গ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন √

ঘ. রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা

১৩। ধাক্কা না খেয়ে পথ চলার অধিকার যদি আমার থাকে তবে অপরের কর্তব্য হলো আমার পথ ছেড়ে দেওয়া'–কে বলেছেন?

ক. হ্যারল্ড লাস্কি

খ. উইলোবি

গ. টি.এইচ. গ্রিন

ঘ, অধ্যাপক হবহাউস √

১৪। কত সালের, কত তারিখে জাতিসংঘ কর্তৃক মৌলিক মানবাধিকারসমূহ গৃহীত ও ঘোষিত হয়?

ক, ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর √

খ. ১৯৪৮ সালের ২০ ডিসেম্বর

গ. ১৯৪৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর

ঘ. ১৯৪৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর

১৫। বিশ্ব মানবাধিকার দিবস কোনটি?

ক, ১০ ডিসেম্বর √

খ. ১৫ ডিসেম্বর

গ, ২০ ডিসেম্বর

ঘ, ৩০ ডিসেম্বর

১৬। মানবাধিকার ঘোষিত হয়েছে জাতিসংঘের কোন পরিষদে?

ক. নিরাপত্তা পরিষদ

খ. সাধারণ পরিষদ √

গ, অছিপরিষদ

ঘ, আন্তর্জাতিক আদালত

১৭। অধিকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ কোনটি? -

ক. গণতন্ত্র

খ. আইন

গ জনগণের সজাগ দৃষ্টি √

ঘ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

১৮। রাজনৈতিক অধিকার নাগরিকের কোন শ্রেণির অধিকার?

ক. সামাজিক

খ. নৈতিক

গ. আইনগত √

সূচিপত্র

ঘ. অর্থনৈতিক

১৯। পৌরনীতি মূলত কোন ধরনের অধিকার নিয়ে আলোচনা করে?

ক. সামাজিক

খ. রাজনৈতিক

গ, আইনগত √ঘ, নৈতিক

২০। মানবাধিকারের জন্ম হয়েছে—

ক. প্রেম-ভালোবাসা থেকে

খ. স্নেহ-মায়া-মমতা থেকে

গ, ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে

ঘ, মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ থেকে √

২১। মৌলিক অধিকারের রক্ষক কে?

ক. বিচার বিভাগ

খ. ন্যায়পাল

গ. সংবিধান √

ঘ. প্রধানমন্ত্রী

২২। মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য কোন ধরনের সরকার উপযোগী?

ক. গণতন্ত্র √

খ. একনায়কতন্ত্র

গ. সর্বাত্মকবাদ

ঘ. সামরিক তন্ত্র

২৩। বাংলাদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে মানবাধিকারের অবস্থা খারাপ বা দুর্বল?

ক, শিশু শ্রম

খ. নারী ধর্ষণ ও হত্যা

গ, নারী নির্যাতন

ঘ, সবকটি ক্ষেত্রে (ক, খ, গ) √

২৪। কোনটি সকল অধিকারের উৎস? -

ক. রাষ্ট্র √

খ. সরকার

গ, আইনসভা

ঘ. বিচার বিভাগ

২৫। কোন অধিকারের কথা ভেবে অনেক দেশে বেকার ভাতা প্রদান করা হয়?

ক. সামাজিক অধিকার

খ, রাজনৈতিক অধিকার

গ. অর্থনৈতিক অধিকার

ঘ, সাংস্কৃতিক অধিকার

২৬। কর্তব্যের দাবি কীসের সীমা নির্ধারিত করে?

ক. স্বাধীনতার

খ. ভালোবাসার

গ. অধিকারের √

ঘ, সম্প্রীতির নিয়মিত কর প্রদান করা

২৭। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, কেননা কর প্রদান না করলে—

ক, উন্নয়ন ব্যাহত হয় √

খ, মন্ত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিঘ্নিত হয়

গ. দুনীতিবাজদের দুনীতি করার সুযোগ কমে যায়

ঘ, রাষ্ট্রের জৌলুষ নষ্ট হয়

২৮। মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কোনটি?

ক, সংবিধান √

খ. বিচার বিভাগ

গ, পুলিশ

ঘ. ধর্মীয় বিধি

বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৯ ।মানবাধিকার এমন কতগুলো অধিকার যা নাগরিক জীবনের—

i. বিকাশ ঘটায়

ii. ব্যপ্তি ঘটায়

iii, পতন ঘটায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii √

ঘ. iii

৩০। কোন বিষয়গুলো একই বস্তুর উভয় দিক?

i, অধিকার

ii. কর্তব্য

iii. সচেতনতা

সূচিপত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ji √

ঘ. i ও iii

৩১। সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটলে এর প্রভাবে পরিবর্তিত হয়-

i, মানুষের স্বভাব ।

ii. মানুষের জ্ঞান

iii. মানুষের অধিকার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. Ii

গ. i, ii ও iii

ঘ. iii √

৩২। ব্যারিস্টার অমলের মতে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের লক্ষ্যে করণীয়— i মতামত প্রকাশের অধিকার প্রদান

ii. কর্মের অধিকার প্রদান

iii. ভোটদানের অধিকার প্রদান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii √

৩৩। প্রত্যেক নাগরিকের যেন ধর্মীয় অধিকার ক্ষুন্ন না হয় সে কথা কোথায় লিপিবদ্ধ থাকবে?

i ধর্মগ্রন্থে

ii. সংবিধানে

iii. সাধারণ আইনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. Ii √

গ. i ও ii

ঘ. iii

৩৪। সংবাদপত্র স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত হলে কী হয়?

i, সুস্থ জনমত গঠিত হয়

ii, গণতন্ত্র সফল হয়

iii, রাজনৈতিক দল শক্তিশালী হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও iii

গ. i ও ii √

ঘ. i, ii ও iii

৩৫। মানবাধিকার বিশ্ববাসীকে কী ধরনের স্বাধীনতা প্রদান করতে চায়?

i, বাক স্বাধীনতা

ii. চলাফেরার স্বাধীনতা

iii. স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক, i ও ji √

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৬ ও ৩৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

দৈনিক সংবাদ-এর উপসম্পাদকীয়তে কয়েকদিন আগে লেখা হয়েছে যে, বিশ্বের একটি পরাশক্তি ইরাক, আফগানিস্তানসহ অনেক রাষ্ট্রেই মানবাধিকার লঙ্ঘন করেই চলছে। মনুষ্যবিহীন বা চালকবিহীন বিমান পাঠিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে হামলা চালাচ্ছে। বিশ্বের অনেক দেশের সরকার ক্রস ফায়ার করে মানুষ মারছে। এগুলো সুস্পষ্টভাবেই মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

৩৬। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা–

i বৃহৎ শক্তিগুলোর খেয়ালখুশির ফল

ii. ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ফল

iii. বৃহৎ শক্তিগুলো কর্তৃক বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেয়ার কৌশল

নিচের কোনটি সঠিক? -

ক. i

খ. ii √

গ. iii

ঘ. i, iii

৩৭। মানবাধিকার রক্ষা করতে হলে—

i, জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ করতে হবে

ii, জনগণের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে

iii. জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii √

নিচের ছকটি দেখ এবং ৩৮ ও ৩৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

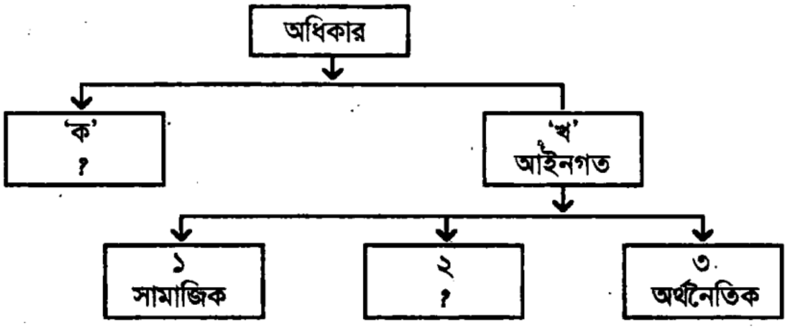

৩৮। দ্বিতীয় সারিতে ক' নং বক্সের ? চিহ্নিত স্থানে কী বসবে?

ক, নৈতিক √

খ. সামাজিক

গ. রাজনৈতিক

ঘ, অর্থনৈতিক

৩৯। তৃতীয় সারিতে ২নং বক্সের ? চিহ্নিত স্থানে কী বসবে?

ক. মৌলিক অধিকার

খ, মানবাধিকার

গ. রাজনৈতিক অধিকার √

ঘ, ধর্মীয় অধিকার

খ. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শুভ্র স্টুডেন্ট ভিসায় জাপানে গেছে। সে সেখানে নিজ দেশের ন্যায় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পায় না। কিছুদিন আগে সে ছুটি কাটাতে দেশে এসেছে। তার গ্রামে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হচ্ছে। সে এখানে ভোট দিতে পারবে। সে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে খুবই সচেতন। শুভ্র জানে যে, একজন নাগরিককে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ

ক, অধিকার বলতে কী বুঝ?

খ, রাজনৈতিক অধিকার কী?

গ, একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি শুভ্রর কর্তব্য কী কী হওয়া উচিত বলে মনে কর?

ঘ. একজন নাগরিককে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হয়—শুভ্রর এই অনুভুতির মূল্যায়ন কর।

২. নিচের আলোচনাটি পড় এবং নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মৌলিক অধিকার নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য অপরিহার্য। একমাত্র রাষ্ট্র ঘোষিত জরুরি অবস্থার সময় কিংবা সংবিধান স্থগিত ও সংশোধন করা ব্যতীত কোনো সরকারই মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারে না। মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য খুব কম। অনেক মৌলিক অধিকারই জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারে স্থান পেয়েছে।

প্রশ্ন

ক, কত সালে, কোথায় মৌলিক মানবাধিকারসমূহ ঘোষিত হয়েছে?

খ. মৌলিক অধিকার কাকে বলে?

গ. মৌলিক অধিকার ও মানবিক অধিকারের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? সেগুলো কী কী?

ঘ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের গুরুত্ব নির্ণয় কর ।

৩. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অধ্যাপক আকমল হোসেন রংপুর ক্যান্ট, পাবলিক কলেজে পৌরনীতি ক্লাসে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলছিলেন যে, ব্যক্তির খেয়ালখুশিমত কিছু করার ক্ষমতাকে অধিকার বলে না। অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। অধিকার উপভোগ এবং কর্তব্য পালন ছাড়া মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ

ক. অধ্যাপক লাস্কি প্রদত্ত অধিকারের সংজ্ঞাটি লেখ।

খ. তিনটি করে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের নাম লেখ ।

গ. অধ্যাপক আকমল হোসেন কেন বলেছিলেন যে, খেয়ালখুশিমত কিছু করার ক্ষমতাকে অধিকার বলে না? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. অধিকার উপভোগ এবং কর্তব্য পালন ছাড়া মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না”—অধ্যাপক আকমলের এই উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

৪. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অং সান সূচীকে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার দীর্ঘদিন নিজ গৃহে অন্তরীণ করে রেখেছিল। তাকে শুধু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে দেয়নি তাই নয়, অনেক সামাজিক অধিকার ভোগের অধিকার থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। মহান নেত্রী সূচী এখন মুক্ত। তিনি মিয়ানমারের জনগণের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যও আপসহীন। নিজ কর্তব্যের প্রতিও তিনি খুবই সচেতন।

প্রশ্ন

ক. কর্তব্য কী?

সূচিপত্র

খ. অধিকার কত প্রকার ও কী কী?
গ, অং সান সূচীকে সামরিক জান্তা যেসব অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল সেগুলো কী কী?
ঘ, কেন অং সান সূচী মিয়ানমারের জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন?

৫. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান সাহেব পেশাগত কাজে সুইডেন ও নরওয়ে গিয়েছিলেন। এসব দেশের নাগরিকদের অধিকার সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। মাহমুদ সাহেব-এর ধারণা একদিন পৃথিবীর সব দেশের মানুষই তাদের অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন।

ক. অধিকার কত প্রকার ও কী কী?
খ. সামাজিক কর্তব্য কী?
গ. মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্যগুলো দেখাও।
ঘ. অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত—উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর ।

৬. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নাজমুল হাসান সাহেব একজন শিক্ষক। তিনি নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তিনি শান্তিতে বিশ্বাসী। এজন্য তিনি যুদ্ধকে ঘৃণা করেন। তিনি চান জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারসমূহ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই বাস্তবায়ন করতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হবে।

প্রশ্ন

ক. মানবাধিকার কী?

খ. মানবাধিকার সংক্রান্ত সাধারণ নীতিগুলো উল্লেখ কর।

গ. বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বাংলাদেশের নাগরিকদের যে সব রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার-এর কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর নাম লেখ ।

ঘ. একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার-এর নীতি কখনও বাস্তবায়িত হতে পারে না—উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর ।

[এ অধ্যায়ের প্রশ্ন-সংকেত]

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। অধ্যাপক লাস্কি প্রদত্ত অধিকারের সংজ্ঞাটি লেখ ।
২। টি. এইচ. গ্রিন প্রদত্ত অধিকারের সংজ্ঞাটি লেখ ।
৩। আইনগত কর্তব্য কাকে বলে?
৪ । পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?
৫। সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?
৬। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য কী?
৭। নিয়মিত কর প্রদান করা নাগরিকের দায়িত্ব কেন?
৮। রাষ্ট্রের সেবা করাকে নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য বলা হয় কেন?
৯। জাতিসংঘ প্রদত্ত মানবাধিকারের সংজ্ঞা দাও।
১০ । অধ্যাপক আপাদোরাই প্রদত্ত মানবাধিকারের সংজ্ঞা দাও।
১১। জাতিসংঘ সনদে কতটি মানবাধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে?
১২। কত সালের, কত তারিখে, কোথায় মৌলিক মানবাধিকারসমূহ গৃহীত ও ঘোষিত হয়?

১৩। মানবাধিকার মানুষের কীরূপ অধিকার?
১৪। বিশ্ব মানবাধিকার দিবস কোনটি? মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য কোন ধরনের সরকার উপযোগী:

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। অধিকার বলতে কী বুঝ?
২। ব্যক্তিগত অধিকার কী?
৩। রাজনৈতিক অধিকার বলতে কী বুঝ?
৪ । একজন নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার কী কী?
৫। রাজনৈতিক অধিকারগুলো কী কী?
৬। সামাজিক অধিকার বলতে কী বুঝ?
৭ । সামাজিক অধিকারগুলো কী কী?
৮। নাগরিকের নৈতিক অধিকার বলতে কী বুঝ?
৯। অধিকার কত প্রকার ও কী কী?
১০ । অধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
১১। কর্তব্য বলতে তুমি কী বুঝ?
১২। নাগরিকের কর্তব্যসমূহ কী কী?
১৩। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য কী?
১৪। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তোমার কর্তব্য কী?
১৫। সামাজিক কর্তব্য কী?
১৬। রাজনৈতিক কর্তব্য কী?
১৭। নৈতিক কর্তব্য কী?
১৮। মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়?
১৯। মানুষ কেন মানবাধিকার সংস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করে?
২০ । মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের সম্পর্ক কীরূপ?
২১। মানবাধিকার ও আর্থ-সামাজিক সাম্যের সম্পর্ক কীরূপঃ
২২। মানবাধিকার সংক্রান্ত সাধারণ নীতি কী কী?
২৩। বাংলাদেশ সংবিধানে মানবাধিকার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?
২৪ । মৌলিক অধিকার কী?

প্রয়োগ দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১ । নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
২। রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক অধিকারের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে? আলোচনা কর।
৩। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে তুমি কি কোন সূক্ষ্ম ও নিবিড় সম্পর্ক দেখতে পাও? আলোচনা কর।
৪। কর্তব্যবিমুখ জাতি জীবনে কখনও উন্নতি লাভ করতে পারে না কেন? ব্যাখ্যা কর।
৫। দেশভেদে আইনগত কর্তব্য ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে তারতম্য লক্ষ করা যায়'-তারতম্যগুলো কী কী?
৬। প্রত্যেক নাগরিককে অধিকার ভোগের সাথে সাথে কতগুলো কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হয়—এগুলো কী
৭ । একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে অধিকারের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।
৮। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ হতে ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নাগরিকের যে অধিকারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেগুলো কী কী?
৯। মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারের মধ্যে তুমি কি কোন পার্থক্য দেখতে পাও? লিখ।
১০। পৃথিবীর সকল মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং সমঅধিকার ও সমমর্যাদাসম্পন্ন। —উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উচ্চতর চিন্তন দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১। সামাজিক অধিকারকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র নাগরিকের জন্য কতগুলো রাজনৈতিক অধিকার প্রবর্তন করে থাকে_উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
২। অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত আছে—উক্তিটি মূল্যায়ন কর।
৩। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং সুসভ্য সমাজ জীবনের জন্য অধিকার থাকলেই চলবেনা তা সংরক্ষণের শর্ত বা রক্ষাকবচও থাকতে হবে –উক্তিটির সমর্থনে রক্ষাকবচগুলো চিহ্নিত কর।
৪ । রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগের সাথে সাথে প্রত্যেক নাগরিককে কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্যও পালন করতে হয়—উক্তিটির গুরুত্ব নির্ণয় কর।
৫ । বাংলাদেশের সংবিধানের ২০ ও ২১ নং অনুচ্ছেদে যেসব কর্তব্য পালনের কথা বলা হয়েছে এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম'_উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।
৬। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই সংবিধানে নাগরিক অধিকারের কথা লেখা থাকলেও সেগুলো সব সময় জনগণ ভোগ করতে পারে না—উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর ।
৭। বাংলাদেশে নাগরিক অধিকার অর্জনে বাধাসমূহ দূর করার জন্য তুমি কী কী উপায় অবলম্বন করার সুপারিশ করবেঃ
৮। মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়–উক্তিটি মূল্যায়ন কর।
৯। উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশে মানবাধিকারের বাস্তব প্রয়োগ অনেক কম –উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
১০। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মানবাধিকারের গুরুত্ব অপরিসীম–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
১১ । মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।
১২। বাংলাদেশে মানবাধিকারের স্বরূপ বর্ণনা কর।
১৩। বাংলাদেশে নির্বিচারে খুন ও গুমের বিষয়টিকে কি মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে মনে কর? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি পেশ কর।
১৪। বাংলাদেশে পুলিশী নির্যাতন এবং ক্রসফায়ারে মৃত্যুকে তুমি কি মানবাধিকার ও আইনের শাসনের পরিপন্থী বলে মনে কর? যুক্তি পেশ কর।
১৫। বিশ্বের একটি পরাশক্তি, চালকবিহীন আকাশযান পাঠিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মানুষ নির্বিচারে মেরে ফেলছে। এ বিষয়ে তোমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কর।

সূচিপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

POLITICAL PARTY, LEADERSHIP AND GOOD GOVERNANCE

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার যুগ। আধুনিক গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় দলীয় ভিত্তিতে। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে তাই দলীয় সরকার বলা হয়। রাজনৈতিক দল হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ। রাজনৈতিক দল এমন এক জনসংগঠন যার সদস্যগণ রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়।

রাজনৈতিক দলের বাইরে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও রয়েছে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হলো স্বেচ্ছামূলক সংগঠিত গোষ্ঠী, যা সরকারি কাঠামোর বাইরে থেকে সরকারি নীতি গ্রহণ, পরিচালনা ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক দলগুলো পরিচালিত হয় নেতার নেতৃত্বে। সুযোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া কোনো দল সুসংগঠিত হতে পারে না এবং কোনো জাতি বা রাষ্ট্র অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। সুযোগ্য নেতৃত্ব একটি জনসমাজকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, স্বাধীন জাতি হিসেবে সুসংগঠিত করে তুলতে পারেন। ভারতে মহাত্মা গান্ধী, দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলা, সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিন, গণচীনে মাও সে তুং, ইন্দোনেশিয়ায় শোয়েকানো, বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরূপ নেতৃত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ।

শিখন ফল ঃ এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা−

১। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের ধারণা করতে পারবে।
২। গণতান্ত্রিক দলের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে।
৪ । সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫ । নেতৃত্বের ধারণা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬ । নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবে।
৭। সুশাসন নিশ্চিতকরণে নেতৃত্বের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৮। নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি অর্জনে আগ্রহী হবে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দ (Key Words):

রাজনৈতিক দল, উপদল, স্বার্থের একত্রীকরণ, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (BiParty system), বহুদলীয় (Multi-Party system), চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, সুশাসন (Good Governance), নেতৃত্ব (Leadership), বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব, সম্মোহনী নেতৃত্ব (Charismatic leadership), এন.জি.ও.।

৬.১ রাজনৈতিক দল ঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

Political Party : Conception and Definition

আধুনিক গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। বর্তমান সময়ের বিশালায়তন রাষ্ট্রগুলোর বিপুল জনগোষ্ঠীর পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। বর্তমানে তাই জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই নির্বাচনকার্য সম্পন্ন হয় দলীয় ভিত্তিতে। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকারকে তাই দলীয় সরকার বলা হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল হলো আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ।

যখন কিছু সংখ্যক মানুষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে একমত পোষণ করে এবং নূয়নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে। রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হলো জনমত সংগ্রহ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া।

যোশেফ এস. সুম্পিটার (Joseph S. Schumpeter)-এর মতে, “রাজনৈতিক দল হলো এমন এক গোষ্ঠী, যার সদস্যদের লক্ষ্য হলো ক্ষমতা লাভের জন্য বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সংঘবদ্ধভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া।”(“A party is a group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for political power”.)

এডমান্ড বার্ক (Edmund Burk) বলেন, “রাজনৈতিক দল এমন এক সংগঠিত জনগোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট " (Party is a body of men, united for the purpose of promoting by their joint endeavours the national interest upon some particular principle on which they are all agreed.)

আর্নেস্ট বার্কার (Earnest Berker) বলেন, “রাজনৈতিক দল হলো বিশেষ একটি মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত এমন একটি দল যা জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন লাভের চেষ্টা করে।” (A party is a particular body of opinion, which is nonetheless concerned with the general national interest and which forms and presents to the choice of the electorate, a programme of general national scope and width.)

অধ্যাপক গেটেল (Gette)-এর মতে, “রাজনৈতিক দল মোটামুটিভাবে সংগঠিত এমন একটি নাগরিক সম্প্রদায় যারা একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কাজ করে এবং যারা তাদের ভোটদান ক্ষমতার দ্বারা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ নীতিগুলোকে কার্যকর করতে চেষ্টা করে ”

ডিজরেলি (Disraeli)-এর মতে, “কতগুলো নীতি অনুসরণের জন্য সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে দল বলা হয়।" (A party is a group of men banded together to pursue certain principles.) - মরিস দুভিরজার-এর মতে, “রাজনৈতিক দল হলো এমন একটি সংঘ যার একটি নির্দিষ্ট কাঠামো আছে।” (A party is a community with a particular structure.)

অধ্যাপক ম্যাকাইভার-এর মতে, “রাজনৈতিক দল হচ্ছে কোনো নীতির সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিচালনায় প্রয়াসী হয়।" (Political Party is an association organisad in support of some Principle of Policy which by constitutional means it endeavous to make the determinant of government.)

সুতরাং রাজনৈতিক দল এমন এক জনসংগঠন যার সদস্যগণ রাষ্ট্রের সদস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়।

৬.২ রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যসমূহ

Characteristics of Political Parties

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ –

১. রাজনৈতিক সংগঠন ঃ রাজনৈতিক দল কিছু সংখ্যক মানুষের একটি রাজনৈতিক সংগঠন। তবে আর্থ-সামাজিক বিষয়ের রাজনৈতিক দলকে ভাবতে হয়, কর্মকাণ্ড চালাতে হয়। মত প্রকাশ করতে হয়।

২. সম-আদর্শে বিশ্বাসী ঃ রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ কম-বেশি একইরূপ আদর্শ ও নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একত্রিত হয়। নীতি-আদর্শের মিলই তাদের মধ্যে মিলনের বন্ধন হিসেবে কাজ করে।

৩. নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় আরোহণ ঃ রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দল এজন্য প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে জনমতকে নিজেদের অনুকূলে রাখতে সচেষ্ট হয়। নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করে। ।

৪. জনমতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ঃ জনমতের দিকে লক্ষ রেখে রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন এবং জয় লাভের চেষ্টা করে। এমনকি সরকার গঠনের পরও রাজনৈতিক দল চেষ্টা করে সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মকাণ্ডের প্রতি যেন জনগণের সমর্থন থাকে।

৫. দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ঃ রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে।

৬. দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ঃ রাজনৈতিক দল দলীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চায়। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে তারা দলীয় নীতি-আদর্শের আলোকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। কেননা নির্বাচনে তারা জনগণের রায় বা সমর্থন লাভ করে থাকে তাদের দলীয় নীতি-আদর্শকে প্রচার করেই।

৬.৩ রাজনৈতিক দল ও উপদল

Political Party and Faction

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচির ভিত্তিতে যখন মিলিত হয় বা একত্রিত হয় তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে। অপরদিকে দলের মধ্যেই যখন কিছু কিছু সদস্য দলীয় নীতি ও কর্মসূচির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে কিংবা সাধারণ স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে উপদল (Faction) বা কুচক্র (Clique) বলে।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

১. রাজনৈতিক দল একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক সংগঠন। কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠনের সকল বৈশিষ্ট্য উপদলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। উপদল রাজনৈতিক দলের একটি খণ্ডিত রূপ।

২. রাজনৈতিক দলের কাঠামো উপদলের কাঠামোর তুলনায় অনেক শক্তিশালী ও ব্যাপক। রাজনৈতিক দলের কাঠামো, কর্মসূচি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাপক। উপদলের কাঠামো, কর্মসূচি ও লক্ষ্য সংকীর্ণ।

৩. নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচি সামনে রেখে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। কিন্তু নীতি ও কর্মসূচি উপদলের নিকট গৌণ বিষয়। উপদল গড়ে ওঠে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিকে নিয়ে।

৪. একই নীতি ও মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ থাকে। কিন্তু উপদলের সদস্যরা সাধারণত কোনো নীতি ও আদর্শের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে না। এজন্য তাদের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক থাকে না।

৫. রাজনৈতিক দল নীতি ও কর্মসূচিকে সামনে রেখে ক্ষমতা দখলের জন্য স্থিতিশীল ও সুসংগঠিত সংগঠন গড়ে তোলে। কিন্তু উপদল এরূপ সংগঠন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়।

৬. রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হলো জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ কিন্তু উপদলের লক্ষ্য হলো সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ সাধন ।

৬.৪ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব

Role and Importance of Political Parties in Democracy

আধুনিক বিশালায়তন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর বিপুল জনগোষ্ঠীর পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো রাজনৈতিক দল। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব নিম্নরূপঃ

১. জনমত গঠন : গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক শক্তির মূল উৎস হলো জনগণ। গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সক্রিয়, সচেতন ও সদাজাগ্রত জনমত। রাজনৈতিক দল বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারের মাধ্যমে সেরূপ জনমত সৃষ্টি করে।

সূচিপত্র

২. সরকার গঠন ঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচি প্রকাশ করে। জনগণ এর মধ্য থেকে সবচেয়ে কল্যাণকর ও বাস্তবমুখী কর্মসূচিসম্পন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের আস্থা ও সমর্থন জ্ঞাপন করে। জনগণ সহজেই তাদের পছন্দনীয় দলকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাসন করার সুযোগ ব্যালটের মাধ্যমে প্রয়োগ করে থাকে।

৩. ভিন্নমুখী মতামতকে একত্রীকরণ ঃ জনগণ সাধারণত স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো বিষয়ে সহজে একমত হতে পারে না। জনগণের ভিন্নমুখী ও বিক্ষিপ্ত মতামতকে সংগঠিত করতে পারে একমাত্র রাজনৈতিক দল। এজন্যই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের ওপর। রাজনৈতিক দলকে এজন্যই স্বার্থ একত্রীকরণকারী' বলা হয়।

৪. জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন ঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলই জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে। সরকারি দল ও বিরোধী দলগুলোর বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণ নিজের দেশ, দেশের সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারে।

৫. বিরোধী বিকল্প পক্ষ ঃ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যেন গণবিরোধী কাজে লিপ্ত না হয়, স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ না হয় সেজন্য বিরোধী দলগুলো সতর্ক দৃষ্টি রাখে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিরোধী দলই বিকল্প সরকার" ।

৬. রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ঃ রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য-বিবৃতি ও কর্মসূচি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে। জনগণ রাজনৈতিক দলের বক্তব্য থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলি জানতে পারে।

৭. শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন ঃ রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার বদলে সাহায্য করে। সরকার পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় না।

৮. সংসদীয় সরকারের জন্য উপযোগী ঃ সংসদীয় সরকার মূলত দলীয় সরকার। দলীয় শৃঙ্খলাই সংসদীয় সরকারকে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনায় দৃঢ় ভূমিকা পালনে সাহায্য করে। এমনকি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতিতেও আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলই সহযোগিতার সেতু বন্ধন গড়ে তোলে ।

৯. স্বার্থের গ্রন্থিকরণ ঃ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (Interest group) assioso দলগুলোর মাধ্যমে নিজেদের দাবি সরকারের নিকট তুলে ধরে এভাবে রাজনৈতিক দল স্বার্থের গ্রন্থিকরণ (Interest articulation) করতে সাহায্য করে।

৬.৫ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি

Functions of Political Parties in Democracy.

আধুনিক গণতন্ত্র বলতে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকেই বোঝায়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হচ্ছে রাজনৈতিক দল। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি বা ভূমিকা নিম্নরূপঃ

১. রাষ্ট্রীয় সমস্যা নির্ধারণ ঃ আধুনিক রাষ্ট্রগুলো আয়তনে বিশাল এবং জনসংখ্যাও বিপুল। অধিকাংশ রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও বিচিত্র ধরনের। এসব জটিল সমস্যা নির্ণয় এবং এগুলোর মধ্যে কোন সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন তা রাজনৈতিক দল নির্ধারণ করে।

২. নীতি-নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন ঃ রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি-নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতেই জনসমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। লোয়েলের মতে, "জনমতকে সবার সামনে উপস্থাপিত করে গণরায় আদায়ের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম লক্ষ্য।" রাজনৈতিক দলের সমর্থকগণ নিজ দলের কর্মসূচির প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকে।

৩. জনমত গঠন : দলীয় নীতি ও কর্মসূচির সপক্ষে জনমত গঠন করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান কাজ। রাজনৈতিক দল বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি এবং প্রচলিত জনমতকে প্রভাবিত করে।

৪. প্রার্থী মনোনয়ন ঃ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলের প্রার্থী মনোনয়ন করে।

৫. প্রচারণা ঃ রাজনৈতিক দল নিজ দলীয় কর্মসূচি এবং প্রার্থীর পক্ষে প্রচারকাজ চালায়। এর ফলে নির্বাচকমণ্ডলী দেশের জন্য কোন দলের কর্মসূচি বা নীতি উপযোগী এবং কোন প্রার্থীকে ভোট দেয়া উচিত তা সহজেই এবং সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে।

৬. ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ ঃ রাজনৈতিক দল ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। ভোটদাতাদের তালিকায় কোনো নির্বাচক বা ভোটারের নাম ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ল কি না, ভোটের সময় ভোটারগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারছে কি না, ভোট গণনায় কোনো অন্যায় বা কারচুপি হচ্ছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক দল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

৭. সরকার গঠন ঃ রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সরকার গঠন করা। নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সে দল সরকার গঠন করে।

৮. বিরোধী ভূমিকা পালন : গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল সরকারের ভুল-ত্রুটি বা গণ-বিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। এর ফলে বিরোধী দলগুলো জনমতের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকারি দলও জনকল্যাণকর কাজে উদ্যোগী হয়।

৯. রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার ঃ রাজনৈতিক দল জনসমর্থন পাওয়ার জন্য নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে প্রচারণা চালায়। এর ফলে জনগণের উদাসীনতা ও অজ্ঞতা দূর হয় এবং জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার ঘটে ।

১০. স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ ঃ রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ কোনো দল বা গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ জনসমক্ষে তুলে ধরে। এর ফলে কোনো দলই গণবিরোধী ও স্বেচ্ছাচার কার্যকলাপে লিপ্ত হতে সাহসী হয় না।

১১. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ঃ রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল জনগণকে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

১২. শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তন ঃ জনস্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত হলে পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল পরাজিত হতে বাধ্য। সরকার পরিবর্তনের জন্য কোনো বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় না। শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তনে রাজনৈতিক দল সহায়তা করে।

১৩. সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধন ঃ সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এজন্য মন্ত্রিপরিষদকে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারেও রাজনৈতিক দল শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

১৪. জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি ঃ রাজনৈতিক দল বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে। ফলে ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত সংকীর্ণ স্বার্থ বা মনোবৃত্তি গড়ে উঠতে পারে না। জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম।

১৫. সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঃ সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নেও দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতন্ত্রে দল ও সরকার এক এবং অভিন্ন।

১৬. স্বার্থের একত্রীকরণ ঃ রাজনৈতিক দল ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও বিভিন্ন পেশার মানুষের স্বার্থের একত্রীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬.৬ রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

Different Forms of Political Party

সংখ্যার ভিত্তিতে দলীয় ব্যবস্থাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়; যথা- (১) একদলীয় ব্যবস্থা (One-Party System), (S) so oso (Bi-Party System) or (5) o osot (Multi-Party system) নিম্নে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ

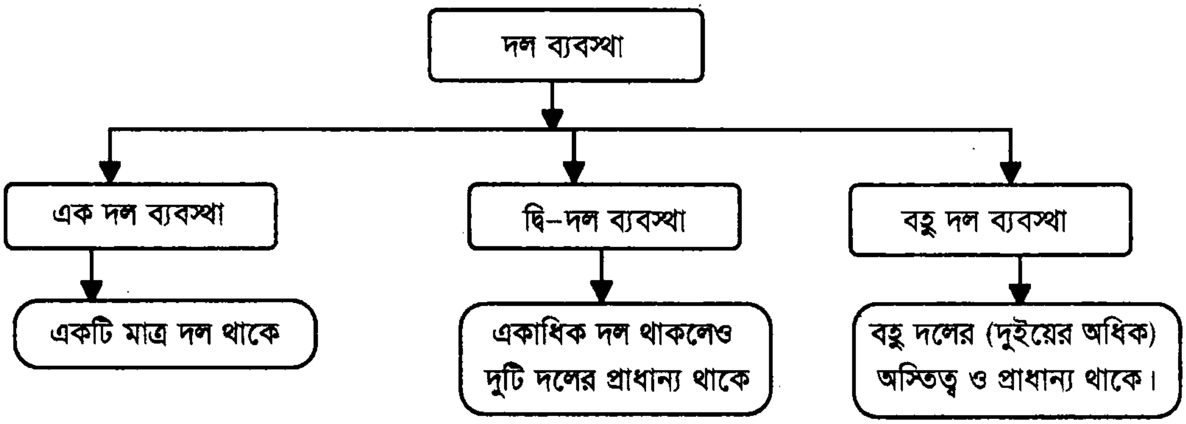

১ । **একদলীয় ব্যবস্থা (one-Party system)** ঃ কোনো দেশে যখন সাংবিধানিকভাবে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে, তখন তাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলে। একদলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ব্যতীত অন্য সকল দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানিতে হিটলারের নাৎসিদল", ইতালিতে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট দল এবং ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় একদলীয় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদী একদলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তি পূজা এবং উগ্র ধনতান্ত্রিক শোষণ-নির্যাতন চলতে থাকে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও এর লক্ষ্য হলো শ্রেণিহীন ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

একদলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ (Merits & Demerits of One Party)

গুণ (Merits) ঃ একদলীয় ব্যবস্থার গুণগুলো নিম্নরূপঃ

১. সরকারের স্থায়িত্ব ঃ একদলীয় ব্যবস্থায় ঘন ঘন সরকার বদল হয় না। সরকার স্থিতিশীল হয়। দীর্ঘদিন দলীয় প্রধানের নেতৃত্বে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

২. সরকারি নীতির ধারাবাহিকতা ঃ একদলীয় ব্যবস্থায় সরকার স্থিতিশীল হওয়ায় সরকারি নীতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

৩. রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি: কোনো ধরনের দলাদলি না থাকায় এবং একই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়।

৪. জরুরি অবস্থায় উপযোগী ঃ একদলীয় ব্যবস্থায় কোনো প্রকার বিরোধিতা না থাকায় এবং জবাবদিহিতার প্রশ্ন না থাকায় সরকার জরুরি অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ একদলীয় ব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হওয়ায়, কোনো প্রকার বিরোধিতা না থাকায় দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৬. দলীয় শৃঙ্খলা ঃ একদলীয় ব্যবস্থায় দলীয় প্রধানই সর্বেসর্বা। কোনো প্রকার বিরোধিতা বা উপদলীয় কোন্দলকে সহ্য করা হয় না। এর ফলে দলীয় শৃঙ্খলা সুদৃঢ় হয়।

সূচিপত্র

৭. শিল্প-জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ঃ একদলীয় ব্যবস্থায় শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়।

৮. দক্ষ শাসন ঃ একদলীয় ব্যবস্থায় কথায় কথায় বিরোধিতা, হরতাল, আইনসভা বর্জন, জ্বালাও পোড়াও বরদাশত করা হয় না। এর ফলে দক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ।

দোষ (Demerits): একদলীয় ব্যবস্থার দোষগুলো নিম্নরূপঃ

১. গণতন্ত্র বিরোধী ঃ একদলীয় ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত হয়। একদলীয় ব্যবস্থায় সকল জনগণের হাতে ক্ষমতা চর্চার সুযোগ থাকে না। একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্র বিরোধী।

২. ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী ঃ একদলীয় ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী। এতে ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা, সরকারের ভুল-ভ্রান্তির সমালোচনা করার স্বাধীনতা থাকে না।

৩. ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ ঃ একদলীয় ব্যবস্থায় মানুষের সব অধিকার হরণ করে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়।

৪. রাজনৈতিক শিক্ষার পথ রুদ্ধ ঃ জনগণ স্বাধীনভাবে রাজনীতি চর্চা করতে পারে না। এর ফলে এই ব্যবস্থায় জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

৫. রাষ্ট্রীয় বিষয়ে উদাসীনতা সৃষ্টি ঃ একদলীয় ব্যবস্থায় রাজনীতিতে ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে না। ফলে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জনগণের মধ্যে উদাসীনতার সৃষ্টি হয়।

৬. বিপ্লব-বিদ্রোহের সম্ভাবনা ঃ একদলীয় ব্যবস্থায় জনগণ সরকারের তথা ক্ষমতাসীন দলের কোনো কাজের সমালোচনা করতে পারে না। এর ফলে জনগণের মনে ক্ষোভ দানা বাধতে পারে এর ফলে একদিন জনগণের এ ক্ষোভ বিদ্রোহ-বিপ্লবের জন্ম দিতে পারে।

৭. সুষ্ঠ জনমত বিকাশে বাধা ঃ একদলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী মত প্রকাশের সুযোগ না থাকায়, গঠনমূলক সমালোচনাকে দমন করে রাখার ফলে, প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকায় সুষ্ঠু জনমত বিকশিত হতে পারে না।

২। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-Party System or Two-Party System): যখন কোন দেশে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দল দেখতে পাওয়া যায়, তখন তাকে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বলে। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রধান দুটি প্রতিদ্বন্দী দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেটিক পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টি এবং গ্রেট ব্রিটেনে রক্ষণশীল দল (Conservative Party) ও শ্রমিক দল (Labour Party) দ্বিদলীয় ব্যবস্থার উজ্জ্বল উদাহরণ।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ (Merits and Demerits of Bi-Party System)

গুণ (Merits) ঃ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার গুণগুলো নিম্নরূপঃ –

১. সহজে সরকার গঠন ঃ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সহজে সরকার গঠন করা যায়। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা বিজয়ী দলকে সরকার গঠনের জন্য আহবান জানানো হয়। সংখ্যালঘু দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে।

২. সরকারের স্থিতিশীলতা: দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দুটি শক্তিশালী দল থাকে। একটি সরকার গঠন করে, অন্যটি বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। এর ফলে সরকারের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

৩. প্রতিনিধিত্বশীল শাসনের সহায়ক ঃ কোনো-না-কোনো দল নিশ্চিতভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলে সরকার গঠনে দ্বিধা-দ্বন্দু থাকে না। এজন্যই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাকে প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার জন্য সহায়ক মনে করা হয়।

৪. জনগণের পক্ষে সুবিধা ঃ মাত্র দুটি সংগঠিত দল থাকায় জনগণের পক্ষে এর মধ্যে একটিকে বেছে নেয়া সহজ হয়।

৫. যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচনে সহায়ক ঃ মাত্র দুটি সুসংগঠিত দল থাকায় এবং প্রার্থী কম থাকায় সাধারণ জনগণের পক্ষে যোগ্যতম প্রার্থী বাছাই করা বা নির্বাচন করা সহজ হয়।

৬. জোট গঠনের প্রয়োজন পড়ে না ঃ প্রধানত দুটি শক্তিশালী দল থাকায় নির্বাচনে জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। ফলে দুর্বল সরকার গঠনের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।

৭. সুশাসনে সহায়ক: দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দলকে অন্য কোনো দলের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। ফলে ক্ষমতাসীন সরকারি দল নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সরকার পরিচালনা করতে পারে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

৮. বিপ্লবের সম্ভাবনা কম ঃ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনে একটি দল জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠন করত পারে। বিরোধী দলও সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারে। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন সম্ভব বলেই বিপ্লবের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

৯. সন্তোষজনক ব্যবস্থা ঃ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বিকশিত হয় বিদ্যমান বড় দল দুটির পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুযায়ী। এক দল অপর দলের গঠনমূলক সমালোচনা করলেও তা উগ্র বিরোধিতার রূপ ধারণ করে না। এ জন্যই অধ্যাপক লাস্কি (Prof. H. J. Laski) দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সন্তোষজনক ব্যবস্থা বলেছেন।

১০. স্বৈরাচার প্রতিরোধে সহায়ক ঃ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের সমালোচনার ভয়ে সরকার স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না।

১১. জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ঃ বিরোধিতা এবং সমালোচনার ভয়ে কোনো দলই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজে লিপ্ত হতে পারে না কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে সাহসী হয় না।

দোষ (Demerits) ঃ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার দোষগুলো নিম্নরূপ ঃ –

১. সব মত প্রকাশিত হয় না ঃ দুটো মাত্র দলের মাধ্যমে বহুমুখী ও বহু আদর্শে বিশ্বাসী জনগণের মতামতকে প্রকাশ করা যায় না। দুটোর অধিক দল না থাকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনগণ একটি মাত্র দলকে সমর্থন জানাতে বাধ্য হয়।

২. স্বৈরাচারের সম্ভাবনা ঃ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় কোনো দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতাসীন হলে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। কেননা, দলীয় আদর্শ ও নিয়মানুবর্তিতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ সমর্থকগণ অন্ধভাবে নিজ দলকে সমর্থন করে থাকে। ফলে বিরোধী দলের সমালোচনায় কর্ণপাত না করে সরকারি দল স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

৩. মন্ত্রিসভায় একনায়কত্ব ঃ সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় তত্ত্বগত দিক থেকে আইনসভার সার্বভৌমত্রে কথা বলা হলেও বাস্তবে দলীয় শৃঙ্খলার কারণে তা মন্ত্রিসভার একনায়কত্বে' (Cabinet dictatorship) পরিণত হয়।

৪. আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস ঃ দলীয় শৃঙ্খলার কারণে আইনসভায় সদস্যগণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন না। তাছাড়া কোনো দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে গণবিরোধী যে কোনো আইন প্রণয়নে সে দল সাহসী হতে পারে। কেননা আইনসভায় যে কোনো আইন পাস করতে এরূপ দলের কোনো অসুবিধা হয় না।

৫. রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে না ঃ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দুটি দলের বাইরে অন্য কোনো শক্তিশালী বা উল্লেখযোগ্য দল বিকশিত না হওয়ায় মধ্যপন্থি মতামতের বিকাশ ঘটে না। এর ফলে জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে না ।

৩। বহুদলীয় ব্যবস্থা (Multi-Party system) ঃ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন দুটির বেশি দল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তখন তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত সাধারণ নির্বাচনে কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। ফলে নির্বাচনে জয় লাভের জন্য অনেক সময় সমমনা দলগুলোর সমন্বয়ে সম্মিলিত সরকার' (Coalition Government) গঠিত হয়। ফ্রান্স, ইতালি, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে এরূপ বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

বহুদলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ(Merits & Demerits of Multi-party System)

গুণ (Merits) ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থার গুণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. সুষ্ঠ জনমত প্রকাশের সহায়ক ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থা সমাজের ভিন্নমুখী জনমত প্রকাশে সহায়তা করে। কেননা, অনেকগুলো রাজনৈতিক দল থাকলে কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দলের নীতি-আদর্শের সাথে জনগণের মতামত ও বিশ্বাসের মিল হবেই।

২. কায়েমী স্বার্থের বিকাশে বাধা প্রদান ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থা জনমত অর্জনের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা থাকায় কোনো দল অপ্রতিহত প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না এবং কায়েমী স্বার্থের বিকাশ ঘটাতে পারে না।

৩.স্বৈরাচার প্রতিরোধ: বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোনো দলই নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না

৪. রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বক্তব্য-বিবৃতি এবং আলোচনা ও সমালোচনার ফলে জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার ঘটে ।

৫. জনগণের জন্য সুবিধাজনক ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থায় বহু মত ও পথের অনুসারী রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠায় জনগণ সহজেই তাদের আদর্শ ও মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক দলকে খুঁজে নিতে পারে।

৬. নতুন ভাবধারার প্রকাশ ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থায় সমাজের বিভিন্নমুখী চিন্তাধারা অবাধে প্রকাশ লাভ করতে পারে। বিশেষ করে এর ফলে নতুন নতুন ভাবধারা বিকশিত হবার সুযোগ পায়।

৭. সমস্যার বিভিন্নমুখী সমাধান ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থায় দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সমাধানের উপায় সম্পর্কে জানা যায়। এর ফলে সমস্যা সমাধান সহজতর হয়।

৮. কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ ঃ বহুদীয় ব্যবস্থায় আইনসভার নির্বাচনে কোনো দলের পক্ষেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সহজে সম্ভব হয় না। এর ফলে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে রাজনৈতিক জোট গঠনের বা 'কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৯. সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলোর জন্য সহায়ক ঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলো কোনোদিনই সরকার গঠন করতে পারে না। কিন্তু বহুদলীয় ব্যবস্থা 'কোয়ালিশন সরকার গঠনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে পারে এবং ক্ষমতার রাজনীতিতে অংশীদার হতে পারে।

১০. রাজনৈতিক সচেতনতার বিস্তার ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নীতি-আদর্শ জনগণের সামনে তুলে ধরে। পাশাপাশি অন্যান্য দলের ত্রুটি-বিচুতি তারা জনগণকে জানানোর চেষ্টা করে। এর ফলে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

দোষ (Demerits) ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থার দোষগুলো নিম্নরূপঃ

১. সরকারের স্থায়িত্বহীনতা ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত কোনো দলই নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। এর ফলে সমমনা কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে 'কোয়ালিশন সরকার' গঠন করতে হয়। এরূপ সরকার দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী হয়। কেননা যে কোনো সময় ঐক্যজোট ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

সূচিপত্র

২. সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা ঃ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশের সদ্য স্বাধীন ও উন্নয়নশীল বিশ্বে যে সমস্ত দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান সে সমস্ত দেশে ঘন ঘন সরকারের পতনের ফলে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে।

৩. শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোনো দলই যেমন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না, তেমনি বিরোধী দলগুলোর সাংগঠনিক ক্ষমতাও খুব দুর্বল হয়ে থাকে।

৪. সুষ্ঠ জনমত গড়ে ওঠে না ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেক সময় প্রচার মাধ্যমগুলো রাজনৈতিক চাপে কিংবা অর্থলোভে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করে। এর ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হয় এবং সুষ্ঠু জনমত গড়ে উঠতে পারে না।

৫. বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সমালোচনার ফলে উত্তেজনা ও অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

৬. জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হয় ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থা যে কোনোভাবেই হোক না কেন রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। এর ফলে অনেক সময় জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থকে স্থান দেয়া হয়।

৭. জাতীয় ঐক্য ও সঙ্গতি বিনষ্ট হয় ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় জাতি বিভিন্ন মত ও আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারণায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়।

৮. পারস্পরি সৌহার্দ্য বিনষ্ট করে ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সমালোচনা ও কাদা ছোড়াছড়িতে জনগণের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়। এর ফলে জনগণের পারস্পরিক সৌহার্দ বিনষ্ট হয়।

৯. দুনীতির সুযোগ সৃষ্টি ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থায় সরকার গঠন ও তা টিকিয়ে রাখার জন্য ক্ষমতাসীন জোটের শরীক দলগুলোর মধ্যে সুযোগ-সুবিধা, পদ-পদবি বন্টন করে দিতে হয়। এর ফলে দুনীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৬.৭ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ, স্বার্থের ভিত্তিতেই তারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ হন। **আলফ্রেড গ্রাজিয়ার** (Alfred Grazier)-এর মতে, "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী, যা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।” **এ্যালান আর. বল** (Allan R_Bali) বলেন, “সমমনোভাবাপন্ন সদস্যদের নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীকে বোঝায়।" (A Pressure group can be defined as a group whose members hold share attitude.) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ তাদের পছন্দের দল বা ব্যক্তিকে অর্থ দিয়ে, যানবাহন দিয়ে প্রচার কাজে সাহায্য করে। তাদের পছন্দনীয় দল বা ব্যক্তি নির্বাচিত হয়ে আইনপ্রণয়ন ও শাসন কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। প্রয়োজনবোধে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী মিটিং, মিছিল, শোভাযাত্রার সাহায্যে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে থাকে।

৬.৮ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

Features or Characteristics of Pressure Group

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

১. বেসরকারি সংগঠন ঃ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যগণ বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিবিশেষ। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কোনো আনুষ্ঠানিক সরকারি স্বীকৃতিও সাধারণত থাকে না।

২. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা স্বার্থ ঃ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠিত হয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন, স্বার্থ আদায় বা স্বার্থরক্ষার জন্য বহুমুখী, ব্যাপক সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠিত হয় না। এমনকি জাতীয় কল্যাণের জন্য কোনো মহান উদ্দেশ্যও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর থাকে না।

৩. নির্দলীয় বা অরাজনৈতিক সংগঠন ঃ স্বার্থকামী গোষ্ঠী নিজেকে নির্দল বা অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে মনে করে। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী অরাজনৈতিক চরিত্র নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়।

৪. সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী ঃ স্বার্থকামী গোষ্ঠী সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী। তারা সুসংগঠিত। তাদের লক্ষ্য । সুনির্দিষ্ট ।

৫. সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ঃ স্বার্থকামী গোষ্ঠী আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠন বা সরকারের নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে চায় না। এর লক্ষ্য হলো সরকারের নীতি ও আচরণকে প্রভাবিত করা। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী আইনসভার সদস্যগণকে প্রভাবিত করে নিজেদের অনুকূলে আইন প্রণয়ন করিয়ে নেয়, শাসন বিভাগকে প্রভাবিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায়, পছন্দের দলব্যক্তিকে নির্বাচনে সহযোগিতা প্রদান করে।

৬.৯ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের মধ্যে উৎপত্তি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

১. জাতীয় কল্যাণ ঃ রাজনৈতিক দলের সামনে বৃহৎ জাতীয় কল্যাণের লক্ষ্য থাকে, যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না।

২. সাংগঠনিক পার্থক্য ঃ সাংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য ঃ রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য হলো সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করা।

৪. কাজকর্মের পদ্ধতি ঃ রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজকর্ম সাধারণত গোপন বা অপ্রকাশ্য।

৫. নির্বাচনে অংশগ্রহণ: রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তা করে না।

৬. প্রকৃতিগত পার্থক্য ঃ রাজনৈতিক দল গঠিত হয় বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও পেশার লোকজন নিয়ে। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠিত হয় সমস্বর্থ ও সমমনোভাবাপন্ন লোকদের নিয়ে।

৭. নির্বাচনে অংশগ্রহণ ঃ রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে না।

৬.১০ সুশাসন ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রথাগত ধারণা অনেকটা পাল্টে গেছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশেষ করে দাতাসংস্থা, এনজিও, সিভিল সমাজও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মতোই কাজ করছে। অর্থনীতির উদারীকরণের ধারায় বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বেসরকারি খাতের জন্যে বাধা না হয়ে বরং বেসরকারি খাতের উন্নয়নে ছাড় দিচ্ছে। বিশ্বব্যাংক রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির প্রতি জোর দিচ্ছে, ভর্তুকি হাস, বেসরকারিকরণ ও সরকারি ব্যয় হ্রাস প্রভৃতির ওপর চাপ প্রয়োগ করছে। সরকার এ চাপকে সবসময় উপেক্ষা করতে পারে না। এ সব চাপের ফলে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যয় হ্রাস ইত্যাদির ফলে সুশাসন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সুশীল সমাজ (Civil Society) মানব পুঁজি গঠন, সমাজসেবা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সুশীল সমাজ সরকারের দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সচেষ্ট। সরকার সুশীল সমাজের বক্তব্য বা সুপারিশসমূহকে উপেক্ষা করতে পারে না।

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী যেভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা নিম্নরূপঃ

১. সরকারি নীতি প্রণয়নকে প্রভাবিত করা ঃ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো চাপ প্রয়োগ করে সরকারি নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এমনকি অনেক সময় সরকারি নীতি পরিবর্তনেও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে সরকারের ভূলনীতি, গণবিরোধী পদক্ষেপ পরিবর্তনেও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সক্ষম হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. আইনসভার ওপর প্রভাব বিস্তার ঃ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী আইনসভার সদস্যগণকে প্রভাবিত করে অন্যায় বা গণবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন থেকে সরে আসতে বাধ্য করে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ এবং জনকল্যাণ সাধিত হয়।

৩, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ ঃ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো বিচার বিভাগের ওপর পরোক্ষ চাপ প্রয়োগ করে ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পরিবেশ তৈরি করে। সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি যেন বিচারক পদে নিয়োগ পায়, নিয়োগ লাভের পর যেন স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে পারে এজন্য সরকারের ওপর বা প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. আমলাদের ওপর চাপ প্রয়োগ ঃ সরকারি নীতি বাস্তবায়ন করে আমলারা, কাজেই তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে, গণমুখী আচরণ করতে তারা যেন বাধ্য হন সে পরিবেশ তৈরি করে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করে।

৫. জনমত গঠন ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সুস্থ ও সুষ্ঠু জনমতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী জনমত গঠনের বাহনগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ করে সুশাসনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৬. জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ঃ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সরকারের ওপর, বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিও গোষ্ঠীর ওপর চাপ প্রয়োগ করে থাকে। এর ফলে জাতীয় স্বার্থ প্রাধান্য পায় এবং সুশাসন ত্বরান্বিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েই চলছে।

৬-১১ নেতৃত্ব ঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

Leadership & Conception and Definition

নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ leadership এবং নেতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'leader. "Leadership' শব্দটি এসেছে ইংরেজি lead থেকে। Lead শব্দের অর্থ হলো চালনা কর, পথ দেখানো এবং নির্দেশ প্রদান করা। সুতরাং যিনি নির্দেশ প্রদান করেন, সামনে থেকে সব কিছু পরিচালনা করেন তাকে নেতা (leader) বলে। নেতার গুণাবলি বা যোগ্যতাকে বলে নেতৃত্ব।

সুতরাং নেতৃত্ব বলতে সাধারণত নেতার গুণগুলোকে বোঝায়। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনে নেতৃত্বের অর্থ আরো ব্যাপক। কোনো ব্যক্তি বা কোনো দলের নেতা কতখানি গুণের অধিকারী এবং তা অন্যকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে, পৌরনীতি ও সুশাসনে তাকেই নেতৃত্ব বলে। নেতৃত্ব হচ্ছে সামাজিক গুণ। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করাই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। সুসংহত ও পরিকল্পিত কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকশিত হয়।

এইচ. ও. ডানেল (H. O. Dune)-এর মতে, "সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে সহযোগী হতে প্ররোচিত ও উদ্যোগী করার কাজকেই নেতৃত্ব বলা হয়।"

এলভিন ডব্লিউ গুল্ডনার (A. W. Gouldner)-এর মতে, "নেতৃত্ব ব্যক্তি বা দলের সেই নৈতিক গুণাবলি যা অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়ে বিশেষ দিকে ধাবিত করে।"

সূচিপত্র

কিম্বল ইয়ং (Kimbal Young)-এর মতে, "নেতৃত্ব হলো ব্যক্তির সেই গুণাবলি যার মাধ্যমে সে অন্যের কর্মধারা প্রভাবিত করে এবং অন্য সবার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।" (Leadership is but one form of dominance, in which the followers more or less willingly accept direction and control by another.)

সি. আই. বার্নার্ড (C. I Bernard)-এর মতে, "নেতৃত্ব হলো ব্যক্তিমণ্ডলীয় এমন গুণাবলির সমষ্টি যার মাধ্যমে তারা সংগঠিত কর্মোদ্যোগে জনগণের অথবা তাদের কার্যক্রমের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।" (Leadership refers to the quality of the behaviour of the individuals whereby they guide people or their activities in organized effort.)

সুতরাং নেতৃত্ব হলো এক ব্যক্তি বা একদল ব্যক্তির সেই কাম্য গুণ বা গুণাবলি যা সমাজের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের উদ্দীপ্ত করে।

৬-১২ নেতৃত্বের প্রকারভেদ

Classification of Leadership

নেতৃত্ব প্রধানত চার প্রকারের; যথা ঃ (১) বিশেষজ্ঞ সুলভ নেতৃত্ব, (২) রাজনৈতিক নেতৃত্ব, (৩) সম্মোহনী নেতৃত্ব এবং (৪) প্রশাসনিক নেতৃত্ব বা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্ব।

১. বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব ঃ বিশেষ কোনো জ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, দক্ষতা প্রভৃতির জন্য কোনো ব্যক্তি যে নেতৃত্ব লাভ করেন, তাকে বিশেষজ্ঞ সুলভ নেতৃত্ব বলে। যেমন, একজন চিকিৎসক বা একজন অধ্যাপক তার পেশার সাফল্য দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেন, ভালোবাসা অর্জন করতে পারেন। তার ব্যক্তিগত দক্ষতা, সততা ও সুনামই অপরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে।

২. রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঃ কোনো বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচি প্রচার করতে গিয়ে বা বিশেষ কোনো । রাজনৈতিক দলকে সংগঠিত করার কাজে সাফল্য লাভ করে কোনো ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠতে পারেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব তার কাজ দ্বারা, ত্যাগ-তিতিক্ষা দ্বারা জনগণের আস্থা অর্জন করেন। ভারতে মহাত্মা গান্ধী, নেহরু, বাংলাদেশে শেরে বাংলা ফজলুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী, ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণ, চীনে মাও সে তুং, রাশিয়ায় লেনিন প্রমুখ ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

৩. সম্মোহনী নেতৃত্ব ঃ কোনো বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণকে ভীষণভাবে সম্মোহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বা যাদুকরী নেতৃত্ব বলা হয়। সাধারণত সফল রাজনৈতিক নেতৃত্বই সম্মোহনী নেতৃত্বের অধিকারী হয়। ব্রিটিশ ভারতে মহাত্মা গান্ধী, বাংলাদেশে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমিনী প্রমুখের নেতৃত্বকে যাদুকরী বা সম্মোহনী নেতৃত্ব বলা যেতে পারে। সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রতি জনগণ অন্ধ আবেগে আপুত হয়ে ওঠেন।

৪. প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্ব ঃ অফিস-আদালত, কল-কারখানা প্রভৃতিতে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ব্যবস্থাপকদেরকে ঘিরে যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে তাকে প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্ব বলে। ব্যবস্থাপনার বা প্রশাসনে কোনো ব্যক্তির সাফল্য বা দক্ষতা এরূপ নেতৃত্বের সৃষ্টি করে।

৫. তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব ঃ এ ধরনের নেতৃত্ব একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় লক্ষ করা যায়। একজন তত্ত্বাবধানকারী নেতা কিছুটা কোমল এবং বন্ধুসুলভ ব্যবহারে অভ্যস্ত। তবে সংগঠনের কাজে তার মতামতই প্রাধান্য পায়। সংগঠনের কাজে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের পরামর্শ বা প্রস্তাব শোনা হয় মাত্র।

৬. একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্ব ঃ এক ব্যক্তি ও এক দলের নেতৃত্ব এখানে প্রাধুনা পায়। নেতা একক শাসক হিসেবে শাসন পরিচালনা করেন। সকল অধীনস্থ ব্যক্তি তার আজ্ঞাবহ । তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। জার্মানির হিটলার, ইতালীর মুসোলিনী, স্পেনের ফ্রাঙ্কো, ইরাকের সাদাম হোসেন এরূপ নেতৃত্বের উদাহরণ।

৭. গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব ঃ জনগণের সব বিষয়ে অংশগ্রহণে এ ধরনের নেতৃত্ব বিশ্বাসী। উদাহরণস্বরূপ সংসদীয় গণতন্ত্রের উল্লেখ করা যায়। এ ধরনের নেতৃত্বে আলোচনা সমালোচনার সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের নেতৃত্ব তৈরি হয় জনগণের সমর্থনে। নেতা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

৮. সর্বাত্মকবাদী নেতৃত্ব ঃ সর্বাত্মকবাদী (Totalitarian) রাষ্ট্রে এরূপ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। নেতার সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ সবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তির ব্যক্তি জীবন থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সবকিছুই এরূপ নেতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এমনকি আমলাতন্ত্রেও এরূপ নেতৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। একজন আমলাকে সর্বাত্মকবাদী নেতা হিসেবে ধরা হয়। তিনি নিয়ম-কানুন বিনা প্রশ্নে অনুসরণ করেন। আইন-কানুনের প্রতি তার আনুগত্য এমন ধরনের যে, তিনি অযৌক্তিক নিয়ম-কানুনও অন্ধের মতো মান্য করেন। তিনি উর্ধ্বতনের প্রতি অত্যন্ত বিনীত হলেও অধঃস্তনের প্রতি প্রভুসুলভ আচরণ করেন ।

৯. সনাতন নেতৃত্ব ঃ এ ধরনের নেতৃত্ব সর্বাত্মক, ব্যক্তিভিত্তিক এবং তা একটি নিক্রিয় অদক্ষ গোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে।

৬-১৩ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি

Essential Qualities of Leadership

নেতৃত্ব হলো সামাজিক ও নৈতিক গুণ-বিশিষ্ট। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল-এর মতে, "নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হলো আত্মবিশ্বাস এবং দ্রুত ও সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা।" রবার্ট মিচেলস বলেন, "নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণাবলি হলো ইচ্ছাশক্তি, ব্যাপক জ্ঞান, প্রবল আত্মবিশ্বাস ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা।"

নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণাবলি নিম্নরূপঃ - -

১. ব্যক্তিত্ব ঃ নেতাকে ব্যক্তিত্বের গুণে একক ও অনন্য ভাবমূর্তির অধিকারী হতে হয়। তাকে হতে হয় গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। চরিত্রের মাধুর্য, নমনীয়তা, তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণ নেতাকে ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলে। ব্যক্তিত্বই একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে আসীন হতে সাহায্য করে। নেতাকে এজন্য আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়।

২. বুদ্ধিমত্তা ঃ বুদ্ধিমত্তা নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণ। নেতার বোধশক্তি হবে তীক্ষ্ণ। সমস্যা সমাধানে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে নেতা জনগণের নিকট নিজেকে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। নির্বোধ বা বুদ্ধিহীন মানুষ ভালো নেতা হতে পারেন না।

৩. মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা ঃ নেতাকে সুস্থ দেহ-মনের অধিকারী হতে হয়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে তার পক্ষে জটিল দায়িত্ব পালনের জন্য নিরলস পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। সুস্থ মনের জন্যও চাই সুস্থ দেহ। কেননা সুস্থ দেহে সুস্থ মন বিরাজ করে। নেতা কতটা কর্মদক্ষ ও কষ্টসহিষ্ণু হবেন তা অনেকটা নির্ভর করে তার মানসিক ও দৈহিক সুস্থতার ওপর ।

৪. অভিজ্ঞতা ঃ নেতাকে অভিজ্ঞ হতে হয় । কেননা নেতার সাফল্য অসাফল্যের ওপর গোটা জাতি বা দেশের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে। যে নেতা যে বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করেন তাকে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হয়।

৫. শিক্ষা: নেতা হবেন নিজস্ব বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা ও বিশেষ প্রজ্ঞার অধিকারী। অশিক্ষিত ব্যক্তি সাধারণত ভালো নেতা হন না। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে, রাজনীতির তত্ত্বগত এবং প্রায়োগিক দিক সম্পর্কেও রাজনৈতিক নেতার পড়াশোনা থাকতে হবে। জ্ঞান আহরণের জন্য থাকবে নেতার গভীর আগ্রহ।

৬. দূরদৃষ্টি ঃ জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের। নেতাকে অতীতের আলোকে বর্তমানের মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ করণীয় স্থির করতে হবে। দূরদর্শী নেতার অভাবে জাতি হয় বিভ্রান্ত । জাতীয় জীবনে নেমে আসে হতাশা।

সূচিপত্র

৭. চারিত্রিক কঠোরতা ও কোমলতা ঃ নেতার চরিত্র হবে একদিকে কোমল, অপরদিকে প্রয়োজনবোধে কঠোর। চরিত্রের কোমলতা নেতাকে যেমন জনগণের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি অর্জনে সাহায্য করবে, তেমনি চরিত্রের কঠোরতা ও দৃঢ়তা নেতার প্রতি জনগণের আনুগত্য, শ্রদ্ধা, ভয় ও শৃঙ্খলাবোধকে জাগিয়ে তুলবে।

৮. বাগিতা ও উত্তম শ্রোতা ঃ নেতা যেমন একদিকে হবেন বাগী, তেমনি অন্যদিকে তিনি হবেন ধৈর্যশীল শ্রোতা। বক্তব্যগুণে তিনি যেমন সবার মন জয় করবেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন–ঠিক তেমনি ধৈর্যসহকারে দলীয় সদস্য এবং জনগণের সমস্যা ও বক্তব্য শুনবেন, জানবেন এবং সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করবেন।

৯. নিরপেক্ষতা ঃ জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের বক্তব্যই নেতা শুনবেন এবং সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন। নেতা হবেন নিরপেক্ষ মনের অধিকারী।

১০. ন্যায়নীতিপরায়ণ ঃ নেতা হবেন ন্যায়নীতিপরায়ণ। নীতির প্রশ্নে, ন্যায়ের প্রশ্নে তিনি থাকবেন অটল ও অনড়। নেতা হবেন ন্যায় ও নম্রতার প্রতীক।

১১. উদারতা ঃ নেতার অন্তর হবে উদার। নেতা হবেন উদার ও বিশাল মনের অধিকারী। নেতাকে অবশ্যই ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে সার্বিক সামাজিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। সংকীর্ণতা, দীনতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা ও হীনমন্যতা নেতার মনে ও চিন্তায় ঠাঁই পাবে না।

১২. দায়িত্ববোধ ঃ নেতা হবেন দায়িত্ববোধসম্পন্ন। কেননা দায়িত্ব ব্যতীত নেতৃত্ব অচল। নেতা তার কৃতকর্মের দায়কে সর্বদাই কাধে নিতে প্রস্তুত থাকবেন।

১৩. কথা ও কাজের মিল ঃ নেতার কথায় ও কাজে মিল থাকবে। যোগ্য নেতা জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন না বা জনগণের সাথে প্রতারণা করেন না ।

১৪. আত্মসংযম ঃ নেতাকে আত্মসংযমী হতে হবে। নেতা হবে সহনশীল ও পরমতসহিষ্ণু শাসক নেতার পরম গুণ হলো শান্ত থাকা ।

১৫. স্বার্থহীনতা ঃ নেতা হবেন আসক্তিমুক্ত এবং আত্মস্বর্থহীন। অর্থ ও সম্পদের প্রতি তার কোনো আসক্তি থাকবে না। দৈহিক ভোগবিলাস, নিছক কামনা-বাসনা তাকে আকর্ষণ বা পথভ্রষ্ট করবে না।

১৬. সত্য ও সুন্দরের পূজার ঃ নেতা হবেন সত্য ও সুন্দরের পূজারী। অসত্য এবং অজ্ঞানতা নেতাকে পথভ্রষ্ট করবে না।

৬১৪ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা

নেতৃত্ব হচ্ছে সামাজিক গুণ সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করাই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটে জর্জরিত সমাজ ও রাষ্ট্র সুযোগ্য নেতৃত্ব প্রয়োজন। কেননা সুযোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া কোনো জাতি বা রাষ্ট্র অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলো নেতৃত্বের গুণেই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। পরিবর্তনশীল সমাজকে সুযোগ নেতৃত্বই প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে পারেন, জাতীয় একাত্মতার সংকট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারেন। সুযোগ্য নেতৃত্ব একটি জনসমাজকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, স্বাধীন জাতি হিসেবে সুসংগঠিত করে তুলতে পারেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এরূপ নেতৃত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ।

বর্তমান সময়ে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দুর্বল নেতৃত্ব, দুনীতিপরায়ণ নেতৃত্ব, অদূরদশী নেতৃত্বকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে দেখা যায়। অনেকে আবার সেকেলে ধ্যান-ধারণা নিয়ে সমস্যা মোকাবেলা বা রাষ্ট্রের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে চান। ফলে তাদের শাসনে অপশাসন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান সময়ে তাই বিশ্বব্যাপী সুশাসনের দাবি হয়ে জোরেসোরে উত্থাপিত হচ্ছে। স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, অংশীদারিত্বমূলক, জনকল্যাণকামী প্রশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি বর্তমান সময়ের দাবি ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা নিম্নরূপঃ

১. দলীয় নীতি নির্ধারণ ঃ নেতৃত্বের প্রথম কাজ হলো নিজ দলের নীতি নির্ধারণ নীতি নির্ধারণের ওপর সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করে। তবে দলীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তা সুশাসনের সহায়ক হয়।

২. রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ঃ নেতৃত্বের অন্যতম কাজ হলো রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করা। ভবিষ্যতে দল ক্ষমতায় গেলে কীভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করা হবে এবং সেক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় প্রাধান্য পাবে এবং তা সুশাসনকে ত্বরান্বিত করবে কীনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করত হবে।

৩. সুষ্ঠ জনমত গঠন ঃ জনমত গঠনে নেতৃত্বের ভূমিকা অসামান্য। সুস্থ, সুন্দর, সুষ্ঠু ও কল্যাণকামী জনমত গঠন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করতে নেতৃত্ব যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি ঃ নেতাদের বক্তব্য জনগণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলে। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে সুশাসনও নিশ্চিত হয়।

৫. সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দলকে শক্তিশালী করা, নির্বাচনে জয়লাভ এবং সরকার গঠন করা। সুযোগ্য নেতৃত্ব জয়যুক্ত হয়ে সরকার গঠন করে রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও সঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে—সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন।

৬. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ়করণ ঃ সুযোগ্য নেতৃত্ব বক্তব্য-বিবৃতি এবং প্রচার-প্রচারণা দ্বারা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করে তোলেন। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

৭. সমন্বয় সাধন ঃ সুযোগ্য নেতৃত্ব বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়ন -ঘটান এবং সুশাসন নিশ্চিত করেন।

৮. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুদৃঢ়করণ ঃ সুযোগ্য নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়।

৬.১৫ স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার/এনজিও-র ভূমিকা

এন.জি.ও (N.G.O) হলো Non-Governmental Organisation শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ। বর্তমানে বাংলা ভাষায় এন.জি.ও শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এন.জি.ও বলতে বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে বোঝায়। এন.জি.ও.-গুলো উন্নয়ন সহযোগী। এ কারণে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বে এর সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে এন.জি.ও.সমূহ অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে সাহায্য করে। এসব রাষ্ট্রে এন.জি.ও.গুলো মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানবসম্ভাবনাকে জাগ্রত করে।

স্থানীয় ও গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণে, সম্পদ সমাবেশ ও ক্ষুদ্র পুঁজি সংগ্রহ ও সমাবেশ উন্নয়নমূলক কাজে জনগণের বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণের বিনিয়োগ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নে এন.জি.ও.-গুলো প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেই চলেছে। এন.জি.ও.-গুলোর ভূমিকা বর্তমানে সরকারও মেনে নিয়েছে।

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সরকারি প্রশাসন ও সেবামূলক সংগঠনগুলো জনগণের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকলেও সততা, দক্ষতা এবং সেবামূলক মনোভাবের ঘাটতির কারণে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধিত হয় না। আমলা ও সরকারি প্রশাসনের লালফিতার দৌরাত্ম্য, দুর্নীতি এবং অদক্ষতার কারণে দাতাসংস্থাগুলো বর্তমানে এন.জি.ও.-গুলোর মাধ্যমে উন্নয়ন, ত্রাণ, সাহায্য ও পুনর্বাসনমূলক কাজগুলো করতে আগ্রহী হচ্ছে। এছাড়াও সরকারি প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় যেতে চাননা, পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত গ্রামীণ জনগণের সেবায় আগ্রহ দেখান না। এর ফলেও বিদেশি রাষ্ট্র ও দাতা সংস্থাগুলো এন.জি.ও.-গুলোর দ্বারস্থ হচ্ছে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা সংগঠনসমূহ বর্তমানে G.O. এবং N.G.O. উভয় সংগঠনের সহযোগিতায় তাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করছে।

সূচিপত্র

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

(√ চিহ্নটি সঠিক উত্তর) -

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। রাজনৈতিক দল হচ্ছে কোন নীতির সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিচালনায় প্রয়াসী হয়'–উক্তিটি কার?

ক. যোশেফ এম. সুম্পিটার

খ, এডমান্ড বার্ক

গ. অধ্যাপক ম্যাকাইভার √

ঘ, আর্নেস্ট বার্কার

২। রাজনৈতিক দল এমন এক সংগঠিত জনগোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট'_উক্তিটি কার?

ক. এডমান্ড বার্ক √

খ. আর্নেষ্ট বার্কার

গ. মরিস দুভারজার

ঘ, অধ্যাপক গেটেল

৩। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোনটির ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

ক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

খ, রাজনৈতিক দল √

গ. উপদল

ঘ, কুচক্রী দল

৪। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূলভিত্তি কী?

ক. ছাত্র সংগঠন

খ. রাজনৈতিক দল √

গ, জাতীয় সংসদ

ঘ. আমলাতন্ত্র

৫। 'গণতান্ত্রিক শাসন কার্যত রাজনৈতিক দলের শাসন'_উক্তিটি কার?

ক. এরিস্টটল

খ. অধ্যাপক হারম্যান ফাইনার √

গ. অধ্যাপক লাস্কি

ঘ, লর্ড ব্রাইস

৬। রাজনৈতিক দলের কাঠামো উপদলের কাঠামোর তুলনায় কীরূপ? -

ক. দুর্বল

খ. অনেক দুর্বল

গ, সবল √

ঘ. কম সবল

৭। কিছু স্বার্থনেৰী ব্যক্তিকে নিয়ে কী গড়ে ওঠে –

ক. রাজনৈতিক দল

খ–উপদল √

গ, প্রতিষ্ঠান

ঘ সচিবালয়

৮। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোনটি?

ক রাজনৈতিক দল √

খ. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

গ. জনগণ

ঘ. সরকার

৯। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচ৭নের সময় বিভিন্ন কর্মসূচি প্রকাশ করে কারা?

ক. জনগণ

খ. বেসরকার প্রতিষ্ঠান

গ, চাপ সৃষ্টিকারী দল

ঘ, রাজনৈতিক দল √

১০। ‘স্বার্থ একত্রীকরণকারী বলা হয় কাকে?

ক. চাপ সৃষ্টিকর গোত্র

খ. রাজনৈতিক দলকে √

গ. জনগণকে

ঘ. শিক্ষক সমাজকে

১১। জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে কোনটি?

ক. চাপ সৃষ্টিকার গোষ্ঠী

খ. রাজনৈতিক দল √

গ. সরকার

ঘ. জনগণ

১২। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিকল্প সরকার বলা হয় কাকে?

ক. সরকারি দলকে

খ. সামরিক বাহিনীকে

সূচিপত্র

গ, বিরোধী দলকে √

ঘ. সচিবালয়কে

১৩। রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান কাজ কী?

ক. চাদা ওঠানো

খ. প্রার্থী মনোনয়ন √

গ. নিজ নিজ দলের গুণকীর্তন করা

ঘ, ভোটারদের স্বার্থের পরিবর্তে নিজ দলীয় নেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ

১৪। ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী কোনটি?

ক, একদলীয় ব্যবস্থা √

খ, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা

গ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

ঘ, বহুদলীয় ব্যবস্থা

১৫। রাজনৈতিক জোট গড়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যায় কী ধরনের শাসনব্যবস্থায়?

ক, একদলীয় ব্যবস্থায়

খ, দ্বিদলীয় ব্যবস্থায়

গ, বহুদলীয় ব্যবস্থায় √

ঘ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়

১৬। যুক্তফ্রন্ট কত সালে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে?

ক ১৯৫৪ √

খ. ১৯৭৩

গ. ১৯৭০

ঘ. ১৯৮৪

১৭। রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ?

ক. বৈরী সম্পর্ক

খ. কোনো সম্পর্ক নেই

গ. পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক

ঘ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক √

১৮। রাজনৈতিক দল কাদের নিকট দলীয় কর্মসূচি উপস্থাপন করে?

ক. শাসকের নিকট

খ. নির্বাচনকারীর নিকট

গ নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট √

ঘ, নির্বাচকের নিকট

১৯। রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ নিহিত থাকে কোথায়?

ক. রাষ্ট্রের সংবিধানে

খ, দলের কর্মসূচির মধ্যে √

গ. দলীয় নেতাদের বক্তৃতার মধ্যে

ঘ. দলীয় কর্মীদের মধ্যে

২০। নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়?

ক. নেতার ক্ষমতা

খ. নেতার দাপট

গ. নেতার গুণাবলি √

ঘ, নেতার হঠকারী সিদ্ধান্ত

২১। দেশপ্রেম ও ত্যাগের জন্য দেশবাসী শেখ মুজিবুর রহমানকে কোন উপাধিতে ভূষিত করে?

ক. দেশবন্ধু

খ. বঙ্গরত্ন

গ, বঙ্গবন্ধু √

ঘ. বঙ্গবিবেক

২২। নেতৃত্ব ব্যক্তি বা দলের সেই নৈতিক গুণাবলি যা অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়ে বিশেষ দিকে ধাবিত করে'—মন্তব্যটি কে করেছেন?

ক. জন স্টুয়ার্ট মিল

খ. এলভিন ডরিও গুল্ডনার √

গ. জ্যা জ্যাক রুশো

ঘ, হ্যারল্ড লাস্কি

২৩। কার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে?

ক. রুজভেল্ট

খ, উড্রো উইলসন

গ. রিচার্ড নিক্সন

ঘ, আব্রাহাম লিঙ্কন √

২৪। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে কার নেতৃত্বে?

ক, মহাত্মা গান্ধীর √

খ, জওয়াহেরলাল নেহরু

গ. ইন্দিরা গান্ধী

ঘ, সোনিয়া গান্ধী

২৫। নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হলো আত্মবিশ্বাস এবং দ্রুত ও সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা—উক্তিটি কার?

ক. এইচ, ও, ডানেল

খ. কিম্বল ইয়ং

গ. বার্ট্রান্ড রাসেল √

ঘ. সি. আই. বার্নার্ড

২৬। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে কিসের ওপর –

ক. নেতার দায়িত্ববোধের

খ, সুযোগ্য নেতৃত্বের √

গ. নেতার নিরপেক্ষতার

ঘ, নেতার অভিজ্ঞতার

২৭। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে কে জয়লাভ করেন?

ক. জুলফিকার আলী ভুট্টো

খ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান √

গ. নূরুল আমীন

ঘ. মাওলানা মওদুদী

২৮। আব্রাহাম লিঙ্কন কে ছিলেন?

ক, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট √

খ. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

গ. কানাডার প্রধানমন্ত্রী

ঘ. জার্মানির চ্যান্সেলর

২৯। সম্মোহনী নেতৃত্বের অধিকার আহমেদ শোয়েকানো কোন দেশের নেতা ছিলেন?

ক. মালয়েশিয়া

খ. সিঙ্গাপুর

গ. মিয়ানমার

ঘ, ইন্দোনেশিয়া √

৩০। রাজনৈতিক দল বলতে কোনটি বোঝায়?

ক. একদল লোক

খ. আবাহনী সমর্থকগণ

গ. সংঘবদ্ধ একদল লোক √

ঘ. স্বার্থান্বেষী একদল লোক

৩১। রাজনৈতিক দল কিসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে?

ক. নীতি ও কর্মসূচির ভিত্তিতে √

খ, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে

গ. ন্যায়নীতির ভিত্তিতে

ঘ. ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে

৩২। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকারকে “দলীয় সরকার” বলা হয় কেন?

ক. নির্বাচন হয় দলীয় ভিত্তিতে √

খ. নির্বাচন হয় জনমতের ভিত্তিতে

গ. নির্বাচন হয় মতের ভিত্তিতে

ঘ, নির্বাচন হয় জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে

৩৩। রাজনৈতিক দল ক্ষমতা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজনৈতিক দল সহায়তা করে—

ক. সরকারকে উচ্ছেদ করতে

খ, সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তন করতে √

গ. বিদ্রোহ দমন করে সরকারকে শক্তিশালী করতে

ঘ. জনগণের সমর্থনে সরকার পরিবর্তন করতে

৩৪। কার নেতার প্রতি অন্ধভক্তি ও আনুগত্য প্রদর্শন করেন?

ক. সরকারি কর্মচারীগণ

খ. সেনা সদস্যগণ

গ. রাজনৈতিক দলের সমর্থক ও কর্মীগণ √

ঘ. দেশের সকল জনগণ

৩৫। বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের অপর নাম কী?

ক. কশমতাসীন দলের নেতার শাসন

খ. গুটি কয়েক নেতার শাসন

গ. দলীয় শাসন √

ঘ. কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির শাসন

৩৬। নেতৃত্ব হচ্ছে-

ক. অর্থনৈতিক গুণ

খ. সামাজিক গুণ √

গ. রাজনৈতিক গুণ

ঘ. নৈতিক গুণ

৩৭। দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের ভালোর জন্য নেতার কোন গুণটি থাকতে হবে?

ক. প্রজ্ঞা

খ. দূরদৃষ্টি √

গ. ন্যায়বোধ

ঘ. সংযম

সূচিপত্র

৩৮। সুযোগ্য নেতার জন্য কোনটি অপরিহার্য?

ক, জনগণের আনুগত্য √

খ, সীমাহীন ক্ষমতা

গ. উচ্চশিক্ষা

ঘ. আকর্ষণীয় চেহারা

৩৯। নেতার সিদ্ধান্তের আলোচনা-সমালোচনা করা যায় কোন ধরনের নেতৃত্বে?

ক. সম্মোহনী নেতৃত্বে

খ, গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে √

গ. সনাতন নেতৃত্বে

ঘ, সর্বাত্মকবাদী নেতৃত্বে

৪০। মাহবুব সাহেব একটি রাজনৈতিক দলের নেতা। তিনি ক্ষমতা দখল করেন যেভাবে-

ক. জোর করে

খ, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে √

গ. সমঝোতার মাধ্যমে

ঘ, ছলচাতুরী করে

৪১। নেতার লক্ষ্য হলো—

ক. রাষ্ট্র ও সমাজকে ভুল পথে চালানো

খ, ঘন ঘন ও অহেতুক হরতাল আহবান

গ, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করা √

ঘ, দলীয় কর্মীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান

৪২। বাংলাদেশে নেতৃত্বের মূল সমস্যা কী?

ক, সততা, দেশপ্রেম ও প্রজ্ঞার অভাব √

খ. অর্থ ও বিষয়সম্পদের অভাব

গ. অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীলতা

ঘ. দেশের থেকে দলকে বড় করে দেখার মানসিকতা

৪৩। মীম-এর বাবা একজন এফ.আর. সি.এস. ডিগ্রিধারী চিকিৎসক। মীমের বাবার মধ্যে রয়েছে—

ক, বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব √

খ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব

গ, সম্মোহনী নেতৃত্ব

ঘ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব

৪৪। কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং তার বক্তব্য ও কর্মের দ্বারা পুরো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গদের মোহিত ও প্রভাবিত করেছিলেন। তার গুণকে বলা যাবে-

ক. সর্বাত্মকবাদী নেতৃত্ব

খ, একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্ব

গ, সম্মোহনী নেতৃত্ব √

ঘ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব

৪৫। ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রের মাধুর্য ও তেজস্বিতা তাকে অন্যান্য যে কোনো নেতার চেয়ে পৃথক করেছিল। তার মধ্যে যে গুণটি ছিল–

ক, ব্যক্তিত্ব √

খ, দৈহিক সুস্থতা

গ, শিক্ষা

ঘ. দৈহিক সৌন্দর্য্য

৪৬। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ফেলা উচিত । কারণ এর মাধ্যমে রক্ষা পায়—

ক, জাতীয় আদর্শ ও মর্যাদা √

খ, জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতা

গ, জাতীয় সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব

ঘ, জাতীয় স্বার্থ ও ঐক্য

৪৭। পৃথিবীর কোন দেশে শুধুমাত্র নেতা সর্বস্ব ও শহরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল লক্ষ করা যায়?

ক, যুক্তরাজ্য

খ. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

গ. বাংলাদেশ √

ঘ, ভারত

৪৮। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে বড় সমালোচনা কোনটি?

ক. অর্থের অভাব

খ. বড় দলগুলোর বাধা ও হুমকি

গ নির্দিষ্ট সময়ে দলীয় সম্মেলন করে নেতা নির্বাচনে ব্যর্থতা √

ঘ. ক্ষমতাসীন নেতাদের যে কোন উপায়ে দলীয় কর্তৃত্ব আঁকড়ে থাকার মানসিকতা

৪৯। নেতাকে সব ধরনের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন দেয় কে?

ক. পেশাজীবী সম্প্রদায়

খ. সরকারি আমলা গ

.সাধারণ জনগণ

ঘ. রাজনৈতিক দল √

৫০ । নেতার কোন ধরনের গুণের অভাবে জাতি বিভ্রান্ত হতে বাধ্য?

ক. আত্মসংযম

খ. দায়িত্ববোধ

গ, দূরদর্শিতা √

ঘ. সদাচরণ

বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫১। রাজনৈতিক দলকে আধুনিক গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয়। কারণ গণতন্ত্রের—

i. মূলভিত্তি রাজনৈতিক দল

ii. চালিকা শক্তি রাজনৈতিক দল

iii. মূল লক্ষ্য রাজনৈতিক দল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক, i √

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i. ii ও iii

৫২। যখন কিছু সংখ্যক মানুষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিষয়ে একমত পোষণ করে এবং সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন কী সৃষ্টি হয়?

i, সামাজিক সংগঠন বা দল

ii, রাজনৈতিক সংগঠন বা দল

iii. আন্তর্জাতিক সংগঠন বা দল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. Ii

গ. i ও ii √

ঘ. i, ii ও iii

৫৩। সম্মোহনী নেতৃত্বের অধিকারী হলেন–

i. মহাত্মা গান্ধী

ii. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

iii. শেখ হাসিনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও iii

খ. i ও ii √

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৫৪। নেতার চরিত্রে সততা ও দৃঢ়তা প্রয়োজন। এর ফলে জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়—

i, শৃঙ্খলাবোধ

ii. আনুগত্য

iii. শ্রদ্ধা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i, ii ও iii √

খ. ii

গ. iii

ঘ. i

৫৫। রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, কেননা তা-

i, জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়

ii. জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে

iii. জাতীয় স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ, ii ও iii √

ঘ. 1, ii ও iii

৫৬। উপদলকে স্বার্থান্বেষী দল বলা হয়। কেননা উপদলের নিকট গৌণ হলো—

i, দলীয় নীতি

ii, দলীয় কর্মসূচি

iii ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i, ii ও iii

৫৭। গণতন্ত্রে বিরোধী দল গঠনমূলক সমালোচনা করে কেন?

i, জনমত সংগ্রহের জন্য

ii. নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় যাবার জন্য

iii. ভয়-ভীতির কারণে

সূচিপত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i, ii ও iii

ঘ. i ও ii √

৫৮। নেতৃত্ব বলতে কোনাে ব্যক্তির সেই গুণাবলিকে বোঝায় যা-

i, অন্যকে প্রভাবিত করে

ii. অন্যকে পরিচালিত করে

iii. অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii √

৫৯। একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্র বিরোধী। কেননা এখানে মেনে নিতে হয়—

i একমাত্র আদর্শকে

ii. এক নেতার নেতৃত্বকে

iii. একমাত্র দলকে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii √

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬০ ও ৬১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

৬০। এ উক্তিটি দ্বারা কোন বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে?

ক. নেতৃত্বের সততা

খ, নেতৃত্বের মানসিকতা √

গ, নেতৃত্বের দক্ষতা

ঘ, নেতৃত্বের যোগ্যতা

৬১। উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির অভাব হলে—

i, দুনীতি বৃদ্ধি পায়

ii. দেশপ্রেম বৃদ্ধি পায়

iii. দলীয়করণ ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i ও iii √

খ. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আধুনিক গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনকার্য সম্পন্ন হয় দলীয় ভিত্তিতে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে দ্বি-দলীয় এবং বহুদলীয় উভয় ব্যবস্থাই দেখা যায়। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে কয়েকটি দল নিয়ে রাজনৈতিক জোট গঠনের প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন

ক. এডমান্ড বার্ক প্রদত্ত রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা লেখ ।

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কী?

গ. রাজনৈতিক দল এবং উপদলের মধ্যে তুমি কীভাবে পার্থক্য নির্দেশ করবে

ঘ, ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে

২. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অধ্যাপক আকলিমা আর রাজনৈতিক দল সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় বলছিলেন যে, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো রাজনৈতিক দল। তৃষা নামের একজন ছাত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলো, জাতীয় সংসদে শুধুমাত্র মহিলাদের বা নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে কেন? মিমতি নামে একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করলো, বাংলাদেশে তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কী না এ নিয়ে এত বিরোধ কেন?

প্রশ্ন

ক. বাংলাদেশে কোন ধরনের দল ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে?

খ. উপদল কী?

গ, জাতীয় সংসদে কেন মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে? তৃষার এ প্রশ্নের উত্তর দাও।

ঘ, বাংলাদেশে এ মুহূর্তে তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে নাকি হবে না—এ নিয়ে এত বিরোধ কেন চলছে?' মিমতির এ প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ কর।

৩. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মীর রফিকুল ইসলাম পৌরনীতি ক্লাসে রাজনৈতিক দল বিষয়ে পড়াতে গিয়ে বললেন যে, বর্তমান সময়ে সমাজের বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-পেশার মানুষের স্বার্থ একত্রীকরণে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম। রাপা নামের এক ছাত্র জিজ্ঞেস করলো, স্যার, রাজনৈতিক দল ও উপদলের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু অধ্যাপক সাহেব উভয়ের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরলেন। তিনি বললেন যে, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের ওপর।

প্রশ্ন

ক. রাজনৈতিক দল কাকে বলে?

খ. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বুঝ?

গ. রাজনৈতিক দল ও উপদলের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু?

ঘ. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের ওপর'—উক্তিটির যথার্থ নির্ণয় কর ।

৪. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বিজলী ও কাজলী দুই বোন। দুজন দুই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করে। তাদের প্রতিবেশী আব্দুল জলিল সাহেব একজন শিক্ষক। তিনি রাজনীতি না করলেও রাজনীতি সচেতন মানুষ। তিনি বিজলী ও কাজলীকে বোঝালেন যে, তোমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসে পার্থক্য থাকতেই পারে। তবে এজন্য ঝগড়া করবে কেন? পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ থাকবে কেন? মনে রাখবে, সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের প্রাণ।

প্রশ্ন

ক. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে কী মনে করা হয়?

খ, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলতে কী বুঝ?

গ. বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ মুহূর্তে যে পারস্পরিক দ্বন্দু ও অবিশ্বাস তার সাথে বিজলী ও কাজলীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

ঘ, সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের প্রাণ–আব্দুল জলিল সাহেবের এই উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

৫. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। অতিদ্রুত একটি সংবিধান প্রণয়ন করে এদেশে গণতান্ত্রিক শাসন উপহার দিয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশে বিকশিত হয়েছে বহুদলীয় ব্যবস্থা।

প্রশ্ন

ক, জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে আমাদের দেশের এমন কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নাম লেখ ।

খ. অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলের নামসহ বাংলাদেশের দুটি বড় রাজনৈতিক জোটের নাম লেখ ।

গ, একদলীয় ও দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

ঘ. নেতার কথায় ও কাজে মিল থাকবে –উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর।

৬. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মনসুর, মাহতাব ও মমতাজ তিন ভাই। রাজনীতির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। মনসুর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদলে একদলীয় ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। মাহতাব দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। মমতাজের পছন্দ বহুদলীয় ব্যবস্থা। তবে তারা তিনজনই একমত যে, সব ধরনের শাসন ব্যবস্থাতেই রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন

ক. বাংলাদেশে কী ধরনের দলব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে?

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজের ধরন বা প্রকৃতি কীরূপ?

গ, উদ্দীপকে বর্ণিত একদলীয়, দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

সূচিপত্র

ঘ. মনসুর, মাহতার এবং মমতাজ কেন মনে করে যে, সব ধরনের শাসন ব্যবস্থাতেই রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্লেষণ কর।

৭. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শামীম জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে খুবই সচেতন। নির্বাচন এলেই সে সব দলের নির্বাচনী ইস্তেহার' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। সে জানে যে, বাংলাদেশে শতাধিক রাজনৈতিক দলের নাম শোনা গেলেও এর মধ্যে মাত্র ৪/৫টি রাজনৈতিক দলের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কার্যক্রম রয়েছে, বাকি দলগুলো নামসর্বস্ব এসব দলের মধ্যে জাতীয় সংহতি প্রশ্নে ঐকমত্যও নেই। শামীমের বন্ধু হাসান এজন্যই বলে যে, বাংলাদেশের জন্য বহু-দলীয় ব্যবস্থার চেয়ে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাই উত্তম।

প্রশ্ন

ক. একদলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বুঝ?

খ. জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কীরূপ?

গ. বাংলাদেশের বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রতি শামীম ও হাসান দুই বন্ধুই কেন আস্থা রাখতে পারছে না? উদ্দীপকের আলোকে লেখ ।

ঘ. তুমিও কী হাসানের মতে মনে কর যে, বাংলাদেশের জন্য বহুদলীয় ব্যবস্থার চেয়ে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাই উত্তম? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৮. উদ্দীপকটি পড়ে নিম্নের প্রশ্নগুলোর জবাব দাও।

পরশ, জেনি, জাফু, তিস্মি, দীপ্ত, সৌহার্দ্য, দিয়া এরা সকলেই রংপুর পুলিশ লাইন স্কুল ও কলেজে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে কৃষকদের উন্নতির জন্য কী কী অবদান রেখেছেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীকে কেন গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় এবং আন্দোলন-সংগ্রামে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অবদান কতটুকু, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্ব আমাদেরকে কীভাবে পৃথিবীর বুকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে—এসব কিছুই অধ্যাপক কাজল চৌধুরী তাদেরকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেন।

প্রশ্ন ঃ

ক. নেতৃত্ব কী?

খ. এল. ডব্লিউ গুল্ডনার ও কিম্বল ইয়ং প্রদত্ত নেতৃত্বের সংজ্ঞা লেখ।

গ. উদ্দীপকের আলোকে নেতৃত্বের গুরুত্ব উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। ।

ঘ, স্বাধীনতা অর্জনের পর অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও কেন বাংলাদেশে সুযোগ্য নেতৃত্ব পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি? এজন্য কী কী কারণকে তুমি দায়ী মনে কর?

৯. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ভুরুঙ্গামারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক মোঃ শমসের আলী ছাত্রদেরকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে, কখন স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করলেন, কীভাবে তা চট্টগ্রাম কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত হয় তা তিনি ক্লাসে বুঝিয়ে বলছিলেন।

প্রশ্ন

ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক কে?

খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়?

গ. তোমার মতে নেতৃত্বের আবশ্যকীয় কী কী গুণ বঙ্গবন্ধুর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়?

ঘ. সুশাসনের সাথে নেতৃত্বের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ'--উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর।

১০. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নাভিদ হাসান ও নাশহীদ হাসানকে ওদের দাদু মাঝে মাঝেই গল্প শোনান। তিনি নেলসন ম্যান্ডেলা, আব্রাহাম লিংকন, লেনিন, মাও সেতুং, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা ভাসানী, শেরে বাংলা ফজলুল হক প্রমুখ নেতাদের জীবন ও কর্ম বর্ণনা করেন। এর ফলে ওদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও দেশপ্রেম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্ন

ক. কোন নেতার নেতৃত্বে বাঙালি জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করে?

খ. নেতৃত্বের ৩টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

গ, নাভিদ হাসান ও নাশহীদ হাসানের দাদু যেসব নেতার নাম উল্লেখ করেছেন তারা কোন সময়ে, কোন দেশ বা জাতির নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন?

ঘ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সম্মোহনী নেতা—উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর ।

[এ অধ্যায়ের প্রশ্ন-সংকেত]

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দল কী বা কাকে বলে?

২। রাজনৈতিক দলের একটি সংজ্ঞা দাও।

৩ । এডমান্ড বার্ক প্রদত্ত রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞাটি লেখ ।

৪ । আর্নেস্ট বার্কার প্রদত্ত রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞাটি লেখ ।

৫। অধ্যাপক ম্যাকাইভার প্রদত্ত রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞাটি লেখ ।

৬। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বুঝ?

৭। রাজনৈতিক জোট বলতে কী বুঝ?

৮। বাংলাদেশে কী ধরনের দলব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে?

৯। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে এমন রাজনৈতিক দলগুলোর নাম লেখ।

১০। বর্তমান সময়ে গণতান্ত্রিক শাসনের অপর নাম কী?

১১। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে কী মনে করা হয়?

১২। বর্তমান বিশ্বে কোন শাসন ব্যবস্থায় একদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে?

১৩। মূলত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে এমন দুটি দেশের নাম লেখ।

১৪। এইচ, ও ভানেল প্রদত্ত নেতৃত্বের সংজ্ঞা দাও।

১৫। এলভিন ডব্লিউ গুল্ডনার প্রদত্ত নেতৃত্বের সংজ্ঞা দাও।

১৬। কিম্বল ইয়ং প্রদত্ত নেতৃত্বের সংজ্ঞা দাও।

১৭। সি. আই. বার্নার্ড প্রদত্ত নেতৃত্বের সংজ্ঞা দাও।

১৮। নেতার গুণাবলিকে কী বলে?

১৯। বিশ্বের ৫ জন সম্মোহনী নেতার নাম লেখ ।

২০। বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র অভ্যুদয়ে কয়েকজন নেতার নাম লেখ ।

২১। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলা হয় কাকে?

২২। কোন নেতার নেতৃত্বে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

২। রাজনৈতিক দলের শ্রেণিবিভাগ কর।

৩। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বুঝ?

৪। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজের ধরন বা প্রকৃতি কীরূপ?

৫। রাজনৈতিক দলকে কি শ্রেণিযন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা যায়?

৬। উপদল বলতে কী বুঝ?

৭। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কতটুকু?

৮। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলতে কী বুঝ?

৯। সরকার গঠনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কতটুকু?

১০। স্বার্থ একত্রীকরণে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কতটুকু?

১১। রাজনৈতিক দল কীভাবে জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে?

১২। জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কতটুকু?

১৩। বাংলাদেশের কয়েকটি রাজনৈতিক জোটের নাম লেখ ।

১৪। একদলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বুঝ?

১৫। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বুঝ?

১৬। বহুদলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বুঝ?

১৭। নেতৃত্বের একটি সংজ্ঞা দাও।

১৮। নেতৃত্ব বলতে তুমি কী বুঝ?

১৯। নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

২০। নেতৃত্ব কত প্রকার ও কী কী?

২১। নেতৃত্বের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা বলতে কী বুঝ?

২২। নেতৃত্বের আইনগত বৈধতা কতটুকু?

২৩। নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক কী?

২৪। সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কী বুঝ?

২৫। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে এরূপ রাজনৈতিক দলগুলোর নাম লেখ ।

২৬। মন্ত্রিসভা গঠিত হয় কীভাবে?

প্রয়োগ দক্ষতামূলক প্রশ্ন

সূচিপত্র

১। রাজনৈতিক দল, কুচক্র দল বা উপদলের মধ্যে তুমি কী কী পার্থক্য দেখতে পাও?

২। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

৩। রাজনৈতিক দল বর্তমানে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে-ব্যাখ্যা কর।

৪ । একদলীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চরিত্রগতভাবে অগণতান্ত্রিক-ব্যাখ্যা কর।

৫ । ছকের সাহায্যে রাজনৈতিক দলের রূপ বা শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

৬। একদলীয় ব্যবস্থার দোষগুলো কী?

৭। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার গুণগুলো কী?

৮। বহুদলীয় ব্যবস্থার গুণগুলো কী?

৯। বহুদলীয় ব্যবস্থার দোষগুলো কী?

১০। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জোট গঠন প্রবণতা কেন বেড়েই চলছে –তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি পেশ কর ।

১১। সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম–ব্যাখ্যা কর।

১২। সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে নেতৃত্বের কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়?

১৩। তোমার মতে নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণাবলি কী কী হওয়া উচিত?

১৪। সুযোগ্য নেতার সাথে তার অনুসারী ও জনগণের সম্পর্ক খুবই গভীর হয়—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

১৫। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক খুবই গভীর ও ঘনিষ্ঠ–ব্যাখ্যা কর।

১৬। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগ্য নেতা যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক হন—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

১৭। "যোগ্য নেতা হলেই সকলে যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক হন না।"–উক্তিটি পরীক্ষা কর।

১৮। সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রতি জনগণ অন্ধ আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠেন—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

১৯। 'নেতাকে অতীতের আলোকে বর্তমানের মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ করণীয় স্থির করতে হবে।– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

২০। নেতাকে ব্যক্তিত্বের গুণে একক ও অনন্য ভাবমূর্তির অধিকারী হতে হয়—ব্যাখ্যা কর।

চিন্তন দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো রাজনৈতিক দল'—উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২। শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রেণিভেদ থাকে না। কাজেই সেখানে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকার প্রশ্ন ওঠে না—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৩। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কী কী কাজ তুমি চিহ্নিত করতে পারবে?

৪ । দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে কোনটিকে তুমি বাংলাদেশের জন্য উপযোগী মনে কর? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৫। পৃথিবীর অনেক দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা নেই –উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৬ । সহনশীলতা না থাকলে গণতন্ত্র যেমন সফল হয় না, তেমনি রাজনৈতিক দলও সফল হয় না—উক্তিটি মূল্যায়ন কর ।

৭। পৃথিবীর অনেক দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এখনও সমস্যামুক্ত বা সুসংগঠিত হয়নি। এজন্য তুমি কী কী কারণকে দায়ী করবে?

৮। নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত নির্বাচন কমিশন—উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

৯। সৎ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের তিন মাস পূর্ব থেকে গণপ্রশাসনকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে স্থাপন করা উচিত—উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

১০। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনরায় প্রকাশের ক্ষেত্রে জনগণ সুযোগ্য নেতৃত্বের প্রতিই মূলত তাদের রায় প্রদান করে থাকেন—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১১। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে সুযোগ্য নেতৃত্বের ওপর'—উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

১২। নেতৃত্বের রাজনৈতিক বৈধতাও থাকতে হবে। দেশ ও জাতির দুঃসময়ে তিনি যে জনগণের পাশে দাড়িয়েছিলেন, যোগ্য নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন একথা যেন জনগণ বুঝতে পারেন—উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

সূচিপত্র

সপ্তম অধ্যায়

সরকার কাঠামো

STRUCTURE OF GOVERNMENT

সরকার হলো রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের সরকার পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। সরকার একটি বাস্তব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের মুখপাত্র। সংকীর্ণ অর্থে সরকার বলতে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সমন্বিত রূপকে বোঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সরকার বলতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমষ্টিকে বোঝায়। কেননা সরকার গঠিত হয় সকল নাগরিকের সম্মতিক্রমে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরকার পরিবর্তন করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা মূলত সরকারের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রভেদে সরকারের রূপ ও সংগঠন আলাদা হয়ে থাকে।

শিখন ফল ঃ এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১। বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রে সরকারের কাঠামো বর্ণনা করতে পারবে।

২। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন সভার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

৪ । বিচার বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

৫। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৬ । বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

৭। সরকারের অঙ্গসমূহের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৮। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ও ভারসাম্য নীতির গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে ।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দ (Key Words):

সরকার (Government), গণতন্ত্র (Democracy), প্রজাতন্ত্র (Republic), নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy), সংসদীয় সরকার (Parliamentary Govt.), রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার (Presidential Govt.) যুক্তরাষ্ট্র (Faderation), এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Govt.) আইনসভা (Legislature) শাসন বিভাগ (Executive), বিচার বিভাগ (Judiciary), ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ও ভারসাম্য নীতি (Theory of

Separation of Povers and checks and Balances) ।

৭.১ সরকার

Government

রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সরকার। রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বিধি-নিষেধসমূহ সরকারের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি এজন্যই বলেছেন যে, সরকার হলো রাষ্ট্রের মুখপাত্র' (A Government is a spokesman to the state) off of Argo assioso প্রতিষ্ঠান সংকীর্ণ অর্থে সরকার বলতে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বোঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সরকার গঠিত হয় সকল নাগরিকের সম্মতিক্রমে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরকার গঠন ও পরিবর্তন করে থাকে। রাষ্ট্রভেদে সরকারের রূপ, কাঠামো ও সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে।

৭.২ সরকারের শ্রেণিবিভাগ

Classification of Government

গ্রিক দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল দুটি নীতি বা ভিত্তি বা মাপকাঠির সাহায্যে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন, যথা- (ক) সংখ্যানীতি ও (খ) লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যনীতি। সংখ্যানীতি অনুযায়ী তিনি সরকারকে একজনের,

কয়েকজনের এবং অনেকের শাসন–এ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। উদ্দেশ্য নীতি অনুযায়ী তিনি সরকারকে আবার স্বাভাবিক ও বিকৃত—এই দুভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মতে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং পলিটি হলো স্বাভাবিক সরকার। অপরদিকে স্বৈরতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র বা কুলীনতন্ত্র এবং গণতন্ত্র বা জনতাতন্ত্র হলো বিকৃত সরকার। পলিটিকে তিনি উত্তম সরকার এবং জনতাতন্ত্রকে (গণতন্ত্রের বিকৃত রূপ) নিকৃষ্ট ও বিকৃত সরকার বলে অভিহিত করেছেন। নিম্নে ছকের সাহায্যে এরিস্টটলের এ শ্রেণিবিভাগ দেখানো যেতে পারে ঃ

সরকার

↓

সংখ্যা নীতি	উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নীতি	
শাসকের সংখ্যা	স্বাভাবিক	বিকৃত
একজনের শাসন (Rule by one)	রাজতন্ত্র (Monarchy)	স্বৈরতন্ত্র (Tyrany)
কয়েকজনের শাসন (Rule by a Few)	অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)	ধনিকতন্ত্র/কুলীনতন্ত্র (Oligarchy)
অনেকের শাসন (Rule by Many)	গণতন্ত্র (Polity)	জনতাতন্ত্র (Democracy)

পরবর্তীতে জ্যা জ্যাক রুশো, মন্টেস্কু, ম্যারিয়ট, লীকক, ম্যাকাইভার, এ্যালান আর বল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানিগণ সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। অধ্যাপক লীকক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণিবিভাগটি সহজ সরল প্রকৃতির। অধ্যাপক লীকক সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান ও ব্যবহারের ভিত্তিতে সরকারকে গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র এই দুভাগে বিভক্ত করা হয়। গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে জনগণের হাতে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে তা থাকে একব্যক্তি বা একনেতা বা এক দলের হাতে। বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র হলো সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা লাভের পদ্ধতি অনুসারে সরকারকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) এবং প্রজাতন্ত্র (Republic) এই দুভাগে বিভক্ত করা হয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা বা রানি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন উত্তরাধিকারসূত্রে। রাজা বা রানি নামমাত্র শাসক। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের হাতে। গ্রেটব্রিটেন, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রে এরূপ সরকার প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন রাষ্ট্রপ্রধান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা নির্বাচিত হন তখন তাকে প্রজাতন্ত্র বলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রচলিত রয়েছে।

আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকার দু রকমের হতে পারে, যেমন– সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত (Parliamentary or Cabinet Government) এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার (Presidential Government)। সংসদীয় সরকারে শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা গঠিত হয় আইন বিভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা। মন্ত্রিসভা অর্থাৎ শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে । এরূপ শাসন প্রচলিত রয়েছে গ্রেট ব্রিটেন বা যুক্তরাজ্য, জাপান, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের দ্বারা গঠিত হয় না এবং সাধারণত আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়াসহ অনেক রাষ্ট্রে এরূপ সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন নীতি অনুসারে সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal Government) এবং এককেন্দ্রিক (Unitary Government) of এই দু'রকম হতে পারে। এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত রয়েছে গ্রেট ব্রিটেন, বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রচলিত রয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, সুইজারল্যান্ড, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে। এককেন্দ্রিক সরকারে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সকল ক্ষমতা সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়।

গণতন্ত্র আধুনিক যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকারী গণতন্ত্রে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস জনগণ। কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে সামনে রেখে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবের মাধ্যমে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্রে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও এ সরকারের লক্ষ্য হলো সামাজিক কল্যাণ এবং সম্পদের সুষম বন্টন।

ছকের সাহায্যে লীককের শ্রেণিবিভাগ দেখানো যেতে পারে ঃ

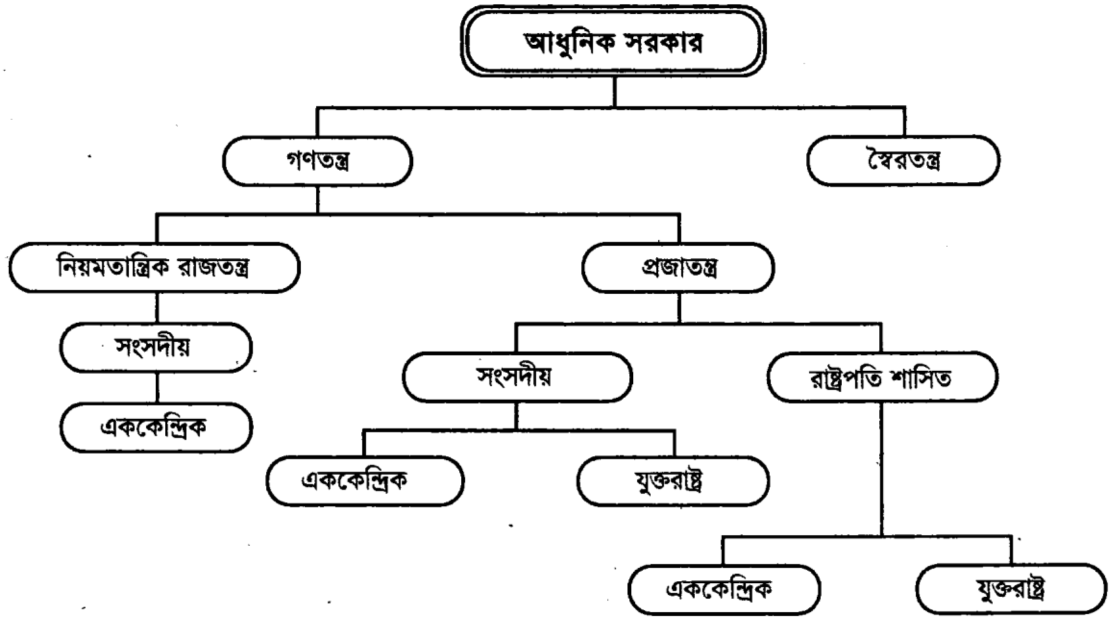

৭.৩ গণতন্ত্র

Democracy

সংজ্ঞা ও অর্থ (Definition and Meaning) ঃ গণতন্ত্র আধুনিক যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার। গণতন্ত্রে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস জনগণ। গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy, oil গ্রিক শব্দ Demos এবং Kratos বা Kratia থেকে উদ্ভূত। Demos অর্থ জনগণ এবং Kratos বা Kratia শব্দের অর্থ শাসন ক্ষমতা। সুতরাং শব্দগত অর্থে গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে জনগণের শাসন ক্ষমতা'।

গ্রিক ঐতিহাসিক **হিরোডোটাস** (Herodotus) বলেন, "গণতন্ত্র এমন এক প্রকার শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা আইনত কোনো শ্রেণি বা শ্রেণিসমূহের ওপর ন্যস্ত না থেকে সমাজের সকল সদস্যদের ওপর ন্যস্ত থাকে।"

স্যার জন সীলি (Sir John Seely) বলেন, "গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকার যেখানে সকলেরই অংশগ্রহনের সুযোগ আছে।" (Democracy is a government in which everyone has a share.) বার্কারের মতে, "গণতন্ত্র হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত সরকার।" (Democracy is a system of government by discussion.)

অধ্যাপক ডাইসি (Prof. Dicey) বলেন, "গণতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসকগণ তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ।" (Democracy is a form of government in which the governing body is a comparatively large fraction of the entire population.)

সি. এফ. স্ট্রং (C. F. Strong) বলেন, "শাসিত জনগণের সক্রিয় সম্মতির ওপর যে সরকার প্রতিষ্ঠিত, তাকে গণতন্ত্র বলে।" (Democracy implies that government which shall reston active consent of the governed.)

গণতন্ত্র সম্পর্কে **প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের** (Abraham Lincoln) সংজ্ঞা খুবই জনপ্রিয়। তার মতে, "গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের কল্যাণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা।” (Democracy is a government of the people, by the people and for the people.)

অধ্যাপক ম্যাকাইভার (Prof. McIver)-এর মতে, “গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অন্য কারো দ্বারা শাসন পরিচালনার পদ্ধতি নয়, বরং কে বা কারা শাসন করবে এবং মোটামুটিভাবে কোন উদ্দেশ্যে শাসন করবে তা নির্ধারণ করার উপায়স্বরূপ ” (Democracy is not a way of governing, whether by way of majority or otherwise, but primarily a way of determining who shall govern and broadly, to what ends.) অনেক চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রকে শুধু শাসনব্যবস্থা' বা সরকার ব্যবস্থা না বলে বরং সমাজব্যবস্থা বলেও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং গণতন্ত্র বলতে এমন এক শাসনব্যবস্থা বা সমাজব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ, সরকার গঠন ও তা পরিচালনা করতে পারে। তবে আধুনিক গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা।

৭.৪ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Democracy

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. জনগণের সম্মতি ঃ গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ সরকার গঠন বা পরিবর্তন করতে পারে।

২. বহু দল ব্যবস্থা ঃ গণতান্ত্রিক সরকারে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে। দলপ্রথা আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রয়োজনীয় দিক ।

৩. স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ঃ গণতন্ত্র জনগণের জীবন ও সম্পদ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ করে। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করা হয়। এ জন্যই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। এর অভাবে গণতন্ত্র জনতাতন্ত্রে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৪. নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঃ গণতন্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন করা যায়। গণতন্ত্রে সরকার গঠন বা পরিবর্তন করা হয় নির্বাচনের মাধ্যমে।

৫. আইনের শাসন ঃ গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আইনের শাসন। আইনের চোখে সকলেই সমান, কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে আইনের অনুশাসন মেনে চলতে হয়। আইনের নিয়ম ব্যতীত কাউকে বন্দী বা আটক রাখা যাবে না বা শাস্তি দেয়া যাবে না।

৬. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঃ স্বাধীন সংবাদপত্র বা 'ফ্রি প্রেস' গণতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সংবাদপত্রের স্বাধীন ভূমিকা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্র জনগণ ও সরকার উভয়কে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলে ।

৭. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ঃ গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়।

৮. দায়িত্বশীল সরকার : গণতন্ত্র দায়িত্বশীল শাসন। গণতান্ত্রিক সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করে বা দায়ী থাকে।

৭.৫ গণতন্ত্রের প্রকারভেদ

Types of Democracy

গণতন্ত্র দু'প্রকার হতে পারে; যথা- (১) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) ও (২) পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র(Indirector Representative Democracy)।

সূচিপত্র

প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্রে নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রাচীন গ্রিসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র আয়তনে যেমন বিশাল, জনসংখ্যায়ও তেমনি বিপুল। সুতরাং প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রভিত্তিক প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমানে অচল। তবে সুইজারল্যান্ডের_পাচটি ক্যান্টন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ডস্থিত কয়েকটি শহরে এখনোও প্রত্যক্ষগণতন্ত্রের আংশিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

আধুনিক গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র । আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে সরকার - গঠিত হয়। অর্থাৎ নাগরিকগণ পরোক্ষভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করে রাষ্ট্রশাসনে অংশগ্রহণ করে থাকে।

৭.৬ পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

Methods of Direct Democracy in Indirect Democracy

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র হচ্ছে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ও সরকার যেন সবসময়ই জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে এজন্য পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রেও প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কার্যকর হতে দেখা যায়। এ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে– (১) গণনির্দেশ, (২) গণউদ্যোগ, (৩) পদচ্যুতি এবং (৪) গণভোট । এ পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. গণনির্দেশ (Referendum) ঃ সাংবিধানিক আইন বা সাধারণ আইন সংক্রান্ত কোনো পরিবর্তন বা ংশোধনের জন্য জনমত গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। একে বলা হয় গণনির্দেশ। সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের কোনো আইন পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য গণনির্দেশ অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া সুইডেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে গণ-নির্দেশের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের (USSR) প্রেসিডিয়াম যে কোনো অঙ্গরাজ্যের অনুরোধক্রমে যেকোনো বিষয়ে গণনির্দেশনার ব্যবস্থা করতে পারত।

২. গণউদ্যোগ (Initiative) ঃ আইন প্রণয়ন বা আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে জনসাধারণ যে উদ্যোগ গ্রহণ করে তাকে গণউদ্যোগ বলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে উনিশটি অঙ্গরাজ্যে এবং সুইজারল্যান্ডে এ ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।

৩, পদচ্যুতি (Recali) ঃ মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে জনপ্রতিনিধিকে আস্থাভঙ্গ কিংবা গণবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য অভিযুক্ত করার মাধ্যমে অপসারণ করার পদ্ধতিকে পদচ্যুতি বলে। দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে পদচ্যুতির নিয়ম প্রচলিত রয়েছে।

৪. গণভোট বা জনমত নির্ধারণ (Plebiscite) ঃ সাধারণত যখন কোনো রাজনৈতিক বিষয় নির্ধারণের জন্য কিংবা সংবিধান সংক্রান্ত বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের জন্য ভোট গ্রহণ করা হয় তখন তাকে জনমত নির্ধারণ বা কোনো কোনো সময় 'গণভোটও বলা হয়ে থাকে। ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালে আসামের সিলেট ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা সেজন্য গণভোট হয়েছিল। বাংলাদেশে ১৯৭৭ সালের ৩০ মে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান গণভোট করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তার প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাই করা। ১৯৮৫ সালে জেনারেল এরশাদও এরূপ গণভোট করেন। বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইনে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিবেন কিনা এ জন্য ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

৭.৭ গণতন্ত্রের গুণ

Merits of Democracy

গণতন্ত্রের গুণ নিম্নরূপ ঃ –

১. রাষ্ট্র পরিচালনায় সকলের অংশগ্রহণ ঃ গণতন্ত্র বিশ্বাস করে যে, যা সকলকে স্পর্শ করে তা সকলের দ্বারা নির্ধারিত হবে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এ অংশগ্রহণকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান ও নিশ্চিত করা হয়।

২. বিশেষ ব্যক্তিগত মর্যাদার অনুপস্থিতি ঃ গণতন্ত্রে ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, সাধারণ-অভিজাত সকল মানুষ এক ও অভিন্ন। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়, বা কেউ বিশেষ সুবিধার অধিকারী নয়। বংশমর্যাদা অথবা ধনসম্পদের জন্য কাউকে বিশেষ মর্যাদা গণতন্ত্রে দেয়া হয় না।

৩. সাম্য ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ ঃ গণতন্ত্র সাম্য ও স্বাধীনতার মতো মহান আদর্শে বিশ্বাসী। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, সকল মানুষই সমান –গণতন্ত্র এই মহান আদর্শকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালায়। গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করে।

৪. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ গণতন্ত্র আইনের শাসনকে সমুন্নত রাখে। কোনো ব্যক্তিকে বিনা কারণে শাস্তি দেয়া যাবে না এবং বিনা বিচারে আটক রাখা যাবে না। আইনের চোখে সকল মানুষ সমান।

৫. জবাবদিহিতা বা দায়িত্বশীলতা : গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন সরকার তাদের কাজের জন্য আইনগত এবং নৈতিকভাবে জনগণের নিকট দায়ী থাকে। সরকারকে তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

৬. রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ঃ গণতন্ত্র জনগণকে রাজনৈতিক দিক থেকে শিক্ষিত এবং অধিকার ও দায়িত্ব সচেতন করে তোলে। গণতন্ত্রে জনগণ নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়। গণতন্ত্র রাজনৈতিক শিক্ষার পীঠস্থান।

৭. বিপ্লবের আশঙ্কা হ্রাস ঃ গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকায় বিপ্লব বা রক্তারক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রয়োজন হয় না। কেননা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীকে বিনা রক্তপাতে ক্ষমতা থেকে বিদায় করা যায় বা পছন্দনীয় দল ও ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসানো যায়।

৮. সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবনের সহায়ক ঃ গণতন্ত্র সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবন গঠনে সহায়ক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন কাজে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে বলে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সবাই অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উপকৃত হয়। জনগণ নিজেরাই নিজেদের জন্য সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

৯. ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ ঃ গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন। গণতান্ত্রিক শাসনে জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। ফলে জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ ঘটে।

১০. ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ ঃ জনগণের সচেতনতা এবং সাংবিধানিক বিধি-নিষেধের জন্য গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে না। কেননা স্বেচ্ছাচারী হলে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে সরকারকে নির্বাচনে পরাজয় বরণ করতে হয়।

১১. জাতীয় চরিত্র ও নৈতিক মানের উন্নতি ঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে। অধিকার ভোগ করার পাশাপাশি জনগণ নানাবিধ কর্তব্য পালন করে থাকে। গণতন্ত্রে জনগণ ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সমষ্টির স্বার্থ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়। ফলে জনগণের জাতীয় চরিত্র ও নৈতিক মানের উন্নতি ঘটে।

১২. দেশপ্রেম বৃদ্ধিতে সহায়ক ঃ গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের জন্য, জনগণ দ্বারা নির্বাচিত ও পরিচালিত সরকার। গণতন্ত্রে জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সরকার তাদের নিজেদের সরকার'— এই অনুভূতি থেকে জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম সৃষ্টি হয়।

১৩. জনসম্মতি ভিত্তিক ঃ গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয় জনগণের সম্মতিক্রমে। জনসমর্থন হারালে নির্বাচনে সরকারকে পরাজিত হতে হয়। সুতরাং গণতন্ত্র হচ্ছে জনসম্মতিভিত্তিক শাসনব্যবস্থা।

১৪. নমনীয় শাসনব্যবস্থা ঃ গণতন্ত্র নমনীয় শাসনব্যবস্থা। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শাসক বদল করা যায়। গণতন্ত্রে শাসকগণ পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে পারে।

১৫. সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক: বার্কারের মতে, "গণতন্ত্র হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত সরকার।" আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হয় বলে এরূপ সরকার জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল বিষয়ে উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়।

১৬. সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা ঃ বর্তমান সময়ের সকল প্রকার শাসনের মধ্যে গণতন্ত্রই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা। কেননা একমাত্র গণতন্ত্রেই শাসক নির্বাচিত হন জনগণের দ্বারা এবং শাসকরা দায়ী থাকেন জনগণের নিকট । একমাত্র গণতন্ত্রেই শাসক ও শাসিত জনগণের স্বার্থকে এক ও অভিন্ন করে তোলে। অধ্যাপক মিল এজন্যই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকারকে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন।

১৭. সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ ঃ গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হলেও সংখ্যালঘুরা শাসনব্যবস্থার সমালোচনার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে থাকে। সংখ্যালঘুরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৭.৮ গণতন্ত্রের দোষ

Demerits of Democracy

গণতন্ত্রের দোষ বা ত্রুটিগুলো নিম্নরূপঃ

১. জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়ক নয় ঃ গণতন্ত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পের প্রসার ঘটে না। শিল্প সাহিত্য বিকাশের জন্য যেরূপ জ্ঞানী শাসকের প্রয়োজন তা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সাধারণত মিলে না। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে না।

২. জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের অসহযোগিতা ঃ গণতন্ত্রে বুলি-সর্বস্ব ব্যক্তিরা জনগণকে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসার সুযোগ পায়। শিক্ষিত ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি অনেক সময় এসব মিথ্যার বেসাতি ও ডামাডোলের মধ্যে নিজেদেরকে জড়াতে চান না। এর ফলে দেশ বঞ্চিত হয় দক্ষ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সেবা থেকে।

৩. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সম্ভব নয় ঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেননা গণতন্ত্রে যখন-তখন সরকারের পতন ঘটতে পারে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

৪. অপচয়ের প্রশ্রয় ঃ গণতন্ত্রে জাতীয় সম্পদের অপচয় হয়। কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়, অনেক সময় দেখা যায় তার ফল মোটেই সন্তোষজনক নয়। সরকার পরিবর্তিত হলে নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের অর্ধসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে অনীহা প্রকাশ করে।

৫. স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না ঃ গণতন্ত্র সাম্য, স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের কথা বললেও বাস্তবে স্বাধীনতা হয় বিপন্ন। আইনের শাসনের বদলে জোরের শাসন, পেশির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, ভোটের ব্যালট বাক্স ছিনতাই হয়, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে দেয়া হয় না। ফলে ধনী তথা পেশিসর্বস্ব প্রভাবশালীরাই নির্বাচিত হন। এজন্য লেকি বলেন যে, "গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠতর প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান করে না, অধিকতর স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানও করে না।" গণতন্ত্রে যথার্থ আইনের শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয় না।

৬. মূর্খ, অক্ষম ও অজ্ঞের শাসন ঃ গণতন্ত্র হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। গণতন্ত্রে গুণ নয় বরং সংখ্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এমিল ফ্যাগুয়ে বলেন, "গণতন্ত্র অক্ষমতার শাসন প্রণালি (The cult of Incompetence)। লেকির মতে, "গণতন্ত্র হচ্ছে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, অজ্ঞ ও অকর্মণ্য ব্যক্তির সরকার। কারণ এ শ্রেণির লোকই সর্বাধিক ।" কার্লাইল উপহাসচ্ছলে গণতন্ত্রকে তাই নির্বোধের রাজত্ব বলে অভিহিত করেছেন।

৭. দলপ্রথার কুফল ঃ আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র হচ্ছে দলীয় শাসন। রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, ভুল বোঝাবুঝি, অনৈক্য প্রভৃতির ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়।

৮. গণতন্ত্র ক্ষণভঙ্গুর শাসনব্যবস্থা ঃ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলাদলির জন্য জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং সরকারের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। গণতন্ত্রে অনেক সময় জনমত বিভ্রান্ত হয়। মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে একটি দল সহজেই ক্ষমতায় আসতে পারে।

সূচিপত্র

৯. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম ঃ গণতন্ত্র হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত শাসন। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্ব হয়। জরুরি প্রয়োজনের সময় গণতান্ত্রিক সরকার তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয় না।

১০. উন্নত শিল্পকর্ম ব্যাহত হয় ঃ গণতন্ত্রে উন্নত শিল্পকর্ম ব্যাহত হয়। স্যার হেনরি মেইন বলেন, গণতন্ত্র সাহিত্য-বিজ্ঞান বা সুকুমার কলার তেমন কদর করে না। অজ্ঞ ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত এই শাসনব্যবস্থা চারুকলা ও শিল্প চাতুর্যের বিষয় তেমন একটা বোঝে না। অজ্ঞ ও সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত গণতান্ত্রিক শাসনামলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলার প্রসার বা বৃদ্ধির জন্য কোনো প্রকার সক্রিয় সহযোগিতা ও উৎসাহ তারা দেখায় না।

১১. স্বজনীতি ও দুর্নীতি ঃ বেশির ভাগ অল্পশিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার ভার থাকে। এরা স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত থাকে। স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি গণতান্ত্রিক সরকারকে তাই পঙ্গু করে তোলে। অর্থলিলুতায় তারা আপাদমস্তক লিপ্ত থাকে।

৭.৯ গণতন্ত্রের সফলতার শর্ত

Conditions for the Success of Democracy

গণতন্ত্র জনপ্রিয় ও উত্তম শাসনব্যবস্থা। কিন্তু গণতন্ত্রকে কার্যকর ও সফল করতে হলে নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করতে হয় ঃ

১. ব্যাপক শিক্ষা ঃ গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে চাই ব্যাপক শিক্ষার প্রচলন। জন স্টুয়ার্ট মিল এজন্যই বলেছেন যে, "universal education must precede universal suffrage" অর্থাৎ "সর্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হরে।" শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন, আত্মমর্যাদাবান, কর্তব্যনিষ্ঠ ও অধিকার সচেতন করে তোলে। এর ফলে গণতন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সরকারে পরিণত হয়।

২. অর্থনৈতিক সাম্য ঃ সমাজে সকলের আর্থিক সমতা বিধান করতে না পারলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে নালাস্কির মতে, "অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত গণতন্ত্র সফল হতে পারে না।" রবসন-এর মতে, "গণতন্ত্র বলতে নূনতম মৌলিক আর্থিক কল্যাণকে বোঝায়; কারণ অভুক্ত, গৃহহীন, রোগাক্রান্ত ও বস্ত্রহীনদের নিকট রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন।" অভাবগ্রস্ত মানুষকে অনেক সময় ভ্রান্তপথে পরিচালনা করা যায়। এজন্য অর্থনৈতিক সাম্য গণতন্ত্রের সফলতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বলে বিবেচিত হয়।

৩. সামাজিক সাম্য ঃ গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে জাতি ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, নারী-পুরুষ দলমত নির্বিশেষে সকলকে যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সামাজিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। সামাজিক সাম্য মানুষকে যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে তোলে।

৪. সহনশীলতা ঃ সহনশীলতা বা পরমতসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের প্রাণ। অপরের বা অন্য দলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। অন্য ব্যক্তি ও দলকে মত প্রকাশের সুযোগ প্রদান করতে হবে। সহনশীল মনোভাব না থাকলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। যে সমাজের জনগণ যত বেশি সহনশীল সে সমাজ তত বেশি গণতান্ত্রিক।

৫. ভ্রাতৃত্ববোধ ঃ গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ। জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ না থাকলে তারা একে অপরের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা বুঝতে পারবে না। অথচ গণতন্ত্রের লক্ষ্যই হলো সর্বজনীন কল্যাণ।

৬. গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ঃ অপরের মত ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, অপরকে মতামত ও বিশ্বাস প্রকাশের সুযোগ প্রদান, সময়মত নির্বাচন অনুষ্ঠান, জনগণের সম্মতি বা ম্যান্ডেট না পেলে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া, আইনসভায় বা আলোচনার টেবিলে বসে সমস্যার সমাধান খোজা—এগুলো হচ্ছে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসন সফল হয় না। তবে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য একদিনে গড়ে ওঠে না।

৭. যথার্থ আইনের শাসন ঃ যথার্থ আইনের অনুশাসন গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আইনের চোখে সকলেই সমান। সকলেরই আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার থাকতে হবে। আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ক্ষমতাসীন সরকার প্রতিহিংসাবশত কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করতে পারে না।

৮. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার জন্য বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে বিচারকগণ যেন ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এজন্য শাসন ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গড়ে তুলতে হবে।

৯. দক্ষ ও সৎ নেতৃত্ব ঃ দক্ষ, সৎ ও সুনিপুণ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে গণতন্ত্র সফল হয়। সমাজ বা রাষ্ট্রের সমস্যা কী কী এবং কোন পথে এসব সমস্যার সমাধান আসতে পারে সে সম্পর্কে নেতাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি থাকতে হবে। অদক্ষ ও অসৎ নেতৃত্ব দ্বারা গণতন্ত্র কোনোদিনই হতে পারে না।

১০. ত্যাগের মনোভাব ঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রয়োজনবোধে জনগণকে যে-কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। গণতন্ত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সমষ্টির স্বার্থের কথা ভাবতে হবে।

১১. সুষ্ঠু জনমত ঃ গণতান্ত্রিক শাসন জনমতের ওপর নির্ভরশীল। নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ক্ষমতাসীন সরকার সবসময় জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। সুষ্ঠ জনমত গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। এজন্য জনমত গঠনের মাধ্যমগুলোকে মুক্ত ও স্বাধীন রাখতে হবে। রেডিও, টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে।

১২. সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল ঃ আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রে সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল জনমত গঠন করে ক্ষমতাসীন হয়। আবার ক্ষমতাসীন দল যেন জনস্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত না হতে পারে সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখে।

১৩. মৌলিক অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা ঃ গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন। জনগণ যেন তাদের মৌলিক অধিকারগুলো উপভোগ করতে পারে সে জন্য তা সংবিধানে সন্নিবেশিত হতে হবে। এর ফলে সরকার বা কোনো শক্তি এ সমস্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বিচার বিভাগ এগুলো রক্ষায় সচেষ্ট হবে।

১৪. জনগণের সজাগ দৃষ্টি ঃ জনগণ যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন না হন এবং গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত না হন তাহলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে জনগণের সক্রিয় সতর্কতা বা সজাগ দৃষ্টির ওপর।

১৫. জনগণের আস্থা অর্জন: গণতন্ত্র জনগণের শাসন। গণতান্ত্রিক সরকারকে তাই এমনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয় যেন তা জনগণের কল্যাণ সাধন করতে পারে। যে সরকার জনগণের কল্যাণ সাধন করতে পারে সে শাসকের প্রতি শাসিত জনগণের আস্থার সৃষ্টি হয়। জনগণের আস্থা ও সন্তুষ্টির উপরই গণতান্ত্রিক শাসনের সাফল্য নির্ভর করে।

১৬. সরকারি কর্মচারীদের জনহিতকর মানসিকতা ঃ গণতন্ত্রে জনগণ সবসময় প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যবস্থায় । অংশগ্রহণ করেন না। জনপ্রতিনিধিদের রচিত আইন ও নীতিকে আমলা বা প্রশাসকরাই বাস্তবে রূপ দান করেন। এ জন্যই প্রশাসকদের আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা পরিত্যাগ করে জনহিতকর মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। আমলা প্রশাসকরা হবেন জনগণের সেবক ।

১৭. রাজনৈতিক সমাধানে বিশ্বাস ঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে গণতান্ত্রিক রীতি-কাঠামো ও ঐতিহ্যকে ঠিক রেখেই সমস্যা দেখা দিলেই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তার সমাধান খুঁজতে হবে। যখন-তখন সামরিক শাসন জারি বা অগণতান্ত্রিক কোনো উপায় অবলম্বন করে সমস্যা সমাধানের অশুভ প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক । সমস্যার সমাধান হতে হবে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে।

১৮. মুক্ত ও স্বাধীন প্রচার মাধ্যম ঃ গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এ জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যমসমূহ অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র প্রভৃতিকে মতামত প্রকাশের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এগুলোকে স্বাধীন বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

১৯. জবাবদিহিতা বা দায়িত্বশীলতা : গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রশাসনিক জবাবদিহিক নীতি কার্যকর করতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ও দায়িত্বশীল হতে হবে। সরকার তার কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।

২০. বহুদলীয় ব্যবস্থা ঃ গণতন্ত্রে অবশ্যই একাধিক রাজনৈতিক দল থাকতে হবে। কেননা বহুদলীয় ব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করা যায় না। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন অসংখ্য নামসর্বস্ব দল আবার না গড়ে ওঠে।

২১. লিখিত সংবিধান ঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লিখিত সংবিধান থাকলে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রশাসন সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। শাসনব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায়। লেকী এ জন্যই বলেছেন যে, 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে লিখিত সংবিধান থাকা প্রয়োজন।

২২. সংখ্যালঘুর অধিকার ঃ গণতন্ত্র হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। কাজেই লক্ষ রাখতে হবে গণতন্ত্র যেন সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারতন্ত্রে পরিণত না হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ বা অধিকার যেন বিঘ্নিত না হয়। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) গণতন্ত্রের সফলতার জন্য তিনটি শর্তের উল্লেখ করেছেন। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. গণতন্ত্রকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তবায়নের জন্য যথার্থভাবে যোগ্য হতে হবে ।

২. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করার জন্য সংগ্রামী মনোভাবের অধিকারী হতে হবে।

৩. জনগণকে নাগরিক সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে এবং নাগরিক অধিকার রক্ষা করার জন্য সদা সতর্ক থাকতে হবে।

৭.১০ প্রজাতন্ত্র

The Republic

যে শাসনব্যবস্থা বা সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন, তাকে প্রজাতন্ত্র' বলে। প্রজাতান্ত্রিক সরকার গণতান্ত্রিক সরকারেরই একটি রূপ। তবে সব প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি একইরূপ নয়। কোনো কোনো প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। এভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানগণ সাধারণত আইনসভার সদস্য নন। অতীতে বাংলাদেশে এভাবে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হতেন। তবে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর ফলে বর্তমানে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত হওয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জাতীয় সংসদ সদস্যদের ভোটে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিও পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। সে দেশের জনগণ প্রথমে একটি নির্বাচকমণ্ডলী বা নির্বাচক সংস্থাকে নির্বাচন করে। তারাই পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে।

রাজতন্ত্রের পতনের বা ক্রম বিলুপ্তির ফলে পৃথিবীতে এখন গণতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। পৃথিবীতে নামমাত্র কয়েকটি দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রকে কার্যকর করার চেষ্টা এখনও চালানো হচ্ছে। তবে এছাড়া পৃথিবীর বাদবাকি সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

৭.১১ একনায়কতন্ত্র

Dictatorship

গণতন্ত্রের বিপরীতধর্মী শাসনব্যবস্থা হলো একনায়কতন্ত্র। একনায়কতন্ত্র হলো এমন একধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা একনায়কের হাতে কুক্ষিগত থাকে। একনায়কতন্ত্রে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ কঠোর হাতে দমন করা হয়। সংবাদপত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করা হয়। একনায়কের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা সহ্য করা হয় না। কোনো বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠতে দেয়া হয় না। অধ্যাপক

নিউম্যান (Newman) এর মতে, "একনায়কতন্ত্র বলতে আমরা এমন এক ধরনের শাসনকে বুঝি যেখানে এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা করায়ত্ত করেন এবং বাধাহীন ও একচেটিয়াভাবে তা প্রয়োগ করে থাকে" (By dictatorship we understand the rule of a person or group of persons who arrogate to themselves and monopolise power in the state, exercising it without restraint). A Dictionary of Political Thought' গ্রন্থে রজার স্ক্রুটন (Roger scruton) বলেছেন যে, "একনায়কতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকারব্যবস্থা যেখানে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, গোষ্ঠী বা দল সকল রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে এবং সকল নাগরিকের নিকট থেকে আনুগত্য আদায় করে।' (Dictatorship is a system of government in which one person, office, faction or party is empowered to dictate all political action and compel obedience from all other citizens- আধুনিক যুগে গণতন্ত্রের সমাধির উপর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্পেনে ফ্রাঙ্কো, জার্মানিতে হিটলার ও ইতালিতে মুসোলিনী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব দেশে সাধারণত সামরিক জান্তারা ক্ষমতা দখল করে একনায়কতন্ত্র কায়েম করে। একনায়কতন্ত্র "এক জাতি, এক দল ও এক নেতা"–এই নীতিতে বিশ্বাসী।

৭.১২ একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Dictatorship

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ –

১. এক ব্যক্তির শাসন ঃ একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত কর্তৃত্ব এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে। একনায়ক সমস্ত ক্ষমতার উৎস। একনায়ক তার কাজের জন্য কারো নিকট জবাবদিহি করেন না। একনায়ক ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে।

২. একদলীয় শাসন ঃ একনায়কতন্ত্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। সে দল হচ্ছে একনায়কের নিজস্ব দল। বিরোধী দল ও মতকে নির্মমভাবে দমন ও নির্মূল করা হয়।

৩. বল প্রয়োগ ঃ একনায়কগণ যুক্তির জোর অপেক্ষা জোরের যুক্তিতে বিশ্বাসী। একনায়কতান্ত্রিক সরকার

বলপ্রয়োগ করে সকল বিরোধী মত ও বক্তব্যকে নির্মমভাবে দমন করে। এজন্য একনায়কগণ বিশেষ বাহিনী বা গুপ্ত পুলিশ বাহিনী গঠন করে থাকে।

৪. ক্ষমতার অতিমাত্রায় কেন্দ্রীয়করণ ঃ একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বিশেষ করে একনায়কের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। একনায়কই সকল ক্ষমতার উৎস।

৫. প্রহসনমূলক আইনসভা ঃ একনায়কতন্ত্রের একটি প্রহসনমূলক আইনসভা থাকে। মূলত এই আইনসভা নামমাত্র। একনায়কের ইচ্ছার অনুকূলে আইন প্রণয়ন করা এবং সর্বক্ষেত্রে তাকে সমর্থন দান করাই এই আইনসভার একমাত্র লক্ষ্য ।

৬. প্রচারযন্ত্রের একচেটিয়া ব্যবহার ঃ একনায়কগণ রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্রকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রচারযন্ত্রের সব বিভাগে শুধু একনায়কের জয়গান গাওয়া হয়। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতিতে কড়াকড়িভাবে সেন্সরশীপ অর্থাৎ সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

৭. একক আদর্শবাদ ঃ একনায়কতন্ত্র বিশেষ কোনো একটি আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী হয়। একনায়ক যে আদর্শে বিশ্বাস করেন, সরকারি প্রচারযন্ত্রে শুধু তারই জয়গান গাওয়া হয়। এরূপ বিশ্বাস বা আদর্শের বিরোধীদেরকে নির্মমভাবে দমন ও নির্মূল করা হয়। ।

৮. সর্বাত্মকবাদী ঃ একনায়কতন্ত্র সর্বাত্মকবাদী শাসন। মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদের শ্লোগান ছিল "সব কিছুই রাষ্ট্রের মধ্যে, রাষ্ট্রের বাইরে কিছু নয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও কিছু থাকতে পারে না।" (All within the state, none outside the state, none against the state.) একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্র একটি সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি ও সমাজের সকল দিক রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

সূচিপত্র

৯. যুদ্ধবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ঃ একনায়কতন্ত্র যুদ্ধপ্রিয় এবং সাম্রাজ্যবাদী। একনায়কগণ শান্তিতে বিশ্বাস করেন না। তারা যুদ্ধকে অপরিহার্য মনে করতেন। মুসোলিনীর মতে, "নারীর নিকট মাতৃত্ব যেমন অপরিহার্য, পুরুষের নিকট যুদ্ধও তেমনি অপরিহার্য।" (War is to man what maternity is to woman.) একনায়কতন্ত্র যুদ্ধবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদের পথও প্রশস্ত হয়। মুসোলিনীর মতে, "সাম্রাজ্যবাদ জীবনের চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম।" (Eternal and immutable law of life.) হিটলার ও মুসোলিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রধানত দায়ী।

১০. শান্তি ও আন্তর্জাতিকতার বিরোধী ঃ একনায়কতন্ত্র আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করে না। শান্তি পছন্দ করে না । মুসোলিনী আন্তর্জাতিক শান্তিকে ভীরুর স্বপ্ন' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। বিশ্বশান্তির প্রতি হিটলারের ঘৃণা সর্বজনবিদিত ।

১১. উগ্র জাতীয়তাবাদী ঃ একনায়কতন্ত্র উগ্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। "এক জাতি, এক নেতা, এক দেশ –এটাই হলো একনায়কতন্ত্রের মূলমন্ত্র। হিটলার মনে করতেন "জামান জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ সুতরাং তাদের অধিকার রয়েছে পৃথিবীকে শাসন করার।"

১২. ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিরোধী ঃ একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী । একনায়কতন্ত্রের নীতি হলো "ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রের জন্যই ব্যক্তি"। ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিবর্তে একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি পূজা ও রাষ্ট্রের পূজাকে উৎসাহিত করে।

১৩. দায়িত্বহীনতা ঃ একনায়কতন্ত্রে দায়িত্বশীলতার কোনো স্থান নেই। সরকার জনগণের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য দাবি করে। কিন্তু জনগণের কাছে কোনোভাবে দায়ী থাকে না। সরকার গঠন অথবা সরকার অপসারণে জনগণ প্রকৃতপক্ষে কোনো সাংবিধানিক উপায় খুঁজে পায় না।

৭.১৩ একনায়কতন্ত্রের গুণ

Merits of Dictatorship

একনায়কতন্ত্রের গুণাবলি নিম্নরূপঃ

১. দ্রুত নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ঃ একনায়কতন্ত্র দ্রুত নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সাধারণত যেসব সমাজ বা রাষ্ট্র নানা কারণে অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলার শিকার, একনায়ক সেখানে তার সীমাহীন শক্তি দিয়ে শৃঙ্খলা বিধানে সমর্থ হয়।

২. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ঃ একনায়কতন্ত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে রাষ্ট্রকে দ্রুত উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম। অসীম ক্ষমতার অধিকারী একনায়কের কাজ বা পরিকল্পনায় কেউ বাধা দিতে পারে না বলেই এটা সম্ভব হয়।

৩. জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা ঃ যে জাতি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি নিয়ে একমত নয়, দল এবং উপদলে বিভক্ত, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত, রাষ্ট্রীয় সংহতির নিদারুণ অভাব, সেখানে একনায়ক জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

৪. অর্থের অপচয় হয় না ঃ একনায়কতন্ত্রে সংগঠনের সরলতা এবং সরকারের স্থায়িত্বের জন্য অর্থের অপচয় কম হবে ।

৫. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব ঃ একনায়কতন্ত্রে সরকার স্থায়ী হয়। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা
৬. জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম ঃ একনায়কতন্ত্র দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। এর ফলে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় একনায়কতন্ত্র সফল ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭১৪ একনায়কতন্ত্রের দোষ বা ত্রুটি

Demerits of Dictatorship

একনায়কতন্ত্রের ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপঃ

১. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার ঃ একনায়কতন্ত্র গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে। একনায়ক জনগণের সম্মতির কোনো তোয়াক্কা করে না। একনায়কের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এখানে সহনশীলতার কোনো স্থান নেই।

২. দায়িত্বশীলতার অভাব ঃ একনায়কতন্ত্রে সমস্ত ক্ষমতা নেতা ও দলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে জনগণের মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্ম নেয় না। জনগণ সুনাগরিকের গুণাবলির চর্চা ও অর্জনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

৩. প্রগতি বিরোধী ঃ একনায়কতন্ত্র প্রগতি বিরোধী। একনায়কতন্ত্র ভিন্ন মত ও আদর্শকে কঠোরভাবে দমন করে। নতুন ও প্রগতিশীল আদর্শকে একনায়ক সাধারণত সন্দেহের চোখে দেখে ।

৪. বিপ্লবের সম্ভাবনা ঃ একনায়কতন্ত্র বিপ্লবের আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। কেননা বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা থেকে বাধ্য হয়ে বিরত থাকায় গোপনভাবে তৎপরতা চালায় এবং জনগণকে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে। ফলে একনায়কতন্ত্রে বিপ্লবের সম্ভাবনা অধিক।

৫. দুর্নীতির প্রসার ঃ একনায়কতন্ত্র সীমাহীন দুর্নীতির জন্ম দেয়। কারও নিকট জবাবদিহি করতে হয় না বলে একনায়ক দুর্নীতিতে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাধা পড়ে। লর্ড এ্যাকটন এজন্যই বলেছেন যে, “সাধারণত ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং সীমাহীন ক্ষমতা মানুষকে সীমাহীন দুর্নীতিগ্রস্ত করে” (Power corrupts men and absolute power corrupts absolutely.) এ সম্বন্ধে প্রফেসর লাস্কির কথা আরও বেশি প্রণিধানযোগ্য। তার মতে, "Power has the habit of corrupting even the noblest of those who exercise it." (FSTSF এমনি অভ্যাস যে এমনকি মহান ব্যক্তিদেরকেও তা কলুষিত করে।”

৬. স্বৈরতন্ত্রের নামান্তর ঃ একনায়কতন্ত্র এক ব্যক্তি ও একদলের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। একনায়কগণ সংবিধান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। তারা খেয়াল খুশিমত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে থাকেন।

৭. সাম্য ও স্বাধীনতা বিরোধী ঃ একনায়কতন্ত্র সাম্যে বিশ্বাস করে না। স্বাধীনতার প্রতি একনায়কতন্ত্র শ্রদ্ধা পোষণ করে না। শাসকের পছন্দই একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তির যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি ।

৮. উগ্র বর্ণবাদী ও জাতীয়তাবাদী ঃ একনায়কতন্ত্র বর্ণবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। হিটলারের ইহুদি বিদ্বেষ এবং জার্মান জাতীয়তাবাদের উগ্র বিশ্বাসের কথা কে না জানে।

৯. যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী এবং আন্তর্জাতিকতা বিরোধী ঃ একনায়কতন্ত্র যুদ্ধবাদে ও সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাস করে। একনায়কতন্ত্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতায় বিশ্বাস করে না। এজন্যই একনায়কতন্ত্র বিশ্বশান্তির প্রতি হুমকিস্বরূপ।

১০. সর্বাত্মকবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিরোধী ঃ একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের বেদীমূলে বিসর্জন দেয়, এর ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না।

৭.১৫ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা

Comparative Study between Democracy and Dictatorship

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শাসন ব্যবস্থা। উভয়ের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপঃ

১. শাসকের সংখ্যা ঃ গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন; কিন্তু একনায়কতন্ত্র হচ্ছে এক ব্যক্তি বা এক দলের শাসন।

২. ক্ষমতার উৎস ঃ গণতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস জনগণ, কিন্তু একনায়কতন্ত্রের ক্ষমতার উৎস এক ব্যক্তি বা একটি দলীয় চক্র ।

৩. ব্যক্তির ভূমিকা ও স্থান ঃ গণতন্ত্রে ব্যক্তির প্রাধান্যই প্রবল একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রই চরম ও চূড়ান্ত । ব্যক্তির ভূমিকা সেখানে গৌণ।

৪. ব্যক্তিস্বাধীনতা ঃ গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী; অপরদিকে একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী । ব্যক্তিস্বাধীনতা গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। গণতন্ত্র আছে বলেই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা পায়। একনায়কতন্ত্র মুক্ত বুদ্ধি ও বিবেকের স্বাধীনতার বিরোধী।

৫. আইনসভার ক্ষমতা ও মর্যাদা ঃ গণতন্ত্রে আইনসভা সার্বভৌম; কিন্তু একনায়কতন্ত্রে আইনসভা একটি প্রহসনমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার নিকট শাসন বিভাগকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। আইনসভার দ্বারাই সরকার গঠিত হয় এবং আইনসভার আস্থা হারালে সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে আইনসভা নামমাত্র ক্ষমতার অধিকারী।

৬. শান্তি, যুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদ ঃ গণতন্ত্র শান্তিতে বিশ্বাসী; কিন্তু একনায়কতন্ত্র উগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধবাদে বিশ্বাসী। গণতন্ত্রের লক্ষ্য হলো মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা; কিন্তু একনায়কতন্ত্র উগ্র সমরবাদে বিশ্বাসী। একনায়ক হিটলার সব সময় বলতেন, যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই সর্বজনীন।" ইতালির একনায়ক বেনিতো মুসোলিনী বলতেন, "এককালীন শান্তি সম্ভবও নয়, সংগতও নয়।"

৭. সর্বাত্মকবাদ ঃ গণতন্ত্র সর্বাত্মকবাদকে ঘৃণা করে; কিন্তু একনায়কতন্ত্র সর্বাত্মকবাদ প্রশ্রয় দেয়। গণতন্ত্রে ব্যক্তিই মুখ্য, রাষ্ট্র গৌণ। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি গৌণ, রাষ্ট্রই মুখ্য। "সবকিছুই রাষ্ট্রের জন্য, কোনো কিছুই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা বাইরে নয়"-এরূপ চরম ও সর্বাত্মক ধারণাই একনায়কতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৮. দলের সংখ্যা ঃ গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান থাকে; কিন্তু একনায়কতন্ত্র হচ্ছে এক দলীয় শাসন। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা ও সংগঠন করার স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ায় গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এসব মৌলিক অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় বিরোধী দল গড়ে উঠতে পারে না।

৯. নেতৃত্ব ঃ গণতন্ত্র যৌথ নেতৃত্বে বিশ্বাসী; কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এক ব্যক্তির নেতৃত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এক নেতার নেতৃত্ব গড়ে তোলা হয়।

১০. প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা ঃ গণতন্ত্রে প্রচার মাধ্যমগুলো স্বাধীন ও মুক্ত থাকে। এগুলোর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ খুব অল্প পরিমাণই লক্ষ করা যায়। অপরদিকে একনায়কতন্ত্রে প্রচার মাধ্যমগুলো ওপর ক্ষমতাসীন সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১. সম্মতি ঃ গণতন্ত্র জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা; কিন্তু একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও কর্তৃত্ব। আলাপ-আলোচনা ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক পথে গণতান্ত্রিক সরকার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও কর্তৃত্বের বলে একনায়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা প্রয়োগ করে থাকেন। এ জন্যই অধ্যাপক হার্নশ' বলেন, "গণতন্ত্রে যুক্তির জোরকেই প্রাধান্য দেয়া হয়, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে জোরের বা শক্তির যুক্তিই প্রাধান্য লাভ করে "

১২. স্থায়িত্ব ঃ গণতন্ত্র স্থায়ী শাসনব্যবস্থা; কিন্তু একনায়কতন্ত্র অস্থায়ী শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক বা সরকারের পতন ঘটলেও শাসনব্যবস্থা ও সরকারব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে শাসক বা একনায়ক ক্ষমতাচ্যুত হলে একনায়কতান্ত্রিক শাসনেরও পতন ঘটে।

১৩. ব্যালট বনাম শক্তি ঃ গণতন্ত্রে ব্যালটকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়, কিন্তু একনায়কতন্ত্র পেশি শক্তিকে প্রাধান্য দেয়।

১৪. বিরোধী দলের অবস্থান ঃ গণতন্ত্রে সাফল্যের জন্য বিরোধীদলকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয় এবং বিরোধীদলের মতামতকে মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে বিরোধীদল ও তাদের মতামতকে বরদাস্ত করা হয় না।

১৫. মানবপ্রকৃতি ঃ গণতন্ত্র মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে আশাবাদী। একনায়কতন্ত্র মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে আশাবাদ পোষণ করে না ।

১৬. আইনের শাসন ঃ আইনের শাসন গণতন্ত্রের এক অপরিহার্য বিষয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। একনায়কতন্ত্রে আইনের সার্বভৌমত্ব অনুপস্থিত।

উপসংহার ঃ সুতরাং গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, একনায়কতন্ত্রের এমন কতগুলো দোষ-ত্রুটি রয়েছে যা একনায়কতন্ত্রের গুণগুলোকেও ম্লান করে দেয়। অপরদিকে

গণতন্ত্রের গুণগুলোর তুলনায় ক্রটিগুলো নেহায়েতই অকিঞ্চিৎকর ও গৌণ। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকলে এ ত্রুটিগুলোর প্রতিকার করা সম্ভব। নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রকে তাই সকল শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলা যায়।

৭.১৬ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

Parliamentary or Cabinet Form of Government and Presidential Form of Government

আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে দু ভাগে ভাগ করা হয়; যথাঃ (১) সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার এবং (২) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রচলিত রয়েছে গ্রেটব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত, বাংলাদেশ, জাপান প্রভৃতি দেশে। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। এছাড়া সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

৭.১৭ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার

Parliamentary or Cabinet Form of Government

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে, তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে। এ.ভি. ডাইসি (A v. Dicey)-এর মতে, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার গড়ে ওঠে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের একত্রীকরণের ভিত্তিতে এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।" অধ্যাপক গার্নারএর মতে, "সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা, যেখানে প্রকৃত শাসক বা মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন।” সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসনব্যবস্থায় একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সরকার পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা থাকে আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রিসভার হাতে। প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মন্ত্রিসভার নেতা, সংগঠক ও সরকারপ্রধান। অধ্যাপক গ্রেভাস (Prof. Greavas)-এর মতে সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার হলো রাষ্ট্রের প্রভু বা শাসক এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন ঐ সরকারের প্রভু বা প্রধান।”(In Parliamentary system, the government is the master of country and Prime Minister is the master of the government.) মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবে। আইনসভার অনাস্থা প্রকাশ পেলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য। মন্ত্রিগণ ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের নিকট জবাবদিহি করেন। শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা জনগণের প্রতিনিধিসভা অর্থাৎ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে বলে এই সরকারকে দায়িত্বশীল সরকারও (Responsible Government) বলা হয়ে থাকে। গ্রেটব্রিটেন, ভারত, বাংলাদেশ, জাপান, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকার প্রচলিত রয়েছে।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক

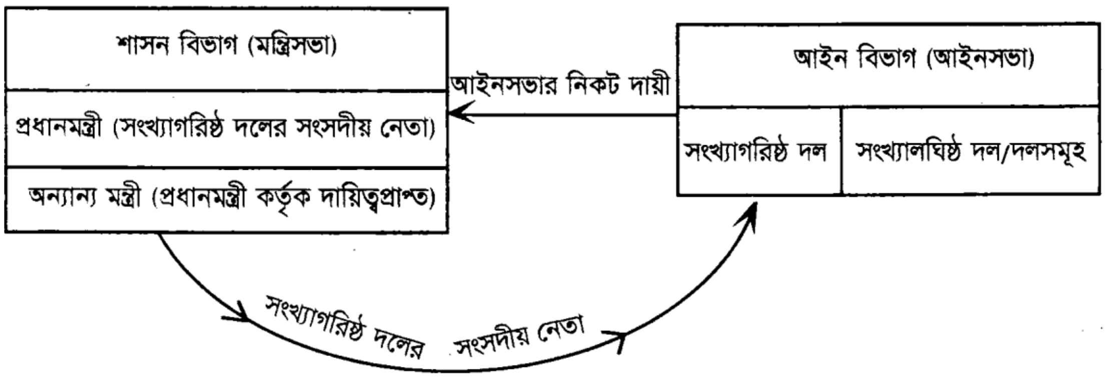

সূচিপত্র

৭.১৮ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Parliamentary Form of Government

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

১. সংসদের প্রাধান্য ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে সংসদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভা শাসন কাজের জন্য সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।

২. ক্ষমতার একত্রীকরণ ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় শাসন ও আইন বিভাগীয় ক্ষমতার একত্রীকরণ ঘটে। আইন পরিষদের একটি অংশ নিয়ে মন্ত্রিসভা বা শাসন বিভাগ গঠিত হয়। ফলে একই ব্যক্তির হাতে আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়।

৩. নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়মতান্ত্রিক শাসক। প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে। রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া সাধারণত কিছু করেন না।

৪. দায়িত্বশীল শাসন ঃ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে আইন পরিষদের নিকট দায়ী। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

৫. মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য ঃ সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য হতে হয়। কোনো মন্ত্রী আইনসভার সদস্য না হলে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হতে হয়।

৬. দলীয় শাসন ঃ সংসদীয় শাসনব্যবস্থা মূলত দলীয় শাসনব্যবস্থা। সংসদ বা আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সরকার গঠন করে। অন্য দলগুলো আইনসভায় বিরোধীদলের ভূমিকা পালন করে।

৭. প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ঃ সংসদীয় সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক। সরকার গঠিত হয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে ।

৮. নমনীয়তা ঃ সংসদীয় সরকার সাধারণত নমনীয় প্রকৃতির। কেননা সংসদে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় যে কোনো নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন বা পরিবর্তন এবং অনাস্থা এনে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়।

৭.১৯ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের গুণ

Merits of Cabinet Form of Government

১. শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকে। মন্ত্রিসভা অতি সহজে আইন পরিষদে আইন পাস করে নিতে পারে। কেননা মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য।

২. দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক। সরকার তাদের স্থায়িত্ব এবং কার্যকালের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। আইনসভার আস্থা হারালে সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। এ জন্য সংসদীয় সরকারকে দায়িত্বশীল সরকারও বলা হয়ে থাকে।

৩. নমনীয়তা ঃ সংসদীয় সরকার নমনীয়। কেননা প্রয়োজনবোধে যেকোনো সময়ে সাধারণ নির্বাচন ছাড়াও মন্ত্রিসভার পরিবর্তন করা যায়। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আইন ও সংবিধান পরিবর্তন করা যায়।

৪. মর্যাদাসম্পন্ন বিরোধী দল ঃ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে বিরোধীদলকে বিকল্প সরকার' বলে বিবেচনা করা হয়। বিরোধীদলও গঠনমূলক আলোচনা, সমালোচনা দ্বারা সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ তুলে ধরে। ।

৫. যৌথ নেতৃত্ব ঃ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় যৌথ নেতৃত্বের ধারণা বিকশিত হয়। মন্ত্রিসভা যৌথভাবে তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে ।

৬. নাগরিক সচেতনতা বিকাশে সাহায্য করে ঃ এই শাসনব্যবস্থায় জনগণ গভীর আগ্রহের সাথে আইনসভার অধিবেশনের খবরাখবর বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে পড়েন, শুনেন ও দেখেন। এর ফলে জনগণ নিজেদেরকে দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পায়।"

৭. সুষ্ঠু শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকায় এ সরকারব্যবস্থা সুষ্ঠু শাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

৮. স্বৈরাচার বিরোধী ঃ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় গৃহীত নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য শাসন বিভাগকে আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকতে হয়। এর ফলে শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী হতে পারে না।

৯. দ্রুত আইন প্রণয়ন ঃ এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য। প্রধানমন্ত্রী শুধু মন্ত্রিসভার নেতা নন আইনসভারও নেতা। ফলে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা অতি সহজে দ্রুত আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়।

১০. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বজায় রাখা যায় ঃ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বহাল রাখা যায়। গ্রেট ব্রিটেন ও জাপানসহ অনেক রাষ্ট্রে এটা সম্ভব হয়েছে।

৭•২০ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের ত্রুটি

Demerits of Cabinet Form of Government

সংসদীয় সরকারের ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপঃ

১. স্থিতিশীলতার অভাব ঃ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা যে-কোনো সময় অনাস্থা প্রস্তাব এনে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করতে পারে। ফলে সরকারের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।

২. জরুরি অবস্থায় অনুপযোগী ঃ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সকল সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার দীর্ঘ আলোচনার পর গৃহীত হয়। এজন্য সরকার জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য অনুপযোগী।

৩. দলাদলি ঃ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা অনেক সময় দলীয় স্বার্থই প্রাধান্য পায়। গঠনমূলক সমালোচনার পরিবর্তে বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা' নীতি বা দলাদলি প্রাধান্য পায় ।

৪. মন্ত্রিপরিষদের একনায়কত্ব ঃ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় দলীয় শৃঙ্খলার কারণে আইনসভার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বাস্তবে মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

৫. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অনুপস্থিতি ঃ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য। ফলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হয় না।

৬. অস্থিতিশীল যুক্তফ্রন্ট গঠনের ঝুঁকি ঃ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় অনেক সময় কোনো দলের পক্ষেই একক দলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয় না। তখন সমমনা কয়েকটি দলের উদ্যোগে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এরূপ 'কোয়ালিশন সরকার স্থিতিশীল হয় না।

৭. সদ্য স্বাধীন ও অনুন্নত দেশের জন্য অনুপযোগী ঃ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে যেখানে শিক্ষিত জনগণের সংখ্যা কম, সুনাগরিকের অভাব রয়েছে; জনগণ রাজনৈতিক দিক থেকে অসচেতন ও অসহিষ্ণু সংসদীয় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য নেই, সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল নেই; সেসব দেশে এ ধরনের সরকার সফল হবার সম্ভাবনা কম।

৭•২১ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

Presidential Form of Government

যেসব রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং তিনি সাধারণত আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন না–তখন তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে। অধ্যাপক জে. ডব্লিউ গার্নার (Prof. J.W. Garner) বলেন, "যে শাসনব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ তাদের কার্যকালের মেয়াদ এবং কার্যাবলির জন্য আইনসভার নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকে, তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে।" (Presidential form of government is a government in which the executive is independent of the legislature as regards its tenure and to a large extent as regards its policy and acts)

সূচিপত্র

অধ্যাপক এফ. আর. সিলি (Prof. F.R. Seeley)-এর মতে, "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির ইচ্ছায় পরিচালিত সরকার হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।" (The Presidential form of government is basically based on the will of the President elected by the people directly or indirectly in ademocracy.) ।

আর. এন. গিলক্রিস্ট (R.N. Gilchrist) বলেন, "রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার হলো ঐ সরকারব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত এবং রাষ্ট্রপতি তার কাজের জন্য আইন পরিষদের প্রভাবমুক্ত।" রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারপ্রধান। তাকে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকে। রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিমত মন্ত্রী নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, ব্রাজিল প্রভৃতি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রচলিত রয়েছে।

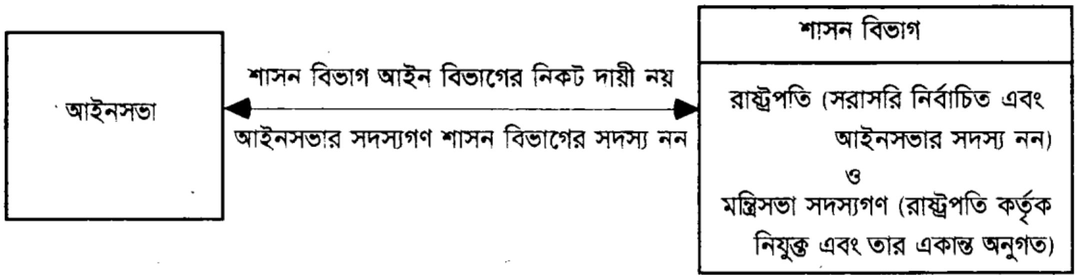

৭.২২ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Presidential Form of Government

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক ঃ এরূপ সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান নামে ও কাজে রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রকৃত শাসক। তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ায় বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হন।

২. আজ্ঞাবহ মন্ত্রিসভা ঃ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। মন্ত্রিগণ তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতি যে কোনো ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিয়োগ এবং যে কোনো মন্ত্রীকে যেকোনো সময় অপসারণ করতে পারেন ।

৩. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রপতি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি এবং তার মন্ত্রিসভা শাসন ক্ষমতা পরিচালনার জন্য সাধারণত আইনসভার নিকট দায়ী নন। শাসন বিভাগ আইনসভা ভেঙে দেয়ার অধিকার রাখে না। আইনসভা ও শাসন বিভাগ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে ।

৪. শাসন বিভাগ সাধারণত আইনসভার নিয়ন্ত্রণমুক্ত ঃ আইনসভা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে না। কেবল বিশেষ ব্যবস্থায় তাকে অভিশংসনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব। সাধারণভাবে তিনি আইনসভার নিকট দায়ী নন। আবার তিনি আইনসভাকেও ভেঙে দিতে পারেন না।

৫. সরকার স্থিতিশীল হয় ঃ এই সরকার ব্যবস্থায় সরকার স্থিতিশীল হয়। কেননা রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। অভিশংসন প্রস্তাব ছাড়া আইনসভা রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে না।

৬. বিচার বিভাগের প্রাধান্য ঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর থাকায় বিচার বিভাগের প্রাধান্য থাকে।

৭.২৩ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণ

Merits of Presidential Form of Government

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণসমূহ নিম্নরূপঃ

১. দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার দ্রুত, কার্যকর ও জোরালো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কেননা এ সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আইনসভার মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয় না।

২. স্থায়িত্ব ঃ এ সরকার তুলনামূলকভাবে স্থায়ী। যখন-তখন সরকার পরিবর্তনের মতো দুরবস্থার শিকারে পরিণত হতে হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নির্বিঘ্নে ও নিরুপদ্রবে সরকার পরিচালনা করেন।

৩. অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী ঃ যেসব অনুন্নত দেশে সুষ্ঠু দ্বিদলীয় ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি সেসব দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও কার্যকর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

৪. আইনসভার প্রভাবমুক্ত শাসন বিভাগ ঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রিগণ সংসদ সদস্যদের চাপমুক্ত থাকে। এর ফলে তারা নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে সরকারের নিয়ম-নীতি প্রয়োগ করতে পারে।

৫. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সুফল ভোগ ঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফলে শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। এর ফলে জনগণ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে।

৬. জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় উপযোগী ঃ আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত হবার ফলে যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক সংকট ও জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় রাষ্ট্রপতি এককভাবে এবং অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারেন।

৭. বহুদলীয় ব্যবস্থায় উপযোগী ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থায় যখন এককভাবে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে । পারে না তখন 'কোয়ালিশন সরকার' গঠন করতে বাধ্য হয়। কোয়ালিশন সরকার দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার গঠিত হলে সরকার স্থায়ী ও শক্তিশালী হয়।

৮. দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটে ঃ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের মন্ত্রীপদে নিয়োগদান করতে পারেন, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে তার উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দান করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাকে আইনসভার বা দলীয় সিদ্ধান্তের বা সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে হয় না। ফলে দেশ দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সেবা ও সহযোগিতা পায়।

৯. দলীয় মনোভাব প্রশমিত হয় ঃ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি নিজের পছন্দমত মন্ত্রী নিয়োগ করেন। মন্ত্রিগণ আইনসভার পরিবর্তে সরাসরি রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। আইন পরিষদের আস্থা-অনাস্থার ওপর শাসন বিভাগকে তাই নির্ভরশীল থাকতে হয় না। এর ফলে রাষ্ট্রপরিচালনায় দলীয় মনোভাব অনেকটা প্রশমিত হয়।

৭.২৪ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের দোষ

Demerits of Presidential Form of Government

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের দোষগুলো নিম্নরূপঃ –

১. শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব ঃ সরকারের প্রতিটি বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় শাসন ও আইন বিভাগ পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন। ফলে সরকার পরিচালনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। জরুরি অবস্থায় এই অচলাবস্থা দেশকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়।

২. বিপজ্জনক ঃ রাষ্ট্রপতিকে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে একমাত্র অভিশংসন প্রস্তাব উত্থাপন ও কার্যকর করা ছাড়া । ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব নয়। জরুরি প্রয়োজনে সরকার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও তা সম্ভব হয় না। ফলে এ সরকার বিপজ্জনক ।

৩. অনমনীয়তা ঃ এ সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি অযোগ্য প্রমাণিত হলেও তাকে সহজে পরিবর্তন সম্ভব নয়। কেননা রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। অনমনীয়তার জন্য এ সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তিত অবস্থার সাথে অনেক সময় তাল মিলিয়ে চলতে পারে না ।

৪. স্বেচ্ছাচারী শাসন ঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় সমস্ত শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত হওয়ায় তিনি অনেক সময় একনায়কে পরিণত হতে পারেন। আইনসভার নিকট দায়ী নন বলে রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন।

সূচিপত্র

৫. সরকার দায়িত্বহীন হয় ঃ রাষ্ট্রপতি তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। ফলে এই সরকার দায়িত্বহীন হতে পারে।

৬. আইন প্রণয়নে অসুবিধা ঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য না হওয়ায় সরাসরি আইন উত্থাপন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাদের নির্ভর করতে হয় আইন পরিষদে দলীয় সদস্যদের ওপর। কোনো কোনো সময় এমন আইন পাস করা হয় যা হয়ত মন্ত্রীরা চান না, অথবা রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীরা যে আইন প্রণয়ন করতে চান আইনসভার সদস্যগণ তা চান না।

৭. আইন প্রণয়নে নেতৃত্বের অভাব ঃ রাষ্ট্রপতি ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। এর ফলে আইন প্রণয়নে তারা নেতৃত্ব প্রদান করতে পারেন না। আইন প্রণয়নে নেতৃত্বের অভাবে দ্রুত ও ফলপ্রসূ আইন প্রণীত হয় না ।

৭.২৫ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

Comparative Discussion of the Cabinet and Presidential Form of Government

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার গণতান্ত্রিক সরকার হলেও উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যসমূহ লক্ষ করা যায় ঃ

১. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। একজন রাষ্ট্রপ্রধানের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করেন, অপর জন সরকার পরিচালনা করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারপ্রধান। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে যিনি রাষ্ট্রপ্রধান, তিনিই সরকারপ্রধান। রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক।

২. মন্ত্রীদের মর্যাদা ও ক্ষমতা ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী এবং বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ কর্মচারীমাত্র।

৩. মন্ত্রীদের আইনসভার সদস্য হওয়া ঃ সংসদীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য হতে হয়। আইনসভার সদস্য নন এমন ব্যক্তি মন্ত্রী হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তাকে আইনসভার সদস্য হতে হয়। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে মন্ত্রিগণ সাধারণত আইনসভার সদস্য নন।

৪. আইন প্রণয়নে সরাসরি ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিসভা শাসিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য। তারা সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী আইনসভার বা সংসদের নেতা। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য নন। তারা সরাসরি আইন প্রণয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না ।

৫. পদচ্যুতি প্রসঙ্গে ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে আইনসভা যে কোনো সময় অনাস্থা প্রস্তাব এনে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তার সন্তুষ্টির ওপর ক্ষমতায় থাকেন। এক্ষেত্রে আইনসভা মন্ত্রীদের পদচ্যুত করতে পারেন না। মন্ত্রীরা পদচ্যুত হন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক।

৬. আইনসভার সার্বভৌমত্ব ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের আইনসভা সার্বভৌম। আইনসভা ইচ্ছা করলে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে সরকারকে অপসারণ করতে পারে। আইনসভা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়। আইনসভা সংবিধান নির্দিষ্ট পথে বিশেষ অভিযোগ উত্থাপন ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন ও অপসারণ করতে পারে না। রাষ্ট্রপতির হাতে ভেটো ক্ষমতা

সূচিপত্র

৭. আইনসভার নিকট জবাবদিহিতা ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা তাদের সকল নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ সাধারণত আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।

৮. আইনসভা ভেঙে দেবার ক্ষেত্রে ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী আইনসভা ভেঙে দেবার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। তার পরামর্শ রাষ্ট্রপ্রধান উপেক্ষা করেন না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি আইনসভা ভেঙে দিতে পারেন না।

৯. স্থায়িত্বের প্রশ্নে ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের স্থায়িত্ব কম। কেননা আইন পরিষদের আস্থার ওপর তাদের ক্ষমতার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের স্থায়িত্ব অনেক বেশি। নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে একমাত্র অভিশংসন পদ্ধতি ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায় না। অভিশংসন পদ্ধতিও জটিল ।

১০. জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনা। কেননা আইনসভায় এবং মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক বিলম্ব হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এরূপ পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

১১. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হয় না। কেননা আইন বিভাগের সদস্যগণ শাসন বিভাগেরও সদস্য। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হতে দেখা যায়। কেননা শাসন বিভাগের সদস্যগণ সাধারণত আইনসভার সদস্য নন। ।

১২. নমনীয়তা ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও সংবিধান নমনীয়। কেননা প্রয়োজনবোধে সংবিধানের ধারা, উপধারা, সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত এমনকি সরকারকে যেকোনো আইনসভার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে সংবিধান কিংবা সরকার পরিবর্তন করতে হলে সংবিধান নির্দিষ্ট বিশেষ জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

৭.২৬ এককেন্দ্রিক সরকার

Unitary Form of Government

এককেন্দ্রিক সরকার বলতে এমন এক ধরনের সরকারকে বোঝায় যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকে। এখানে প্রাদেশিক সরকার বা অঙ্গরাজ্য সরকার থাকতে পারে, কিন্তু এই সরকারগুলো কোনো স্বাধীন ক্ষমতা ভোগ করে না। আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার ক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো সাংবিধানিক স্বাধীনতা ভোগ করে না। গোটা দেশ একটি কেন্দ্র থেকে শাসিত হয় বলে এ ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ, জাপান, ইতালি প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত রয়েছে।

অধ্যাপক ডাইসি (Prof. Dicey)-এর মতে "এককেন্দ্রিকতা হচ্ছে একটি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত আইন বিভাগীয় ক্ষমতার স্বাভাবিক ব্যবহার।" (Unitarism is the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power.)

অধ্যাপক গেটেল (Prof. Gette)-এর মতে, "এককেন্দ্রিক সরকার হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সংবিধান রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা জাতীয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করে।" (Unitary government is a system in which the constitution of the state delegates all government powers to the national government.)

সূচিপত্র

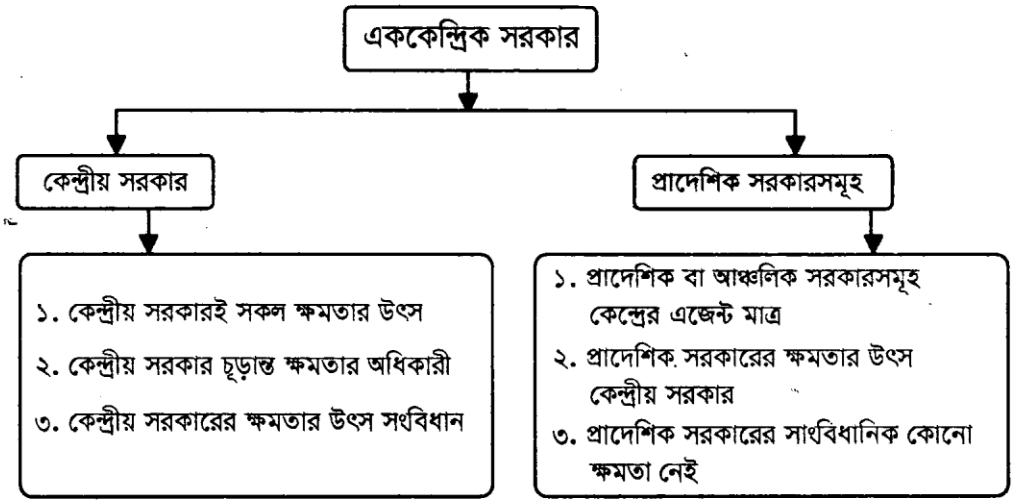

৭.২৭ এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Unitary Form of Government

এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ .

১. একক আনুগত্য ঃ এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ শুধু কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে।

২. কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ঃ এককেন্দ্রিক সরকারে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত। প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকার থাকলেও তা ক্ষমতা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল।

৩. কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে ক্ষমতা বন্টন ঃ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার খেয়াল-খুশিমত প্রদেশে বা অঞ্চলগুলোর ক্ষমতা কমাতে বা বাড়াতে পারে।

৪. প্রদেশগুলো কেন্দ্রের এজেন্ট মাত্র ঃ এককেন্দ্রিক সরকারে প্রদেশগুলো কেন্দ্রের এজেন্ট' হিসেবে কাজ করে। প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে।

৫. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অভাব ঃ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রদেশগুলো বা অঞ্চলগুলো স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে না। কেননা কেন্দ্রীয় সরকার ওদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

৬. সুপরিবর্তনীয় সংবিধান ঃ এককেন্দ্রিক সরকারে সংবিধান সাধারণত সুপরিবর্তনীয় হয়। সংবিধান সংশোধনের

৭.২৮ এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ

Merits of Unitary Form of Government

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণাবলি নিম্নরূপঃ

১. নমনীয় ঃ এককেন্দ্রিক শাসন ব্যববস্থা নমনীয়। কেননা কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম ।

২. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব ঃ এককেন্দ্রিক সরকারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয় বলে বলিষ্ঠ ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব।

৩. অপচয় রোধ ঃ এই শাসনব্যবস্থা সরকারি খরচের অপচয় রোধ করে। এককেন্দ্রিক সরকার সহজ-সরল রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলে। ফলে অপচয় রোধ হয়।

৪. ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে উপযোগী ঃ অপেক্ষাকৃত ছোট বা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে এই শাসনব্যবস্থা উপযোগী।

৫. রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা ঃ কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী বলে রাষ্ট্রীয় ঐক্য সৃষ্টি করা সহজ হয়। জনগণ আঞ্চলিক আনুগত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় না।

৬. সুষ্ঠু শাসনের নিশ্চয়তা ঃ এই শাসনব্যবস্থা সাংবিধানিক সংকট ও প্রশাসনিক জটিলতা থেকে মুক্ত। ফলে সুষ্ঠ শাসন পরিচালনা নিশ্চিত হয়।

৭. জাতীয় সংহতি ঃ এই শাসনব্যবস্থায় দ্বিনাগরিকত্বের অবকাশ নেই বলে সুসংহত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এতে জাতীয় সংহতি জোরদার হয় এবং জনগণ গভীর ভ্রাতৃত্ব ও একতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

৮. সহজ-সরল গঠন প্রকৃতি ঃ এককেন্দ্রিক সরকারের গঠন পদ্ধতি সহজ, সরল। একটি মাত্র সরকার এবং একক আনুগত্য থাকায় ক্ষমতা বন্টন সংক্রান্ত জটিলতা থাকে না।

৭.২৯ এককেন্দ্রিক সরকারের ত্রুটি বা দোষ

Demerits of Unitary Form of Government

এককেন্দ্রিক সরকারের ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপঃ

১. স্বায়ত্তশাসন বিরোধী ঃ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকে। স্থানীয় উদ্যোগের অভাবে স্থানীয় সমস্যাবলি যথাযথভাবে চিহ্নিত বা সমাধা হয় না। সুতরাং এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসন বিরোধী ।

২. স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা ঃ এককেন্দ্রিক সরকারে সমস্ত ক্ষমতা এক কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয় বলে এখানে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

৩. আমলাদের দৌরাত্ম্য ঃ এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ অত্যধিক হয়। সরকার আমলাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে আমলাদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়।

৪. আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা ঃ আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা না থাকায় স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তার সমাধান হয় না।

৫. স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ হয় না ঃ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে স্থানীয় পর্যায়ে বা আঞ্চলিক পর্যায়ে রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ অনেকটা সীমিত। ফলে স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে জনগণের মধ্যে নেতৃত্বও বিকশিত হয় না।

৬. সমস্যা সমাধানে অসুবিধা ঃ কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারের ওপর স্থানীয় অনেক দায়িত্ব হস্তান্তর করে অপেক্ষাকৃত গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন জাতীয় ও জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে। কিন্তু এককেন্দ্রিক সরকারে তা সম্ভব নয়।

৭. বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য অনুপযোগী ঃ রাষ্ট্র যদি আয়তনে বিরাট এবং জনসংখ্যায় বিপুল হয়, যদি সে রাষ্ট্রে বহু ধর্ম, বর্ণ ভাষাভাষির হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা উপযোগী নয়।

৮. কেন্দ্রের কাজের চাপ বৃদ্ধি ঃ একটিমাত্র কেন্দ্রে সরকারের কাজকর্ম চলতে থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ বৃদ্ধি পায়।

৯. বিপ্লবের সম্ভাবনা ঃ এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রদেশগুলোর সরকার কেন্দ্রের এজেন্টমাত্র। এখানে প্রদেশগুলোর স্বায়ত্তশাসন থাকে না। এর ফলে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন বা বিপ্লবের ==াবনা থাকে।

৭.৩০ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

Federal Form of Government

অর্থ ও সংজ্ঞা ঃ ইংরেজি Federation শব্দের বাংলা হলো যুক্তরাষ্ট্র। ফেডারেশন’ শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ফোয়েডাস’ Foedus) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ সন্ধি’ বা মিলন । সুতরাং শব্দগত অর্থে, কতিপয় রাষ্ট্রের

সন্ধি বা মিলনের ফলে যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। যখন কতিপয় স্বাধীন রাষ্ট্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন না থেকে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে একটি সাধারণ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠন করে তখন তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয়। কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকার নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সাংবিধানিক প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ওপর সংবিধান ব্যাখ্যা করার চরম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে।

অধ্যাপক এইচ. ফাইনারের (Prof. H. Finer) মতে, "যখন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ আঞ্চলিক ক্ষেত্রে অর্পিত হয় এবং অন্যান্য অংশ ঐ সমস্ত আঞ্চলিক সংঘের মধ্যকার কেন্দ্রীয় সংস্থায় অর্পিত থাকে, তখন তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে।"

অধ্যাপক ডাইসির (Prof. Dicey) মতে, "যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে জাতীয় ঐক্যের সাথে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের অধিকারের সমন্বয় সাধনের রাজনৈতিক কৌশল।" (A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of states rights.)

অধ্যাপক কে. সি হোয়েরের (Prof. K. C. Wheare) মতে, "যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি বলতে আমি বুঝি ক্ষমতা বন্টনের এমন এক পদ্ধতি, যেখানে জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকার প্রত্যেকেই নিজ নিজ আওতার মধ্যে নির্ভরশীল ও স্বাধীন।" (By the federal principle, I mean the method of dividing powers so that the general (central) and regional governments are each within a sphere, coordinate and independent.)

সুতরাং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ স্বার্থে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং প্রাদেশিক সরকার স্বাধীনভাবে স্থানীয় বা প্রাদেশিক বিষয়সমূহ পরিচালনা করে থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

৭-৩১ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গঠনপদ্ধতি

Methods of Formation of Federal Government

যুক্তরাষ্ট্র দুভাবে গঠিত হয়; যথাঃ

১. ভৌগোলিক দিক থেকে পাশাপাশি অবস্থানরত কতগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র সামরিক দিক থেকে নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা অথবা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় একত্রিত হয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে পারে। এই নীতি বা পদ্ধতিকে কেন্দ্রীয়করণ নীতি বলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া এভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করেছিল।

২. কোনো বৃহৎ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র সংবিধানের মাধ্যমে জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রের হাতে ও আঞ্চলিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রদেশের হাতে অর্পণ করে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে পারে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি। ভারত, কানাডা, সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় এ পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।

৭.৩২ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

Characteristics of Federal Form of Government

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. সংবিধানের প্রাধান্য ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। জাতীয় বা কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করে। সংবিধানই দেশের সর্বোচ্চ আইন ।

২. যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে দু ধরনের বিপরীতমুখী প্রবণতা দেখা যায়- একটি হলো কেন্দ্রবিমুখী, অপরটি কেন্দ্রমুখী। এই ব্যবস্থায় প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রগুলো জাতীয় ঐক্য চাইবে কিন্তু এক হয়ে মিশে যেতে চাইবে না (They must desire union but must not unity) প্রদেশগুলো কতগুলো সাধারণ বিষয়ে একটা ঐকমত্য সৃষ্টি করে। বাদবাকি ক্ষেত্রে প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে চায়। একে "যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব" বলে।

৩. দু ধরনের সরকার ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক এই দু ধরনের সরকার থাকে। প্রত্যেক সরকারই স্ব-স্ব এলাকায় স্বাধীন।

৪. দ্বৈত নাগরিকত্ব ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে নাগরিকগণ প্রথমত নিজ নিজ প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের নাগরিক; দ্বিতীয়ত তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল রাষ্ট্রের নাগরিক।

৫. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ঃ এ শাসনব্যবস্থায় আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হয়। নিম্নকক্ষ সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব এবং উচ্চকক্ষ সাধারণত প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। ।

৬. লিখিত সংবিধান ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সংবিধান লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা সংবিধানে অঙ্গরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা লিখিতভাবে বন্টন করা থাকলে কেউ কারও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

৭. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান ঃ যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়ার ফলে এর কোনো ধারা পরিবর্তন করে কেউ ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে না।

৮. সংবিধানের রক্ষক হিসেবে বিচার বিভাগ : সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বিচার বিভাগ যে ব্যাখ্যা প্রদান করে সেটাকেই প্রামাণ্য ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করা হয়। বিচার বিভাগ হচ্ছে সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক।

৯. ক্ষমতা বন্টন ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করে দেয়া হয়। মুদ্রা, বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা প্রভৃতি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং বাদবাকি বিষয়গুলো প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। - -

১০. যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ঃ সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্য স্বীকৃত ও প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য ফেডারেল কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এটাই সর্বোচ্চ আদালত এবং কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলো এর আওতার ভেতরে। কোনো অঙ্গরাজ্য যদি মনে করে যে, তার বা তাদের অধিকার কেন্দ্র বা কোনো অঙ্গরাজ্য ক্ষুন্ন করছে তাহলে সুপ্রিম কোর্ট এর মীমাংসা করে। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের আক্ষরিক নির্দেশ অবহেলা করে তার যুগোপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং সংবিধান বিরোধী কোনো কার্যকলাপ ঘটলে তা রোধ করে।

১১. বিচার বিভাগের প্রাধান্য ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বা সুপ্রিম কোর্টই সংবিধানের অভিভাবক, রক্ষক ও ব্যাখ্যাকর্তা। সংবিধানে প্রাধান্য স্বীকৃত ও প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্ট বা ফেডারেল কোর্টের। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১২. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রগুলো স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী। নিজ নিজ প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্র পরিচালনায় তারা সংবিধানের আলোকে অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে।

১৩. দ্বৈত বিচার ব্যবস্থা ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের জন্য পৃথক বিচার ব্যবস্থা থাকে। কেন্দ্রীয় আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় বিচার ব্যবস্থা এবং প্রাদেশিক আইন দ্বারা প্রাদেশিক বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। অবশ্য কেন্দ্রীয় অনেক আইন সব প্রদেশের জন্যও প্রযোজ্য হয়।

১৪. স্বতন্ত্র সংবিধান ঃ যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র এবং প্রদেশের জন্য স্বতন্ত্র সংবিধান থাকে। তবে কেন্দ্রীয় সংবিধানের বিধিবিধান সব প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রের জন্য অবশ্য পালনীয়।

৭.৩৩ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্যের শর্তাবলি

Conditions for the Success of Federal Government

সূচিপত্র

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্যের শর্তসমূহ নিম্নরূপঃ

১. যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব'। যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাবের রয়েছে দুটি দিক-(১) কেন্দ্রমুখী প্রবণতা (Centripetal tendency) এবং (২) কেন্দ্রবিমুখী প্রবণতা (Centrifugal tendency) ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য ইচ্ছার পাশাপাশি যখন প্রদেশ বা অঞ্চলগুলোর মধ্যে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বাসনও প্রবল থাকে তখন যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব সৃষ্টি হয়।

২. ভৌগোলিক সান্নিধ্য ঃ ভৌগোলিক সান্নিধ্যের ফলে জনগণের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার ইচ্ছা দেখা দেয়। অপরদিকে ভৌগোলিক অসংলগ্নতা ঐক্যবদ্ধ হবার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা-পূর্ব কালে বর্তমান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি অঙ্গরাজ্য পাশাপাশি অবস্থিত থাকায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা অর্জন এবং একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। ধর্মের বন্ধন থাকা সত্ত্বেও ভৌগোলিক অসংলগ্নতার কারণে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে যায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ স্বাধীন হয়।

৩. ধর্মীয় ঐক্য ঃ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের জনগণ একই ধর্মাবলম্বী হলে ভালো হয়। তবে শুধু ধর্মের বন্ধনই যথেষ্ট নয়। কেননা ধর্মের বন্ধনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হলেও ভাষা এবং সংস্কৃতিগত বন্ধন না থাকায় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়ায় ১৯৭১ সালে পাকিস্তান নামক যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটে।

৪. ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর জনগণের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য থাকা প্রয়োজন। যখন বিভিন্ন প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের জনগণ একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাদেরকে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যভাব গড়ে ওঠে। ভাষা ও সংস্কৃতিগত বিভিন্নতার কারণেই পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে যায় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

৫. রাজনৈতিক সচেতনতা ঃ যুক্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা জটিল শাসনব্যবস্থা। এর সফলতার জন্য তাই জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সজাগতা এবং আত্মত্যাগের মনোভাব থাকা প্রয়োজন।

৬. সৎ ও সুযোগ্য নেতৃত্ব ঃ সৎ, দেশপ্রেমিক ও সুযোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র সফল হয় না। জর্জ ওয়াশিংটন, ম্যাডিসন, হ্যামিল্টন, জেফারসন ও লিঙ্কনের মত সুযোগ্য ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতারা পৃথিবীর বুকে প্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা এবং তা সফল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৭. সাংবিধানিক প্রাধান্য ঃ সাংবিধানিক প্রাধান্য না থাকলে যুক্তরাষ্ট্র সফল হতে পারে না। কেননা যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই হচ্ছে জনগণের রক্ষক ও অভিভাবক।

৮. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ ঃ সংবিধানের প্রাধান্য নিষ্ঠার সাথে স্বীকৃত ও প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীন, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠন এবং একে সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের দায়িত্ব প্রদান করা উচিত।

৯. লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান ঃ সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য রক্ষার জন্য, সংবিধানকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য তা লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হতে হবে।

১০. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা থাকাই বাঞ্ছনীয়। উচ্চকক্ষ প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের স্বার্থ দেখাশোনা করবে।

১১. অভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সকল অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশের জনগণের মধ্যে অভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয়।

১২. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগত সাদৃশ্য ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগত সাদৃশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

১৩. আইন মেনে চলার মনোভাব ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নাগরিকদের আইন মেনে চলার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

১৪. সমতা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুলোর মধ্যে সমতা বজায় থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা জনসংখ্যা ও সম্পদের ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্য বিদ্যমান থাকলে প্রদেশগুলোর মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পর্কের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে।

১৫. আর্থিক সামর্থ্য ঃ যুক্তরাষ্ট্র শুধু জটিল সরকার পদ্ধতিই নয় বরং তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল সরকারব্যবস্থা। সুতরাং তা পরিচালনা ও প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য থাকতে হবে।

৭.৩৪ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ

Merits of Federal Government

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি নিম্নরূপঃ

১. জাতীয় ঐক্যের সাথে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সমন্বয় ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমন্বয়ে বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনে প্রেরণা যোগায়। প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়েও বৃহৎ রাষ্ট্রের মান-মর্যাদা ভোগ এবং জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারে।

২. বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী ঃ বৃহৎ ও বৈচিত্র্যের অধিকারী রাষ্ট্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার খুবই কার্যকর ও উপযোগী। কেননা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দুই বিপরীতমুখী প্রবণতাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত। একদিকে যুক্ত হতে চায় কিন্তু অন্যদিকে আঞ্চলিক স্বকীয়তা বজায় রাখতে চায়।

৩. স্বৈরশাসন প্রতিরোধ ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানের মাধ্যমে প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে বন্টন করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না।

৪. কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ হ্রাস ঃ স্থানীয় বা আঞ্চলিক বিষয় সংক্রান্ত কাজ অঙ্গরাজ্যের ওপর ন্যস্ত হলে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বাড়তি কাজের চাপমুক্ত থাকতে পারে।

৫. আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রসার ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রসার ঘটে। প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অভিজ্ঞতারও ব্যাপ্তি ঘটে ।

৬. রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে। কেননা এই শাসন ব্যবস্থায় জনগণকে একদিকে যেমন নিজ অঙ্গরাজ্যের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নাগরিক হিসেবে জাতীয় অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে একইভাবে সচেতন থাকতে হয়।

৭. ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন ঃ পাশাপাশি অবস্থানরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু রাষ্ট্র সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী হবার জন্য, দ্রুত উন্নতি লাভের আশায় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। এর ফলে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে শক্তিশালী ও বৃহৎ রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে এবং বহির্বিশ্বে শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি -ভু তুলতে পারে।

৮. জাতীয় সংহতি ও স্থিতিশীলতা অর্জন ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব বিদ্যমান থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সরকার ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৯. কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা কম ঃ যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করে দেয়া হয় সংবিধানের মাধ্যমে। ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা তিরোহিত হয়।

১০. স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রদেশে পৃথক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ থাকে। এর ফলে প্রদেশগুলোতে নিজস্ব রাজনীতি বিকশিত হতে থাকে। এর ফলে স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

১১. স্থানীয় সমস্যার সমাধান ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্থানীয় সমস্যা স্থানীয় পর্যায়ে, স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক সমাধান করা হয়। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। এর ফলে দ্রুত সমস্যা সমাধান হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারেরও চাপহ্রাস পায়।

৭.৩৫ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দোষ বা ত্রুটি

Demerits of Federal Government

১. ব্যয়বহুল সরকার ব্যবস্থা ঃ এই সরকার ব্যয়বহুল। দ্বৈত সরকারের কাঠামো তৈরি ও বজায় রাখতে গিয়ে অনেক বাহুল্য খরচের সম্মুখীন হতে হয়।

২ শাসনতান্ত্রিক জটিলতা : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে। অঙ্গরাজ্যগুলো নিজ নিজ বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন বলে এক অঙ্গরাজ্যের অধিবাসী অন্য অঙ্গরাজ্যে গিয়ে বিপরীতমুখী আইনের সম্মূখীন হয়ে বিব্রত অবস্থায় পড়তে পারেন।

৩. সরকার দুর্বল হয়ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অনেক সময় দুর্বল সরকারে পরিণত হয়। কেননা প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় বলে বলিষ্ঠ ও দ্রুত শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঃ সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে জনকল্যাণ বিঘ্নিত হয় ও রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে।

৫. বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা ঃ শাসনতান্ত্রিক বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্য অথবা অঙ্গরাজ্যসমূহের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে ভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদন ও তা কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় সরকার বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হতে পারে।

৬. নাগরিকদের ঔদাসীন্য বৃদ্ধি করে ঃ অনেক নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের জটিলতার জন্য এই শাসনব্যবস্থার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। জনগণের উদাসীনতা আস্তে আস্তে রাষ্ট্রকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

৭. জটিল পদ্ধতি ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি জটিল। জনগণ শিক্ষিত ও রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন না হলে, তাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব শক্তিশালী না হলে এই ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে পারে।

৮. অনমনীয়তা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় ও অনমনীয়। এরূপ সংবিধান পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে অনেক সময় ব্যর্থ হয়। এর ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

৯. জরুরি অবস্থার জন্য অনুপযোগী ঃ জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা অনেক সময় প্রকৃতিগত জটিলতার কারণে ব্যর্থ হতে পারে।

৭.৩৬ যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের তুলনা

Comparative study between Unitary and Federal Government

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা একটি অন্যটির বিপরীত রূপ। উভয় সরকার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ঃ –

১. ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ঃ এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রীয় আইনসভা দেশের একমাত্র সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হয় না। সেখানে একাধিক প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের অস্তিত্ব থাকে এবং সে সমস্ত সরকারসমূহ সাংবিধানিকভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা রাখে। প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারসমূহ নিজ নিজ এখতিয়ার অনুযায়ী নিজস্ব আইনসভা দ্বারা আইন প্রণয়ন করে থাকে।

২. সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতাবন্টন ঃ এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় দেশের সংবিধান আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করে না। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছামত ঐ সমস্ত আঞ্চলিক সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে আবার কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারকে অর্পিত ক্ষমতা কোনো কারণ ব্যতিরেকে প্রত্যাহার করে

নিতে পারে। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে সংবিধান ক্ষমতা বন্টন করে দেয় যা কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলেও প্রত্যাহার করে নিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার সমমর্যাদার ভিত্তিতে নিজ নিজ ক্ষমতা চর্চা করে থাকে।

৩. স্থানীয় সরকার ঃ এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রশাসনের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানীয় সরকার গঠন করে থাকে। তবে এসব স্থানীয় সরকারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এবং তার এজেন্টরূপে কাজ করে থাকে। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বা স্থানীয় সরকারসমূহ সংবিধান দ্বারা গঠিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় এবং স্বাধীনভাবে ক্ষমতার চর্চা করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে ঐ সমস্ত স্থানীয় সরকারসমূহ ভেঙে দিতে পারে না।

৪. সংবিধানের প্রকৃতি ঃ এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় দেশের সংবিধান লিখিত অথবা অলিখিত, সুপরিবর্তনীয় অথবা দুষ্পরিবর্তনীয় যে কোনো ধরনের হতে পারে। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় দেশের সংবিধান অবশ্যই লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হয়।

৫. আনুগত্য ঃ এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় দেশের নাগরিককে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুগত থাকতে হয়। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেশের নাগরিককে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়।

৬. বিচার বিভাগের ভূমিকা ঃ এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বই বহাল থাকে। কেননা কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় দেশের বিচার বিভাগ সংবিধানের রক্ষক হিসেবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সাংবিধানিকভাবে সে বিরোধের মীমাংসা বিচার বিভাগ করে থাকে। এমনকি দেশের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন বা প্রশাসনিক নির্দেশ সংবিধানের বিধান মতে বৈধ কি-না তাও দেশের বিচার বিভাগ পর্যালোচনা করে থাকে।

৭. কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের প্রকৃতি ঃ এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্রে একটিমাত্র সরকার থাকে। প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট মাত্র। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর নিজস্ব সরকার থাকে।

৮. সংবিধানের প্রকৃতি : এককেন্দ্রিক সরকারে সংবিধান লিখিতও হতে পারে অলিখিতও হতে পারে, সুপরিবর্তনীয়ও হতে পারে দুষ্পরিবর্তনীয়ও হতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হতে বাধ্য।

৯. নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে ঃ এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় একক নাগরিকত্ব বিদ্যমান। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় দ্বৈত নাগরিকত্ব বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রে একই ব্যক্তি একাধারে তার নিজ প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রের নাগরিক আবার সে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রেরও নাগরিক।

১০. রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ ঃ এককেন্দ্রিক সরকার ব্যয়বহুল নয়। কেননা একটিমাত্র সরকার থাকার ফলেই ব্যয়ও হয় কম। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের পিছনে অনেক ব্যয় হয়। এজন্যই যুক্তরাষ্ট্র ব্যয়বহুল হয়।

১১. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ঃ এককেন্দ্রিক সরকারে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর স্বায়ত্তশাসন সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত।

৭•৩৭ রাজতান্ত্রিক সরকার

Monarchy

রাজতন্ত্র হচ্ছে সেই শাসনব্যবস্থা যেখানে রাজা বা রানির হাতে রাষ্ট্রের চরম ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে এবং রাজা বা রানি উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন। অতীতে অধিকাংশ দেশেই রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজার ইচ্ছাই ছিল চূড়ান্ত। মন্ত্রিগণ ছিলেন রাজার একান্ত অনুগত। এরূপ রাজতন্ত্রকে বলা হয় চরম বা অসীম

রাজতন্ত্র (Absolute or unlimited Monarchy) । অতীতে এরূপ রাজতন্ত্রে রাজাই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বর্তমান সময়েও সৌদি আরবসহ কিছু কিছু দেশে এরূপ রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে।

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে আর এক ধরনের রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে। এরূপ রাজতন্ত্রকে বলা হয় সসীম বা for Toffo ássiè3' (Limited or constitutional Monarchy)। গ্রেট ব্রিটেনে সর্বপ্রথম এরূপ সসীম বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেন ছাড়াও জাপান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে এরূপ রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা বা রানি উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু সরকার পরিচালনা করেন জনগণের নির্বাচিত সরকার। নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যগণের আস্থাভাজন নেতাই সরকার গঠন করে থাকেন। অধিকাংশ সসীম রাজতন্ত্রের দেশেই রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাজা বা রানি হলেন নামমাত্র শাসক এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক তথা সরকারপ্রধান।

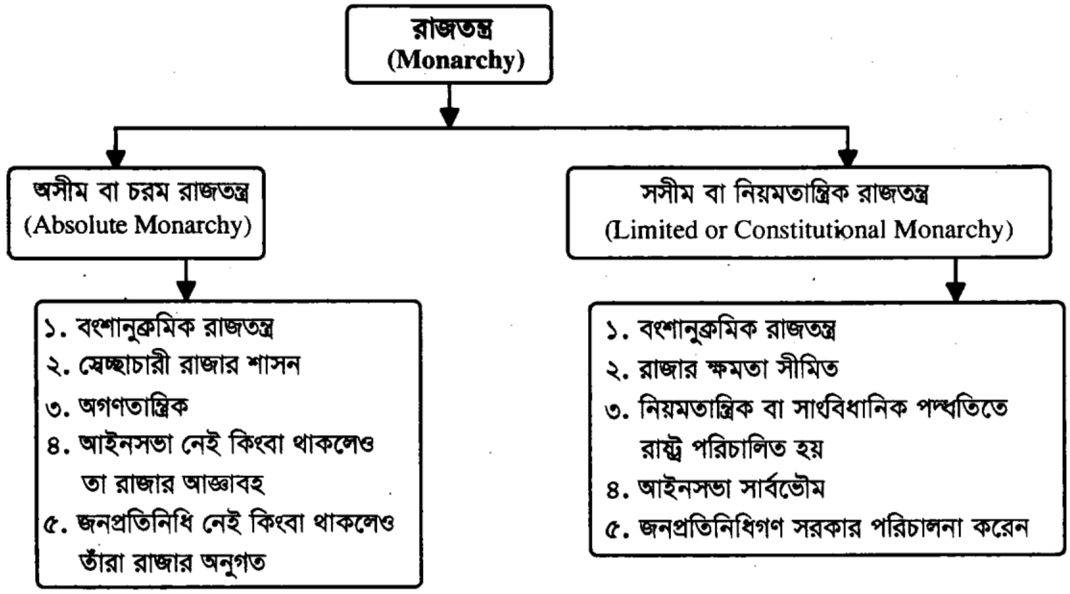

রাজতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Monarchy

রাজতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১। রাজা বা রনি বংশানুক্রমে বা উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। অবশ্য মালয়েশিয়ার রাজা নির্বাচিত হন।

২। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে রাজা বা রান হচ্ছেন একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান। কিন্তু সীমিত বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা বা রানি নামমাত্র শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধান। প্রকৃত ক্ষমতা চর্চা করেন প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ সরকারপ্রধান।

৩। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে রাজা বা রানির হাতেই আইন প্রণয়ন, শাসন কাজ পরিচালনা এবং বিচারের চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। ফলে এখানে ক্ষমতার পৃথকীকরণ ঘটে না। অপরদিকে সীমিত রাজতন্ত্রে ক্ষমতার পৃথকীকরণ লক্ষ করা যায়।

৪। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে শাসন বিভাগের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তবে গ্রেট ব্রিটেন, জাপান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে সীমিত রাজতন্ত্র এবং সংসদীয় গণতন্ত্র থাকায় আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। যদিও বর্তমানে এসব দেশেও আইনসভার পরিবর্তে শাসন বিভাগের ক্ষমতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়েই চলছে।

৫। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে কোনো রাজনৈতিক দল থাকে না, এমনকি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও নিষিদ্ধ থাকে। তবে সসীম রাজতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে।

৬। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা নেই। আইন প্রণেতা, মন্ত্রী বা সভাসদ প্রভৃতি সকলেই রাজা বা রানি কর্তৃক মনোনীত হন। কিন্তু সীমিত রাজতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা করে থাকে।

৭। রাজতন্ত্রে রাজা বা রানিই হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান; সবকিছুর মূল নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ব্যক্তি। অবশ্য সীমিত রাজতন্ত্রের রাজা বা রানি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সবকিছু করে থাকেন। রাজা বা রানি রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতীক।

রাজতন্ত্রের গুণাবলি

Merits of Monarchy

১। রাজা বা রানি রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করে থাকেন। ফলে জাতীয় সংহতি ও ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

২। রাজা বা রানি রাজনীতি নিরপেক্ষ ব্যক্তি হওয়ায় সকলের নিকট তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। সকল জনগণই তাকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে থাকে।

৩। রাজতন্ত্র স্থায়ী শাসনব্যবস্থা। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে দীর্ঘদিন একই রাজার শাসন চালু থাকে। সসীম বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তন হলেও রাজা বা রানি থাকেন। ফলে শাসন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব থাকে।

৪। রাজা বা রানি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ক্ষমতা লাভ করেন উত্তরাধিকারসূত্রে। এক্ষেত্রে নির্বাচনের মতো ব্যয়বহুল পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। ফলে রাজতন্ত্রে অপচয় খুব কম হয়।

৫। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে নির্বাচনের ব্যবস্থা নেই, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেরও অনুমতি নেই। ফলে রাজনৈতিক দলাদলি ও সহিংসতা থাকে না।

৬। রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান পদের স্থায়িত্ব ও নিরপেক্ষতা থাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি ও মানবকল্যাণ সূচিত হয়।

রাজতন্ত্রের দোষ-ত্রুটি

Demerits of Monarchy

১। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র গণতন্ত্র বিরোধী। জনগণ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

২। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দলব্যবস্থা নেই। জনগণ স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

৩। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই। জনগণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে না।

৪ । নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে আইনের শাসন নেই, সাম্যনীতি নেই। ফলে ন্যায়বিচার পদদলিত হয়।

৫। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের রাজা এবং তার আত্মীয়-স্বজন ও বশংবদ সভাসদ বা অমাত্যরাই দেশ শাসন করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শাসন কাজের সকল ধরনের অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে।

৬। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র স্বায়ত্তশাসনকে অস্বীকার করে।

৭। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রকৃত অর্থেই স্বেচ্ছাচার শাসন।

৮। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি ঘটে না বরং ব্যক্তিসত্তার অপমৃত্যু ঘটে।

৭.৩৮ সমাজতান্ত্রিক সরকার

Socialist Government

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের তথা পুঁজিবাদের বিপরীতধর্মী ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপাদানগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্রবাদ উৎপাদনের যৌথ মালিকানা এবং উৎপাদিত সামগ্রীর প্রয়োজনভিত্তিক বন্টনের নীতিতে বিশ্বাসী। উৎপাদন এবং বন্টনব্যব্স্থা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণগুলোকে রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টনের দ্বারা শ্রেণিবৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সমাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সমাজতন্ত্র মতবাদের উপর ভিত্তি করে। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে পূর্ব ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে চীন, উত্তর কোরিয়া, কউবা, উত্তর ভিয়েতনাম প্রভৃতি রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রচলিত রয়েছে।

সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ

Origin and Development of Socialism

ওল্ড টেস্টামেন্ট' ও 'মোজেজ' কর্তৃক প্রণীত অনুশাসনের মধ্যে সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ১৫১৬ সালে প্রকাশিত টমাস্ মুর লিখিত ইউটোপিয়া গ্রন্থ সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত চিন্তারাজ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফরাসি বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক নেতা বেবউফ, সমাজের আমূল পরিবর্তনের জন্য বৈপ্লবিক পন্থায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার আহবান জানাতে গিয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। উনবিংশ শতাব্দীতে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী বলে পরিচিত ফরাসি দার্শনিক সেন্ট সাইমন, চার্লস ফুরিয়ের ও ইংরেজ দার্শনিক রবার্ট ওয়েন সমাজতন্ত্রের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের মতে, অবাধ নীতিই (Doctrine of Laissez-faire) সমাজের সর্বপ্রকার অসাম্যের মূল কারণ। সমাজতন্ত্রের যুক্তিভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেন জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও তার ব্রিটিশ সহযোগী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ । তিনিই প্রথম চিন্তাবিদ যিনি সমাজতন্ত্রকে জড়বাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে সমাজতন্ত্রকে কল্পনার রাজ্য থেকে মুক্ত করে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সুনিশ্চিত পদ্ধতির রূপরেখা প্রণয়ন করেন। কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংগঠিত ও বাস্তবসম্মত । কাল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে সামনে রেখে ১৯১৭ সালে বিপ্লবের মাধ্যমে লেনিন রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

সমাজতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

Features of Socialist Government

সমাজতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ঃ সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সমষ্টিগত বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় । জনগণই সকল সম্পদের মালিক। শিল্প-কল কারখানা ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকার তা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে।

২. সমষ্টির স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ঃ সমাজতান্ত্রিক সরকার পরিচালিত হয় সমষ্টির স্বার্থে। ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে এখানে সমষ্টির স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

৩. সামাজিক কল্যাণ ঃ সমাজতান্ত্রিক সরকারের লক্ষ্য হলো সামাজিক কল্যাণ। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সমাজতান্ত্রিক সরকার শ্রমিকদের মজুরির নিশ্চয়তা বিধান করে, তাদের সুযোগসুবিধা ভোগের নিশ্চয়তা প্রদান করে, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে দেয়।

৪. সম্পদের সুষম বন্টন ঃ সমাজতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ সকল মানুষের মধ্যে সুষম বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৫. সর্বহারার একনায়কত্ব ঃ সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়।

৬. একদলীয় ব্যবস্থা ঃ সমাজতান্ত্রিক সরকার একদলীয় ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে। এখানে একটিমাত্র দল থাকে। সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করা যায় না।

৭. পরিকল্পিত অর্থনীতি ঃ সমাজতান্ত্রিক সরকার পরিকল্পিত অর্থনীতি কার্যকর করে থাকে। কোন দ্রব্য কতটুকু উৎপাদিত হবে তা রাষ্ট্রীয় কতৃপক্ষই নির্ধারণ করে থাকে। এর ফলে অপচয় হয় না।

সমাজতান্ত্রিক সরকারের গুণাবলি

Merits of Socialist Government

সমাজতান্ত্রিক সরকারের গুণাবলি নিম্নরূপঃ

১। সম্পদের সুষম বন্টন ঃ সমাজ কোনো ব্যক্তিবিশেষের দান নয়। সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্রের সম্পদ শুধু গুটিকয়েক ব্যক্তির স্বার্থে যাবে এটা সমাজতন্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করেন না। রাষ্ট্রের

সমস্ত সম্পদ সকল মানুষের মধ্যে সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক সরকার সম্পদের সুষম বন্টনে বিশ্বাস করে।

২। শ্রমিকদের মজুরির নিশ্চয়তা বিধান ঃ সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় শ্রমিক-শোষণ বন্ধ ও উৎপাদনের অপচয় রোধ করার জন্য রাষ্ট্রের সমস্ত শিল্প, কল-কারখানা ইত্যাদি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। কারণ ব্যক্তিমালিকানায় শ্রমিক শোষণ ও শ্রেণিবৈষম্যের অবসান সম্ভব নয়।

৩। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ঃ রাষ্ট্র হচ্ছে ধনী বা শাসকশ্রেণির শোষণের হাতিয়ার। তাই শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা অপরিহার্য।

৪। সুযোগ-সুবিধা ভোগের নিশ্চয়তা ঃ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জনগণ অধিক মাত্রায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। রাষ্ট্রের পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রণে জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, বিশ্রাম, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি সুযোগসুবিধাগুলো নিশ্চিত হয়।

৫। অপচয় রোধ ঃ সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের মতে, রাষ্ট্রের মধ্যে অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা জাতীয় সম্পদের অপচয় ঘটায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে বলে অপচয় ঘটে না।

৬। সাম্যের যুক্তি ঃ প্রকৃতিগতভাবে সকল মানুষ সমান। আলো-বাতাস যেমন সকলেই সমানভাবে ভোগ করতে পারে, তেমনি সকল প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরও মানুষের সমান অধিকার থাকা প্রয়োজন। সমাজতন্ত্র এই সাম্যের যুক্তিতেই সকল সম্পদের উপর সকলের অধিকার বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রবর্তন করতে চায়।

৭। গণতন্ত্রের যুক্তি ঃ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তোলে। সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের মতে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য অর্থহীন। অধ্যাপক লাস্কি গণতন্ত্রের সফলতার জন্য আর্থিক বৈষম্য দূর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবসন বলেন, "গণতন্ত্র বলতে নূন্যতম মৌলিক আর্থিক কল্যাণকে বোঝায়; কারণ অভুক্ত, গৃহহীন, রোগাক্রান্ত ও বস্ত্রহীনদের নিকট রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন।"

৮। সাম্য ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি ঃ সমাজতান্ত্রিক সরকার শ্রেণিহীন সরকার প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ। ফলে শ্রেণিশোষণ লোপ পায় এবং সাম্য ও সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে ওঠে।

৯। কর্মসংস্থান ঃ সমাজতান্ত্রিক সরকার বেকারত্ব দূরীকরণে সফল হয়। কেননা উৎপাদন ও বন্টনের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

সমাজতান্ত্রিক সরকারের দোষাবলী

Demerits of Socialist Government

সমাজতান্ত্রিক সরকারের দোষসমূহ নিম্নরূপঃ

১। গণতন্ত্রের পরিপন্থী ঃ সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

২। ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই ঃ সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে না। ফলে ব্যক্তি তার কর্ম প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সকল উদ্যম হারিয়ে ফেলে এবং পরিশ্রমবিমুখ হয়ে পড়ে, যা একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অকল্যাণকর।

৩। উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নীত হয় না ঃ এ সরকার ব্যবস্থায় সম্পদের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার অবাধ ও সুস্থ প্রতিযোগিতা না থাকায় দ্রব্যের মান উন্নত হয় না।

৪ । মূল্যহ্রাস পায় না ঃ অবাধ প্রতিযোগিতা না থাকার ফলে মূল্যহ্রাস পায় না। এর ফলে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতাও হ্রাস পায়।

৫। উৎপাদন ব্যাহত হয় ঃ অবাধ প্রতিযোগিতা না থাকার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৬। ব্যক্তিগত সম্পদ ক্রয়, সঞ্চয় ও পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ নেই ঃ রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা কতটুকু সফল হবে তা সঠিক করে বলা যায় না। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পদ ক্রয়, সঞ্চয় ও পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ থাকে না ।

৭। রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী ঃ ব্যক্তি তার নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে না, বরং রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

৮। রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হয় ঃ অসীম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পেয়ে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হয়ে যায় এবং জনগণের স্বাধীনতার দ্বার রুদ্ধ করে দেয় ।

৯। মানুষের জীবনের বৈচিত্র্যহীনতা ঃ সমাজতান্ত্রিক সরকার মানুষের জীবনকে গতানুগতিক ছকের মধ্যে ফেলে তার জীবনের বৈচিত্র্য ও স্বকীয় সত্তাকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়।

উপসংহার ঃ সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার বিপক্ষে উপরোক্ত সমালোচনা থাকলেও বর্তমান বিশ্বে সমাজতন্ত্রবাদ এখনোও একটি শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ। বিশ্বের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ এখনোও এ মতাদর্শে বিশ্বাসী। শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়ে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় না, তার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক মুক্তি। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থে সাম্যবাদী অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। বিশ্বের বহু দেশ অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। এমনকি বহু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও বর্তমানে জনকল্যাণকর কর্মসূচি গ্রহণ করছে এবং উৎপাদন ও বন্টনে আংশিক হস্তক্ষেপ করছে।

৭.৩৯ সামরিক সরকার

Military Government

একটি দেশের নির্বাচিত সরকারের শাসন ক্ষমতা যখন সে দেশের সামরিক বাহিনী দখল বা করায়ত্ত করে নেয় এবং সরকার পরিচালনা করতে শুরু করে তখন তাকে সামরিক সরকার বলে। বর্তমান শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সদ্য স্বাধীন অনেক দেশে বেসামরিক সরকারের দুর্নীতি, অব্যবস্থা, দলীয় কোন্দল বা রাজনৈতিক হিংসা-বিদ্বেষ, অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন ইত্যাদির ফলে জনগণ যখন ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ে তখনই সামরিক বাহিনী বা এই বাহিনীর কোনো উচ্চাভিলাষী সেনা কর্মকর্তা কৃপ করে ক্ষমতা দখল করেন। শাসন ক্ষমতা দখল করেই সেনা শাসকরা সংবিধান, সরকার, আইনসভা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত ঘোষণা করে ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বাংলাদেশের আলোকে বলা যায়, সামরিক শাসক একটি হ্যা' বা না ভোটের মাধ্যমে তার প্রতি আস্থা আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এরূপ নির্বাচন মূলত একটি প্রহসন ও ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। এরপর শুরু হয় বিভিন্ন দল থেকে ক্ষমতালোভী নেতাদেরকে ভাগিয়ে এনে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া। সময় অনুকূলে এলে প্রধান সামরিক প্রশাসক (Chief Martial LawAdministrator = CMLA) সামরিক বাহিনীর চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করে উপরোক্ত রাজনৈতিক দলের প্রধান হন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। সামরিক শাসকগণ নির্বাচনে পরাজিত হন এমন নজির নেই বললেই চলে।

সামরিক সরকারের কর্তৃত্বের প্রকৃতি ও তা ব্যবহারের ভিত্তিতে একে দু ভাগে ভাগ করা যায়- ১। কর্তৃত্ববাদী সামরিক সরকার এবং ২। সর্বাত্মকবাদী সামরিক সরকার। কর্তৃত্ববাদী সামরিক সরকারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামরিক শাসক সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগ করলেও ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সবদিক নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যত হয় না। অপরদিকে যখন সামরিক সরকার রাষ্ট্রীয় জীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি ব্যক্তিজীবনের সবদিক নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয় তখন তাকে সর্বাত্মকবাদী সামরিক সরকার (Totalitarian Military Government) বলে।

সামরিক সরকারের গুণাবলি

Merits of Military Government

সামরিক সরকারের গুণাবলি নিম্নরূপঃ

১। যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য উপযোগী ঃ অনেকেই যুক্তি দেখান যে, সামরিক সরকার যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য উপযোগী। কেননা সামরিক শাসক নিজেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদশী এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম।

২। দুর্নীতি দূরীকরণে প্রাথমিক সাফল্য ঃ দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের জন্য সামরিক শাসন প্রাথমিকভাবে সুফল বয়ে আনে।

৩। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ঃ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সামরিক সরকার দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়। জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় এ সরকার উপযোগী ।

৪। ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে ঃ রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্ব যদি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে সে সময়ে সামরিক শাসন সুফল বয়ে আনতে পারে।

৫। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ঃ সামরিক সরকার দীর্ঘদিন নির্বাচন না দিয়েই শাসন করেন। নির্বাচন দিলেও নিজেরাই কৌশলে দল গঠন করে ক্ষমতাসীন হন। ফলে একধরনের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ঃ সামরিক সরকার সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে দ্রুত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম হয়।

সামরিক সরকারের দোষসমূহ

Demerits of Military Government

সামরিক সরকারের দোষগুলো নিম্নরূপঃ

১। অস্বাভাবিকতা ঃ সামরিক সরকার অস্বাভাবিক সরকার ব্যবস্থা।

২। অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী ঃ সামরিক সরকারব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা।

৩। কর্তৃত্ববাদী অথবা সর্বাত্মকবাদী ঃ সামরিক সরকার হয় কর্তৃত্ববাদী একনায়কতান্ত্রিক শাসক নয়তো সর্বাত্মকবাদী শাসনে পরিণত হয়।

৪ । একনায়কতন্ত্রের দোষ-ত্রুটি ঃ সামরিক সরকারের মধ্যে একনায়কতান্ত্রিক সরকারের সকল দোষই লক্ষ করা যায়।

৫। ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাব ঃ সামরিক সরকার ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পদদলিত করা হয়। এর ফলে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে না।

৬। গোষ্ঠীতন্ত্র ঃ সামরিক শাসকগণ রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতাই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা চক্রের হাতে কুক্ষিগত করে রাখে।

৭। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশে বাধা প্রদান ঃ সামরিক সরকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে।

৮। সাংগঠনিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত ঃ সামরিক সরকার রাজনৈতিক দলব্যবস্থা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে রাজনৈতিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাংগঠনিক অগ্রযাত্রা, উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৯। জোরের যুক্তিতে বিশ্বাস ঃ সামরিক সরকার জোরের যুক্তিতে বিশ্বাসী, যুক্তির জোরে বিশ্বাসী নয়।

১০। নেতৃত্বের সংকট ঃ রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকার ফলে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিকাশের সুযোগ না থাকায় ভবিষ্যতে নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি হয়।

৭.৪০ ধর্মতান্ত্রিক সরকার

Theocracy

ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী যখন কোনো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় তখন তাকে ধর্মতান্ত্রিক সরকার বলে। অনেক সময় ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত সরকারকেও ধর্মতান্ত্রিক সরকার বলা হয়।

মধ্যযুগে ছিল ধর্মের জয়জয়কার। ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকেই তখন রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হতো। খ্রিস্টান জগতে চার্চ শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানই পরিচালনা করতো না, রাষ্ট্রীয় বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতো। আধুনিক যুগে শিল্প বিপ্লব, রেনেসা বা পুনর্জাগরণ, জাতীয় রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব এবং সবশেষে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটতে থাকলে

ধর্মীয় রাষ্ট্র এবং ধর্মতান্ত্রিক সরকারেরও প্রভাব কমতে থাকে। ভ্যাটিকান সিটিতে ধর্মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। অতি সম্প্রতি ইরানে, আফগানিস্তানে ধর্মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক দেশে মৌলবাদী ধমীয় চিন্তা-চেতনা প্রসারিত হচ্ছে। চলমান রাজনীতির ব্যর্থতাই ধর্মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার আবেদনকে অনেক দেশে জোরালো করে তুলছে।

ধর্মতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

Characteristics of Theological Government

ধর্মতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. ধমীয় বিধি-বিধান ঃ ধর্মতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতার উৎস ধমীয় বিধি-বিধান। ধর্মতান্ত্রিক সরকার ধর্মীয় গ্রন্থকে সংবিধানের মর্যাদা প্রদান করে। সরকার পরিচালিত হয় ধর্মীয় বিধি-বিধানের আলোকে ।

২. সার্বভৌম ক্ষমতা ঃ ধর্মতান্ত্রিক সরকার বিধাতার সার্বভৌমে বিশ্বাস করে। তাদের মতে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়। ৩. বিধাতার প্রতিনিধি ঃ ধর্মতান্ত্রিক সরকারে বিশ্বাস করা হয় যে, ধমীয় নেতাগণই হলেন মর্তলোকে বিধাতার প্রতিনিধি। কাজেই তাদের নেতৃত্ব ও শাসনকে মেনে চলতে হবে।

৪. ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ঃ ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধুমাত্র ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলই রাজনীতি করতে পারে।

৫. একদলীয় ব্যবস্থা ঃ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে সাধারণত ক্ষমতাসীন ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বাধীন দলই রাজনীতি করার অধিকার লাভ করে। অন্যান্য দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

৬. রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস ঃ ধমীয় আইন ও অনুশাসন এবং ক্ষমতাসীন ধর্মীয় নেতাদের আদেশ-নির্দেশই রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

৭. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ঃ রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা, ব্যাংক-বিমা, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ধর্মীয় বিধি-বিধান মোতাবেক পরিচালিত হয়।

ধর্মতান্ত্রিক সরকারের গুণাবলি

ধর্মতান্ত্রিক সরকারের গুণাবলি নিম্নরূপঃ

১. ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা ঃ ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একই ধর্মীয় ভাবাদর্শ দ্বারা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং একই । ধর্মীয় বিধি-বিধান দ্বারা রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হয়। ফলে জনগণের মধ্যে একধরনের ঐক্য ও সংহতি গড়ে ওঠে বলে । ধর্মীয় নেতাগণ বিশ্বাস করেন।

২. অবিচার-অনাচার দূরীকরণ ঃ কঠোরভাবে ধর্মীয় বিধি-বিধান ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ফলে অবিচার-অনাচার দূরীভূত হবে বলে বিশ্বাস করা হয়।

৩. সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা: ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর হবে, অন্যায়-অবিচার দূর হবে, শোষণ-বঞ্চনা দূর হবে, দুনীতি, স্বজনপ্রীতি দূর হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। এর ফলে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

৪. ভ্রাতৃত্ববোধ ঃ ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে বলে মনে করা হয় ।

৫. শান্তি-শৃঙ্খলা ঃ ধর্মতান্ত্রিক সরকার খুব দ্রুত শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় বা হতে পারে। কেননা শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এছাড়াও মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ও নৈতিক চেতনা সমুন্নত হবার ফলেও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সহজ হয়।

ধর্মতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. এক দলীয় ব্যবস্থা ঃ ধর্মতান্ত্রিক সরকার মূলত একদলীয় সরকার। বিরোধী মত ও অনুসারী দলগুলোর অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না।

২. স্বৈরাচারী হয় ঃ ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একদলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে না। এরূপ অবস্থায় সরকার স্বৈরাচারী হয়।

সূচিপত্র

৩. সর্বাত্মকবাদী সরকার ঃ ধর্মতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তিজীবনের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যত হয়। ফলে এরূপ সরকার সর্বাত্মকবাদী হতে পারে।

৪. দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার অভাব ঃ ধর্মতান্ত্রিক সরকারে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নেই। ফলে এরূপ সরকার স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয় বা হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

৫. প্রগতি ও মুক্ত চিন্তার বিরোধী ঃ ধর্মতান্ত্রিক সরকার প্রগতি ও মুক্ত, স্বাধীন চিন্তা-চেতনাকে সহ্য করতে পারে না।

৬. রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের অপব্যবহার ঃ ধর্মতান্ত্রিক সরকারে ক্ষমতাসীন ধর্মীয় নেতাগণ রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের অপব্যবহার করতে পারেন। ধর্ম, নৈতিকতা ও রাজনীতিকে একইসূত্রে গ্রথিত করার অপচেষ্টা চলতে পারে।

৭. মানবিক আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ঃ ধর্মতান্ত্রিক সরকার মানবিক আইনে বিশ্বাসী নয়। তারা প্রচার করে যে, মানবিক আইন মানুষের মনগড়া আইন। মানবিক আইন অভ্রান্ত নয়।

৭.৪১ উত্তম সরকারের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of a Best Government

কোন ধরনের সরকার উত্তম তা বলার উপায় নেই। কেননা একটি দেশে সরকার ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত তা সেদেশের প্রচলিত অবস্থার উপর নির্ভরশীল। ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, জনসংখ্যা, জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাগত মান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ও সংস্কৃতি, রীতিনীতি ইত্যাদি সবকিছুই একটি দেশের সরকারের মান ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এজন্যই এক দেশে যে সরকার উত্তম বলে বিবেচিত হয়, অন্যদেশে তা না-ও হতে পারে। উত্তম সরকারের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপঃ

১। গণতান্ত্রিক ঃ উত্তম সরকার হবে গণতান্ত্রিক। সরকার গঠিত হবে নির্বাচনের মাধ্যমে। রাষ্ট্রীয় সব কাজই জনপ্রতিনিধিগণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

২। দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক ঃ উত্তম সরকার অবশ্যই দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক হবে। সরকারের প্রতিটি কাজ বা উদ্যোগ সংসদে সমর্থিত বা অনুমোদিত হতে হবে। সরকার জনগণ তথা জনপ্রতিনিধিদের নিকট সবকিছুর জন্য দায়ী থাকবেন।

৩। আইনসভার সার্বভৌমত্ব ঃ উত্তম সরকারের আইনসভা হবে সার্বভৌম। আইনসভার অনুমোদন ভিন্ন শাসন বিভাগ কোনো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে না। আইনসভা অনাস্থা আনলে সরকার পদত্যাগ করবে।

৪। আইনের অনুশাসন ঃ উত্তম সরকার যথার্থ আইনের অনুশাসন গড়ে তুলবে। আইনের চোখে সকলেই হবে সমান। কাউকে বেআইনি আটক বা হয়রানি করা থেকে সরকার বিরত থাকবে।

৫। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ঃ উত্তম সরকার ব্যবস্থায় শাসন, আইন ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ঘটবে। বিশেষ করে শাসন বিভাগ অন্য বিভাগ দুটির উপর অযথা হস্তক্ষেপ করবে না।

৬। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঃ উত্তম সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা একটি কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত না করে তার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে হবে।

৭। জনগণের আস্থা অর্জন ঃ উত্তম সরকারকে তার কাজ-কর্মের দ্বারা জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। জনগণকে রাষ্ট্রীয় কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৮। সরকারি কর্মচারীদের জনহিতকর মানসিকতা ঃ উত্তম সরকার আমলাদের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। আমলা বা সরকারি কর্মচারীরা হবেন জনগণের সেবক, প্রভু নন। সরকারি কর্মচারীদের জনহিতকর মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

৯। মুক্ত ও স্বাধীন প্রচার মাধ্যম ঃ উত্তম সরকার অবশ্যই ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। একটি দেশে মুক্ত ও স্বাধীন প্রচার মাধ্যম থাকলে বুঝতে হবে সে সরকার উত্তম।

১০। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ঃ উত্তম সরকার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

১১ । সহনশীল ঃ উত্তম সরকার সব ধরনের মত ও আদর্শের প্রতি উদার ও সহনশীল হবে। সকলেরই বাকস্বাধীনতা ও সংগঠন করার স্বাধীনতা থাকবে।

৭.৪২ বাংলাদেশে উত্তম সরকারের পথে অন্তরায়

Hindrances to the Best Government in Bangladesh

বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীন একটি দেশ। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন এবং দীর্ঘ দশ মাসের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। এখনো দেশটি নিজের পায়ে দাড়াতে পারেনি। এদেশে উত্তম সরকারের পথে অন্তরায়গুলো নিম্নরূপঃ

১ । সুষ্ঠ গণতন্ত্র গড়ে ওঠেনি ঃ বাংলাদেশে বারবার সামরিক হস্তক্ষেপ, রাজনীতিবিদদের অসাধু চরিত্র, রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্য, জনগণের রাজনৈতিক অসচেতনতা এদেশে গণতন্ত্রের বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে।

২। দায়িত্বশীলতার অভাব ঃ বাংলাদেশে আজও সরকার এবং প্রশাসন দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়নি।

৩। আইনের অনুশাসনের অভাব ঃ বাংলাদেশে বলতে গেলে কোনো সময়ই আইনের অনুশাসন ছিল না। বিভিন্ন অজুহাতে বিভিন্ন সময় হয়রানিমূলক কালা-কানুন রচনা ও তা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

৪। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হয়নি ঃ সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে এখনো ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়নি। বিচার । বিভাগকে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা হয়নি।

৫। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঃ বাংলাদেশে এখনো ক্ষমতার যথাযথ বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়নি। এখনো সবকিছুই ঢাকামুখী বা ঢাকাকেন্দ্রিক রয়ে গেছে।

৬। জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থতা ঃ বাংলাদেশে বলতে গেলে কোনো সরকারই তার কাজ-কর্ম দ্বারা জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। ক্ষমতায় এসে কোনো সরকারই নির্বাচন-পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করেনি।

৭। আমলাদের দৌরাত্ম্য ঃ বাংলাদেশে আমলাদের দৌরাত্ম্য সেই ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসনামলের মতোই রয়ে গেছে। এদেশের আমলারা নিজেদেরকে জনগণের প্রভু ভবেন। শুধু সাধারণ জনগণ নয়, রাজনীতিবিদরাও এদের হাতের ক্রীড়নক।

৮। প্রচার যন্ত্রের উপর অহেতুক সরকারি হস্তক্ষেপ ঃ বাংলাদেশে প্রচারযন্ত্র বা প্রচার মাধ্যম কোনো কালেই স্বাধীন ছিল না। অতীতে সব সরকারই এগুলোর ওপর নিজেদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং নিজেদের কীর্তিকলাপের প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছে।

৯। সহনশীলতার অভাব ঃ বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন প্রায় সব সরকার, রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা সহনশীলতার ছিটেফোটাও নেই।

৭.৪৩ বাংলাদেশে উত্তম সরকার প্রতিষ্ঠার সমস্যা সমাধানের উপায়

Measures to Remove Hindrances for the Best Government in Bangladesh

বাংলাদেশে উত্তম সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ

১। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঃ বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং তা ধরে রাখতে হবে গণতন্ত্র কীভাবে সফল হতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

২। সামরিক শাসন বিরোধী পদক্ষেপ ঃ বাংলাদেশে কোনো ক্ষমতালোভী ও উচ্চাভিলাষী সামরিক কর্মকর্তা যেন ক্ষমতা দখল ও গণতন্ত্র হত্যা করতে না পারে সেজন্য জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। এজন্য সংবিধানের ংশোধনী এনে সামরিক হস্তক্ষেপের সকল সম্ভাবনা দূর করতে হবে।

৩। দায়িত্বশীল সরকার ঃ উত্তম সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক সরকার গড়ে তুলতে হবে।

৪। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ দেশে যথার্থ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কাউকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অযথা হয়রানি বা আটক করা যাবে না। সব ধরনের কালা-কানুন বা নিবর্তনমূলক আইন বাতিল করতে হবে।
৫। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ঃ সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করতে হবে।
৬। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও সংবিধানের অভিভাবকরূপে বিচার বিভাগকে গড়ে তুলতে হবে।
৭। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঃ সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত না করে বিভাগ, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষমতার সুষম ও আইনানুগ বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে হবে।
৮। জনগণের আস্থা অর্জন ঃ সরকারকে কাজ-কর্ম দ্বারা জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে। জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া থেকে সরকারকে তথা সকল রাজনৈতিক দলকে বিরত থাকতে হবে।
৯। আমলাদেরকে নিয়ন্ত্রণ ঃ আমলাদের ওপর রাজনৈতিক নেতাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমলাদেরকে তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। আমলাদের মধ্যে জনহিতকর মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।
১০। স্বাধীন প্রচার মাধ্যম ঃ রেডিও, টেলিভিশনসহ সকল প্রচার মাধ্যমকে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। রেডিও টেলিভিশনকে শর্তসাপেক্ষে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। ১১ । সহনশীলতা ঃ সরকার, রাজনৈতিক দল অপরাপর সকল সংগঠনকে সহনশীল হতে হবে। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা মনোভাব ত্যাগ করে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে।

৭.৪৪ সরকারের অঙ্গসমূহ ঃ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ

Different Organs of Government : Legislature, Executive and Judiciary

সরকারের কাজ তিন প্রকারের, যথা ঃ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত, শাসন সংক্রান্ত এবং বিচার সংক্রান্ত । সরকারের তিনটি বিভাগ এ কাজ সম্পাদন করে থাকে। আইন প্রণয়নের দায়িত্ব (Rule making functions) যে বিভাগ পালন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। আইন বিভাগ প্রণীত আইনকে যে বিভাগ কার্যকর (Rule application Functions) করে তাকে শাসন বিভাগ বলে। যে বিভাগ আইনভঙ্গকারীর শাস্তি বিধান (Rule Adjudication) করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। অতএব, সরকারের বিভাগ তিনটি, যথাঃ ১. আইন বিভাগ, ২. শাসন বিভাগ এবং ৩. বিচার বিভাগ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগের মর্যাদা সর্বাধিক।

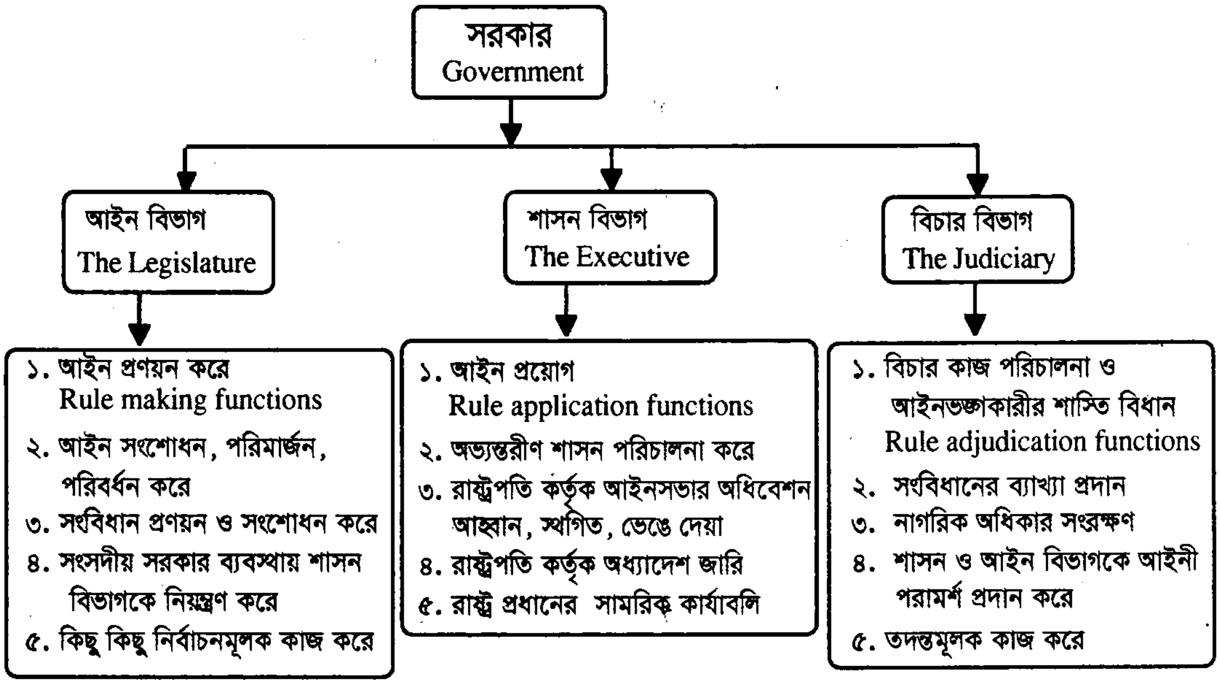

৭.৪৫ আইন সভা

The Legislature

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন সভার গুরুত্ব অপরিসীম। আইন সভা প্রণীত আইনের আলোকেই একটি দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়। আইন সভা প্রণীত আইনকে বাস্তবায়িত করার জন্যই শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আইন সভার সদস্যগণ হলেন জনপ্রতিনিধি । জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা আইনসভায় তুলে ধরেন। সরকারের সকল কাজে আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া সরকার আর্থিক কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। আইন সভা শাসন বিভাগকে সংগঠন করে, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুতও করে থাকে। আইন সভা দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও তা বাতিল বা সংশোধনও করতে পারে। সুতরাং আইনসভার মর্যাদা ও গুরুত্ব সীমাহীন।

৭.৪৬ আইন সভার সংগঠন

Organisation of the Legislature

পৃথিবীতে সব গণতান্ত্রিক দেশের আইনসভার সংগঠনের মাত্রা একরূপ নয়। গঠন কাঠামো, সদস্য সংখ্যা, সদস্যপদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, নির্বাচন পদ্ধতি, কার্যকালের মেয়াদ প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের আইনসভার সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রা বা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তবে গঠন কাঠামোর দিক থেকে বর্তমান সময়ের আইনসভাগুলো দু প্রকারের। যথা ঃ (১) এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ও (২) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় বলে এর জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। অপরদিকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে, আংশিক মনোনয়নের ভিত্তিতে কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে গঠিত হয়।

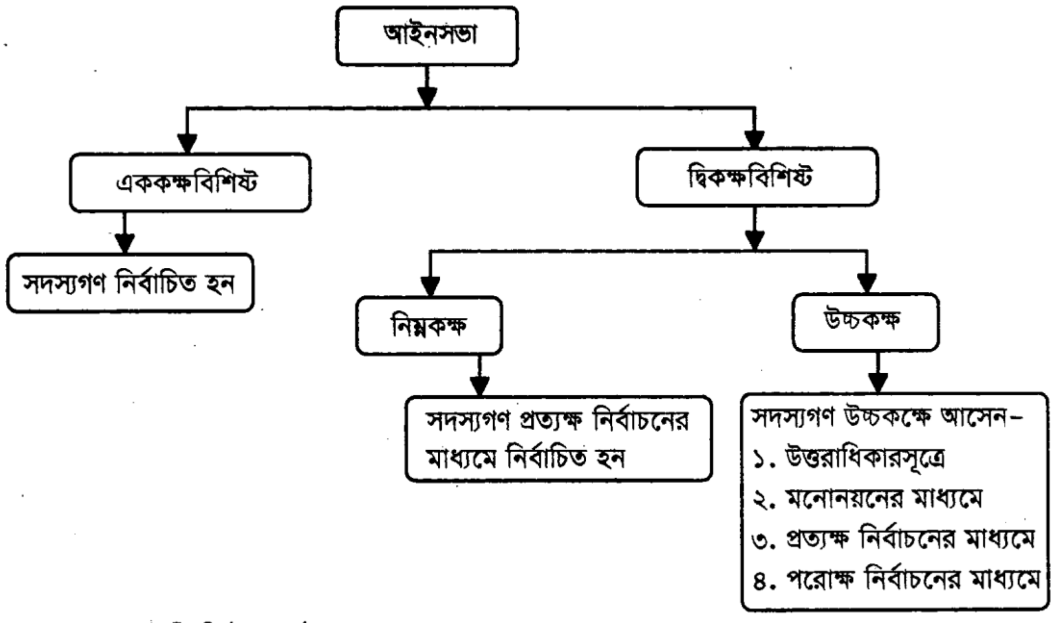

সূচিপত্র

৭.৪৭ এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা

Unicameral Legislature

একটি রাষ্ট্রের আইনসভা যখন একটি মাত্র কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হয় তখন তাকে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে। যেমন- বাংলাদেশের আইনসভা অর্থাৎ "জাতীয় সংসদ'। এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সদস্যগণ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ, তুরস্ক, নিউজিল্যান্ড, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে।

এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তি

Arguments in Favour of Unicameral Legislaturee

এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। অধ্যাপক লাস্কি, অধ্যাপক ম্যাকাইভার, জন স্টুয়ার্ট মিল, আবে সিয়ে প্রমুখ চিন্তাবিদ ও লেখক এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। এর পক্ষে যুক্তিগুলো নিম্নরূপঃ

১. **সহজ সরল গঠন প্রকৃতি** ঃ এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত সহজ ও সরল।

২. **পদ্ধতিগত সুবিধা** ঃ এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নির্বাচন ক্ষেত্রে একটি মাত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

৩. **প্রতিনিধিত্বের একই পদ্ধতি** ঃ প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিও গোটা দেশেই এক রকম।

৪. **দ্রুত আইন প্রণয়ন** ঃ দ্রুত আইন প্রণয়ন সম্ভব হয়। কেননা দ্বিতীয় কক্ষ না থাকায় আইন প্রণয়নে অযথা বিলম্ব ঘটে না।

৫. **বিপ্লবের সম্ভাবনা নেই** ঃ দ্রুত আইন প্রণয়ন এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হওয়ায় বিপ্লব বা অসন্তোষের সম্ভাবনা কম থাকে ।

৬. **নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্ব** ঃ এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সদস্যগণ সকলেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। সুতরাং তারা জনগণের প্রতি সব সময় শ্রদ্ধাশীল থাকে।

৭. **ব্যয়বহুল নয়** ঃ এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কম ব্যয় সাপেক্ষ। অযথা দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যদেরকে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হয় না।

৮. **বাহুল্য বর্জিত** ঃ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাহুল্য বর্জিত হয়। প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ও লেখক আবে সিয়ে তাই বলেছেন যে, "দ্বিতীয় পরিষদ যদি প্রথম পরিষদকে অনুসরণ করে তবে এটা অনাবশ্যক, আর যদি তা প্রথম পরিষদকে অনুসরণ না করে তবে এটা অনিষ্টকর।" (If the second chamber agrees with the first, it is superfluous, if it disagrees, it is pernicious.)

উপরোক্ত কারণে অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন যে, "বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন মেটাবার জন্য ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাই উপযুক্ত।" (The single chamber and magnificient legislative assembly seems best to answer the needs of the modern state.)

এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে যুক্তি

Arguments Against Unicameral Legislature

লর্ড ব্রাইস, জেমস মিল, হেনরি মেইন, উইলোবি, লর্ড অ্যাকটন, দুগুই, গেটেল প্রমুখ রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ও লেখক এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। যুক্তিগুলো নিম্নরূপঃ

১. **স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতা** ঃ বাধা দেয়ার কেউ না থাকায় এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় স্বৈরাচারী ও হঠকারিতামূলক আইন প্রণীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই জেমস মিল বলেন, "এককক্ষের হাতে ক্ষমতার মেরুকরণ কক্ষটিকে স্বৈরাচারী, অসংযমী ও দুনীতিপরায়ণ করে তোলে।"

২. ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী ঃ এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে পারে।

৩. অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণয়ন ঃ এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ভাবাবেগ, সাময়িক উত্তেজনা কিংবা জনমতের চাপে বিভ্রান্ত হয়ে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী, অকল্যাণকর, অযৌক্তিক ও অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়ন করতে পারে।

৪. সংখ্যালঘুদের স্বার্থ উপেক্ষিত ঃ এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রত্যক্ষ নির্বাচনভিত্তিক হওয়ায় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় না। কেননা এরূপ ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুরা প্রতিনিধি প্রেরণ করতে ব্যর্থ হয়।

৫. একঘেয়ে আলোচনা ঃ এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রতিনিধিগণ প্রায় সম-দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় বিতর্ক প্রাণবন্ত হয় না। এর ফলে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় না।

৬. জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির অনুপস্থিতি ঃ এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রত্যক্ষনির্বাচনভিত্তিক হওয়ায় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান না। ফলে আইনসভায় জ্ঞানী, গুণী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা না থাকায় এর উৎকর্ষতা হ্রাস পায়।

৭. যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অনুপযোগী ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অনুপযোগী। কেননা, এরূপ ব্যবস্থায় আইনসভার পক্ষে আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৮. ক্রমবর্ধমান কাজের চাপ ঃ বর্তমান সময়ে আইনসভায় কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় একটিমাত্র কক্ষের পক্ষে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

৭.৪৮ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা

Bi-cameral Legislature

দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে যখন আইনসভা গঠিত হয় তখন তাকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে। এরূপ আইনসভার প্রথম কক্ষকে নিম্নকক্ষ' এবং দ্বিতীয় কক্ষকে উচ্চকক্ষ' বলা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে।

অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি বলেন যে, "দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলতে সেরূপ আইনসভাকে বোঝায় যার দুটি কক্ষ আছে। প্রথম কক্ষটিকে নিম্ন কক্ষ' এবং দ্বিতীয় কক্ষটিকে উচ্চ কক্ষ' বলা হয়।" (Bi-cameral legislature is , that which has two house. The first one is known as the lower house and the second one as the upper house.)

প্রথম কক্ষ বা নিম্নকক্ষের গঠনপ্রণালি

পৃথিবীতে প্রতিটি রাষ্ট্রের নিম্নকক্ষই প্রতিনিধিত্বমূলক। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নকক্ষ গঠিত হয়। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক হওয়ার জন্যই সাধারণত নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে অধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী।

দ্বিতীয় কক্ষ বা উচ্চ কক্ষের গঠনপ্রণালি

উচ্চ কক্ষের গঠন-প্রকৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে; যেমন

১. ব্রিটেন বা যুক্তরাজ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে উচ্চকক্ষ গঠিত হয়।

২. কানাডার উচ্চকক্ষ অর্থাৎ সিনেটের সদস্যগণ মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্যপদ লাভ করে থাকেন।

৩. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চকক্ষ সিনেটের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

৪. ফ্রান্সের উচ্চকক্ষের সদস্যগণ পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্যপদ লাভ করে থাকেন।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তি

Arguments in Favour of Bi-cameralism

লর্ড ব্রাইস, জন স্টুয়ার্ট মিল, লেকি, হেনরি মেইন, লর্ড অ্যাকটন, দ্যুগুই, গেটেল প্রমুখ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার

পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন ঃ

১. যুক্তরাষ্ট্রের উপযোগী ঃ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। কেননা এর ফলে নিম্নকক্ষে নির্বাচিত সদস্যগণ জাতীয় স্বার্থ এবং উচ্চকক্ষে নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্যগণ আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষা করতে পারে।
২. স্বৈরাচার প্রতিরোধ ঃ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা এককক্ষের স্বৈরাচার প্রতিহত করে। লর্ড ব্রাইসের মতে, "সকল আইনসভারই স্বৈরাচারী হবার একটি অন্তর্নিহিত প্রবণতা আছে। সমক্ষমতাসম্পন্ন দুটি পরিষদ একে অপরের স্বৈরাচারিতাকে সংযত করতে পারে।"
৩. সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন ঃ আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হলে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে জনকল্যাণকামী ও সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন করে জনগণের স্থায়ী কল্যাণ সাধন করা যায়। লেকির মতে, "দ্বিতীয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণমূলক, সংস্কারমূলক ও সংযতকারী ক্ষমতা অপরিহার্য।"
৪. সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব ঃ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় সংখ্যালঘুসহ সকল শ্রেণির মানুষের পক্ষে প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব। এ জন্যই দ্যুগুই বলেছেন যে, "সেই আইনসভা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে যার এককক্ষ সমস্ত জনগণের এবং অপর কক্ষ বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করবে।"
৫. জনমতের প্রতিফলন ঃ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় জনমতের সুষ্ঠু প্রতিফলন হয়। এরূপ ব্যবস্থায় আইনসভার দুটি কক্ষের নির্বাচন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয় বলে প্রবাহমান জনমতের সুষ্ঠ প্রতিফলন ঘটে।
৬. ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ ঃ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা একটি মাত্র কক্ষের স্বৈরাচারিতা রোধ করে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে থাকে। লর্ড অ্যাকটন এ জন্যই বলেছেন যে, "আইনসভায় দ্বিতীয় কক্ষ হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ |"

৭. জাতীয় স্বার্থ ঃ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে আইন প্রণীত হয়। ভাবাবেগবশত আকস্মিকভাবে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কোনো আইন প্রণীত হতে পারে না।

৮. রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ঃ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে আলোচনা সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তা সংবাদপত্র, বেতার বা রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত হওয়ায় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বা শিক্ষার বিস্তার ঘটে ।

৯. জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষা ঃ বহুজাতি সমন্বিত রাষ্ট্রে সব জাতির নিজ নিজ জাতীয় ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য দ্বিতীয় কক্ষ উপযোগী।

১০. কাজের চাপ প্রশমন ঃ আইনসভার কাজের চাপ কমানোর জন্যও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রয়োজন।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে যুক্তি
Arguments Against Bi-cameral Legislature

জেরেমি বেন্থাম, আবে সিয়ে, হ্যারল্ড লাস্কি, ম্যাকাইভার, জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন ঃ

১. অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর ঃ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অনাবশ্যক এবং ক্ষতিকারক। এ প্রসঙ্গে আবে সিয়ে বলেছেন যে, "দ্বিতীয় কক্ষ যদি প্রথম কক্ষকে অনুসরণ করে তবে এটা অনাবশ্যক, আর যদি তা প্রথম পরিষদকে অনুসরণ না করে তবে তা অনিষ্টকর।" (If the second chamber agrees with the first, it is superfluous; if disagrees, it is pernicious.)
২. প্রগতি বিরোধী ঃ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রগতি বিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীল। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি এ প্রসঙ্গে যুক্তরাজ্যের লর্ডসভার সমালোচনায় বলেছেন যে, "গণতন্ত্র যেখানেই যখন আক্রমণাত্মক ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, সেখানেই লর্ডসভা আত্মরক্ষার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে।"

সূচিপত্র

৩. অগণতান্ত্রিক গঠন পদ্ধতি: অনেক দেশের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার গঠন পদ্ধতি অগণতান্ত্রিক। কানাডা ও যুক্তরাজ্যের উচ্চকক্ষ ধনশালী ও রক্ষণশীল অভিজাতদেরকে নিয়ে গঠিত হয়। কানাডায় তারা মনোনীত হন এবং যুক্তরাজ্যে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের নীতিতে উচ্চকক্ষের সদস্য হন।

৪. দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে : দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। এক বিভাগ অপর বিভাগকে শুধু সমালোচনা এবং একে অপরের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টায় লিপ্ত হতে পারে।

৫. সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা ঃ সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন নেই। কেননা সংবিধানের মাধ্যমেই তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. দলীয় ভিত্তি ঃ দলীয় ভিত্তিতে যখন আইনসভার কাজ চলে তখন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থাতেও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

৭. একই আইন প্রণয়নে অপ্রয়োজনীয় ঃ একই আইন প্রণয়নের জন্য দুটি কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রয়োজন নেই। কেননা একই আইন সম্পর্কে জনগণের ইচ্ছা দুই রকমের হতে পারে না। এ জন্যই ফ্রাঙ্কলিন বলেছেন যে, "দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বিপরীতমুখী গতিসম্পন্ন অশ্ব ও অশ্বযানেরই মতো।"

৮. দ্রুত আইন প্রণয়নে অসুবিধা: দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় দ্রুত আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না।

অধিকাংশ লেখকের মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাই উত্তম। আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রে দ্বিতীয় কক্ষ সৃষ্টি করে সরকারের কার্যকলাপকে সীমিত এবং চলার গতিকে মন্থর না করে দেওয়াই ভালো। তবে যদি দ্বিতীয় কক্ষের গঠন পদ্ধতি সংশোধন করে এর গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া যায় তাহলে এ ব্যবস্থাও খারাপ নয়।

৭-৪৯ এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আইনসভার সংগঠন
Organisation of Legislature in Unitary and Federal System

গ্রেট ব্রিটেন ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সাধারণত এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা লক্ষ করা যায়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ভালো। কেননা কোনো প্রদেশ, অঞ্চল বা এলাকার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইনসভার আলাদা কোনো কক্ষের প্রয়োজন নেই। অনেকেই মনে করেন যে, যেসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে সেখানে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা থাকাটা বাঞ্ছনীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা থাকলে নিম্নকক্ষে নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্যগণ আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। এজন্য পৃথিবীর সব যুক্তরাষ্ট্রেই দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। কিন্তু অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে, বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের নীতি অনুসারে গঠিত দ্বিকক্ষ অগণতান্ত্রিক। তাছাড়া দলীয় ভিত্তিতে যখন বর্তমানে সব যুক্তরাষ্ট্রেই আইনসভার কাজ চলছে তখন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার কোনো প্রয়োজন নেই।

৭.৫০ সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় আইনসভার সংগঠন
Organisation of Legislature in Parliamentary and Presidential of Govt. System

সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে এরূপ রাষ্ট্রগুলোতে কোথাও কোথাও এককক্ষবিশিষ্ট আবার কোথাও কোথাও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। গ্রেটব্রিটেন, ভারত, কানাডাসহ অনেক রাষ্ট্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। ঠিক তেমনি নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশসহ অনেক রাষ্ট্রে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। তবে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দলীয় শাসন এবং দলীয় ভিত্তিতেই আইনসভায় কাজকর্ম চলে। সেজন্য এখানে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাই উত্তম। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় যেমন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে, তেমনি এরূপ অনেক রাষ্ট্রে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাও রয়েছে। তবে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন প্রচলিত রয়েছে এবং এর পাশাপাশি সেখানে যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও প্রচলিত থাকে তবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রাখা

ভালো বলে অনেকে মনে করেন। আবার অনেকেই বলেন যে, যেহেতু পৃথিবীতে সব রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থাতেই দলীয় ভিত্তিতে আইনসভার কাজ চলে, সেহেতু দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অপ্রয়োজনীয়।

৭.৫১ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভার সংগঠন
Organisation of Legislature in Socialist System

পৃথিবীর প্রায় সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই বর্তমানে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো যদি আয়তনে বিশাল হয়, বহু জাতি, গোষ্ঠী নিয়ে যদি এরূপ রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, তাহলে তাদের সকলের আঞ্চলিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেহেতু একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে এবং ক্ষমতাসীন দলই যেহেতু রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে, শ্রেণি শোষণ ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব সেখানে থাকে না, সেহেতু সেখানে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রয়োজনীয়তা ততটা আর নেই।

৭.৫২ একনায়কতন্ত্রে ও সামরিকতন্ত্রে আইনসভার প্রকৃতি
Nature of Legislature in Dictatorship and Military Government

একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্র একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। উভয় ব্যবস্থাই গণতন্ত্রবিরোধী ও স্বৈরতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাতেই আইনসভা গুরুত্বহীন। একনায়কতন্ত্রে একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। আইনসভা থাকলেও তা নামমাত্র। আইনসভার নির্বাচন হয়, কিন্তু তা লোক দেখানো। আইনসভায় শুধুমাত্র একনায়কের নিজ দলের সদস্যগণ থাকায়, যে আলোচনা ও বিতর্ক হয় তা অনেকটা প্রহসন বা লোক দেখানো | একনায়ক পছন্দ করেন না এমন কোনো বিষয়ই আইনসভায় আলোচনা বা উত্থাপন করতে কোনো সদস্য সাহসী হন না।

সামরিকতন্ত্রে আইনসভার অবস্থা আরো করুণ। কেননা সামরিক শাসকগণ ক্ষমতায় এসেই আইনসভার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। অবশ্য অনেক দেশেই বর্তমানে সামরিক শাসকগণ নিজেদের শাসনকে বেসামরিকীকরণের বা বৈধকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন এবং গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে দিয়ে আইনসভার নির্বাচনও অনুষ্ঠান করছেন। কিন্তু সামরিক শাসনে আইনসভার নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় না। যে কোনো প্রকারেই হোক না কেন সামরিক শাসক তার নিজের গড়া কিংবা তাকে সমর্থন দানকারী দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে সাহায্য করেন। ফলে সামরিক শাসনে আইনসভার সদস্যগণ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে ভয় পান। আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয় না।

৭.৫৩ আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি
Powers and Functions of the Legislature

আইন বিভাগের কাজ প্রথমে ছকের সাহায্যে এবং পরে আলোচনা করে বোঝানো হলো ঃ

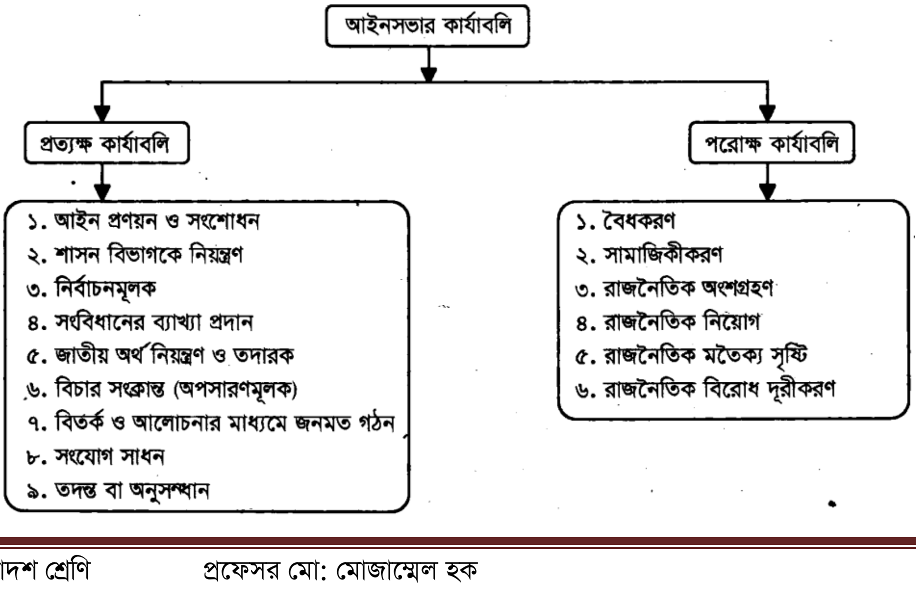

সূচিপত্র

১. আইন প্রণয়ন ঃ আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন । রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমুন্নত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে থাকে। আইনসভা শাসন পরিচালনার নীতি নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন ঃ আইনসভা সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনবোধে তা সংশোধন করে থাকে। স্বাধীনতা অর্জনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আইনসভাকে গণপরিষদে রূপান্তরিত করা হয়। গণপরিষদ ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধান রচনা করে। পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভাও সংবিধান প্রণয়ন এবং তা সংশো করে থাকে।

৩. সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান ঃ পৃথিবীতে অনেক দেশেই আইনসভা সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা সে দেশের সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করে থাকে।

৪. জাতীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণ ও তদারক ঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারসমূহ প্রতি আর্থিক বছরের শেষ দিকে পরবর্তী বছরের জন্য আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব বা বাজেট' আইনসভায় পেশ করে থাকে। আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক বাজেটের ওপর আলোচনা, সমালোচনা ও বিতর্কের পর তা গৃহীত হলে কার্যকর হয়।

৫. শাসনসংক্রান্ত ঃ আইনসভা অনেক দেশেই কিছু কিছু শাসন সম্পর্কিত কাজও করে থাকে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের সম্মতিক্রমেই সে দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে থাকেন। সিনেটের অনুমোদন ছাড়া সন্ধি, চুক্তি, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করা সে দেশের প্রেসিডেন্টের পক্ষে সম্ভব নয়।

৬. বিচারসংক্রান্ত ঃ অসদাচরণের অভিযোগে আইনসভা যে কোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে। ব্রিটিশ লর্ড সভা হচ্ছে সে দেশের সকল মামলার আপিল বিচারের চূড়ান্ত আদালত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা সে দেশের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদেরকে অভিযুক্ত করে অপসারিত করতে পারে।

৭. শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ ঃ সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। আইন সভা সাধারণত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বিতর্ক ও আলোচনা, নিন্দ প্রস্তাব আনয়ন, মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনাস্থ প্রস্তাব পাস করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৮. নির্বাচনসংক্রান্ত ঃ আইনসভা নির্বাচনসংক্রান্ত কাজও করে থাকে। বাংলাদেশ ও ভারতীয় রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট সভা উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করে এবং নিম্নকক্ষ বা প্রতিনিধিসভা রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করে।

৯. আলোচনা ও বিতর্ক ঃ আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কৌশল নির্ণয় প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভাসমূহে আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

১০. জনমত গঠনঃ আইনসভায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিতর্ক ও আলোচনা রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এর ফলে জনগণ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত হয়। এর ফলে সুস্থ জনমত গড়ে ওঠে ।

১১. অনুসন্ধানমূলক ঃ আইনসভা অনেক সময় জনগুরুত্বসম্পন্ন কোনো বিষয়ে কমিটি গঠন করে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

৭.৫৪ শাসন বিভাগ

The Executive

রাষ্ট্রের শাসনকাজ পরিচালনার দায়িত্ব যে বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে শাসন বিভাগ বলে। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করাই শাসন বিভাগের কাজ। ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলকে বোঝায়। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তা এবং তার মন্ত্রিপরিষদকে বোঝায়।

গঠন ও কার্যাবলির ভিত্তিতে শাসন বিভাগ দু ভাগে বিভক্ত; যথাঃ (১) রাজনৈতিক শাসক (Political Executive)

এবং (২) অ-রাজনৈতিক শাসক (Non-Political Executive)। শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। তারা তাদের সম্পাদিত কার্যাবলির জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনকারী স্থায়ী, বেতনভোগী কর্মচারীরা হলো শাসন বিভাগের অ-রাজনৈতিক অংশ।

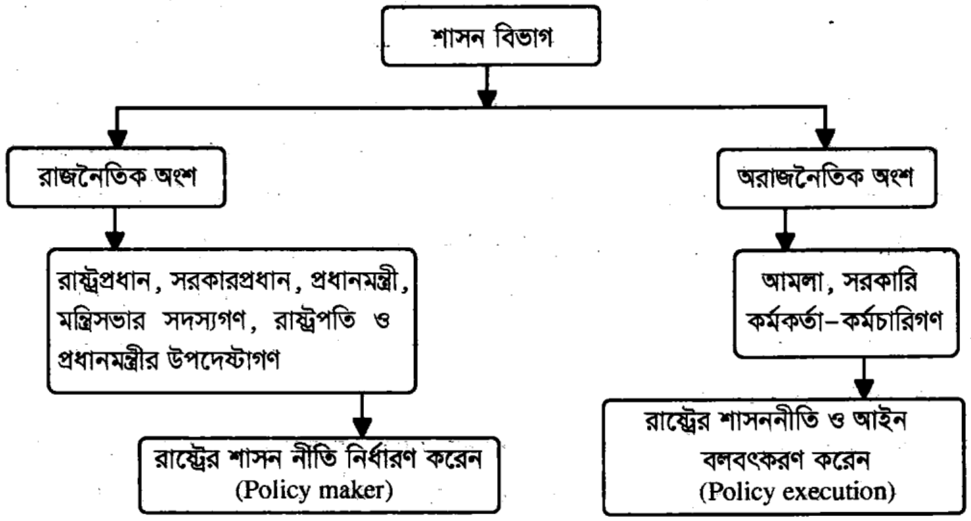

পৃথিবীতে সব রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের সংগঠন একরূপ নয়। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

ক. নামমাত্র ও প্রকৃত শাসক ঃ অনেক রাষ্ট্র রয়েছে যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান নামমাত্র শাসক। ব্রিটিশ রাজা বা রানি, জাপানের রাজা, ভারতের ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হলেন এরূপ নামমাত্র শাসক। এঁরা রাজত্ব করেন বা এঁদের নামে দেশ শাসিত হয়। তবে এঁরা দেশ শাসন করেন না (reigns but does not govern)। এসব রাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। মূলত প্রধানমন্ত্রীই প্রকৃত শাসক বা সরকারপ্রধান।

খ. নিয়মতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক ও ধর্মতান্ত্রিক শাসকঃ যে সব রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে আবার সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্রও রাখা হয়েছে সেসব দেশের প্রধান শাসক হচ্ছেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক। এঁদের নামে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালিত হলেও এরা প্রকৃত শাসক নন। তাদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সাংবিধানিক ও আইনানুগ। ব্রিটিশ রাজা বা রানি, জাপানের রাজা, ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক। গ্রেট ব্রিটেন, জাপানসহ বেশ কিছু রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও রাজতন্ত্রকে বহাল রাখা হয়েছে। তবে এসব রাজার পদকে সাংবিধানিক ও নামমাত্র করা হয়েছে। প্রকৃত শাসক হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভা।

সূচিপত্র

গ. ধর্মতান্ত্রিক শাসক ঃ মধ্যযুগে ধর্মের ছিল অপ্রতিহত প্রাধান্য। ধর্মগুরু বা ধর্মীয় প্রধান মানুষের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনই নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজা-বাদশাগণও ছিলেন তাদের অনুগত। কিন্তু গণতন্ত্রের বিকাশের ফলে ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সেদিন আর নেই। ভ্যাটিকান সিটির মতো রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান একাধারে প্রধান শাসক এবং প্রধান ধর্মীয় গুরু। ইরানে অবশ্য ধর্মতান্ত্রিক প্রধান সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধান নন। তবে ইরানে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রের সব কিছুর ওপর ধর্মীয় প্রধানের প্রভাব অসামান্য।

ঘ. সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত রাষ্ট্রের শাসকঃ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান নামমাত্র শাসক প্রকৃত শাসক হলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপ্রধানের নামে সব কিছু পরিচালিত হলেও প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভা।

অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় যিনি রাষ্ট্রপ্রধান, তিনিই সরকারপ্রধান রাষ্ট্রপতি একাধারে দেশের প্রবন শাসক এবং সরকারপ্রধান। তাকে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকলেও এর সদস্যগণকে তিনি যেকোনো সময় নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন।

ঙ. একক ও সমষ্টিগত শাসক ঃ শাসন বিভাগ যখন এক ব্যক্তির নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় তখন তাকে একক পরিচালক বা শাসক বলা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের শাসকগণ হলেন একক শাসক।

অপরদিকে, এক ব্যক্তির পরিবর্তে যখন শাসন ক্ষমতা সমমর্যাদা ও সমক্ষমতাসম্পন্ন বহু ব্যক্তির হাতে অর্পিত থাকে তখন তাকে সমষ্টিগত শাসক' (Plural executive) বলা হয়। প্রাচীন এথেন্স, স্পার্টা ও প্রজাতান্ত্রিক রোমে এরূপ শাসন প্রচলিত ছিল। সুইজারল্যান্ডে এখনোও এরূপ সমষ্টিগত শাসকের শাসন লক্ষ করা যায়।

চ. সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের শাসন বিভাগের সংগঠন ঃ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একদলীয় ও সর্বাত্মক শাসন প্রচলিত। এরূপ রাষ্ট্রে কমুযনিষ্ট পার্টির প্রধানের হাতে সর্বময় ক্ষমতা থাকে। এরূপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী কমুযনিষ্ট পার্টির প্রভাবশালী নেতা। আবার লেনিন, স্ট্যালিনের সময় তারাই ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের "একক শাসক"। চীনে মাওসেতুং ছিলেন একক শাসক। তবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসকগণ নিজ দলের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। একনায়কতন্ত্রে একদলীয় শাসন প্রচলিত থাকে। দলীয় প্রধানই রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারপ্রধান। কাজেই একনায়কতন্ত্রে একক শাসকই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাকে কারো নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। সামরিকতন্ত্রে এক ব্যক্তিই সর্বেসর্বা। তার আদেশই আইন। তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা । তাকে কারো নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। তিনি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সরকারপ্রধান।

৭.৫৬ শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

Powers and Functions of the Executive

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদন করে থাকে ঃ

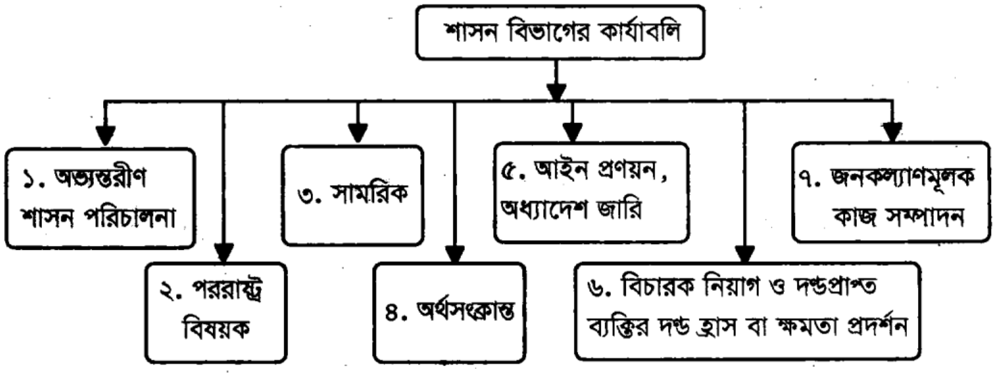

সূচিপত্র

১. অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা ঃ শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর প্রদান, বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ ও প্রদান; প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন অধ্যাদেশ প্রভৃতি প্রণয়ন করে থাকে।

২. পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলিঃ বর্তমান সময়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রই অন্য দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে এবং অন্য দেশ কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে নিজ দেশে গ্রহণ করে থাকে। এ ছাড়াও সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সদস্যপদ গ্রহণ ও সেখানে নিজ দেশের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। এসব কাজকে কূটনৈতিক বা পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কাজ বলে। এসব কাজের দায়িত্ব পালন করে শাসন বিভাগের অন্তর্গত পররাষ্ট্র দপ্তর (Department of External Affairs)

৩. সামরিক কার্যাবলি ঃ যুদ্ধ ঘোষণার বিষয়টি অনেক সময় আইন বিভাগের সম্মতির ওপর নির্ভর করলেও যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব এককভাবে শাসন বিভাগের। রাষ্ট্রপ্রধান পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনীরও সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander of the Armed Forces) সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি সেনা কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদচ্যুত, সেনাবাহিনী - সংগঠন ও পরিচালনা করে থাকেন। রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজনবোধে সামরিক আইনও জারি করতে পারেন।

৪. অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলি ঃ সরকারের শাসন বিভাগ যেমন অর্থ ব্যয় করে তেমনি এ বিভাগকে অর্থ সংগ্রহও করতে হয়। আইনসভার সম্মতিক্রমে শাসন বিভাগ সাধারণত কর ধার্য, সেবামূলক কাজ সম্পাদন এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে অর্থ সংগ্রহ এবং তা ব্যয় করে থাকে।

৫. আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্যাবলিঃ শাসন বিভাগ কিছু কিছু আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে থাকে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে। কেননা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য। এছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভার অধিবেশন আহবান, স্থগিত এবং প্রয়োজনবোধে আইনসভা ভেঙেও দিতে পারেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকা কালে রাষ্ট্রপ্রধান জরুরি আইন বা অধ্যাদেশ (ordinace) জারি করতে পারেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিশেষ কোনো আইন প্রণয়নে বাধা দিতে পারেন।

৬. বিচারসংক্রান্ত কার্যাবলি ঃ অধিকাংশ রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিদেরকে নিয়োগ করে থাকেন। কোনো বিচারালয় কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমা প্রদর্শন, কিংবা তার দণ্ড হ্রাস করতে পারেন।

৭. জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি ঃ আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ জনস্বাস্থ্য, জন শিক্ষা, কৃষ্টি, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কাজে লিপ্ত রয়েছে।

৭.৫৭ বিচার বিভাগ

The Judiciary

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে তাকে বিচার বিভাগ বলে ।

সিজউইক (Sidgwick) এর মতে, বিচার বিভাগ হচ্ছে সেই বিভাগ যা আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে।" ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বা ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দিলে বিচার বিভাগ আইনের আলোকে তার মীমাংসা ও ন্যায়বিচার করে থাকে ।

যে কোনো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি দেশের শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের দক্ষতাও অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। লর্ড ব্রাইস এ জন্যই বলেছেন যে, "বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা কোনো সরকারের যোগ্যতা বিচার করার অধিকতর উপযোগী মানদণ্ড আর নেই।" বিচার বিভাগের অস্তিত্ব ছাড়া সুসভ্য সামাজিক জীবন কল্পনা করা যায় না। সমাজজীবনে সম্ভাব্য সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রধান শক্তিই হলো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগ আছে বলেই একটি দেশের সরকার সংবিধান নির্দেশিত পথে চলতে বাধ্য হয়। সরকার স্বৈরাচারী হতে পারে না। কোনো কোনো দেশে বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে সে দেশের সাংবিধানিক সরকারের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করে। একটি জাতির নৈতিক মান বৃদ্ধি এবং ন্যায়বিচার সংরক্ষণে বিচার বিভাগের ভূমিকা অসামান্য। এ জন্যই অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন যে, "একটি রাষ্ট্র কীভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করে তার দ্বারা সে রাষ্ট্রের নৈতিকতার মান সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়।" দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের পাশাপাশি প্রত্যেক দেশের বিচার বিভাগই রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে সমুন্নত রেখে জনজীবনে সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করে এবং স্থিতিশীল শাসন কায়েম করে। এ জন্যই সিজউইক বলেছেন যে, "রাজনৈতিক সভ্যতায় একটি জাতির অবস্থান নির্ণয়ে বিচার বিভাগের ভূমিকা যাচাই করার থেকে আর কোন মাপকাঠি শ্রেষ্ঠ নয়। " (In determining a nation's rank in political civilisation, no test is more decisive than the degree in which justice, as defined by law, is actually realised in its judicial administration.)

৭.৫৮ বিচার বিভাগের সংগঠন

Organisation of the Judiciary

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের গঠন কাঠামো স্তরভিত্তিক বিচার বিভাগের শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে গ্রাম আদালত, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সালিসী আদালত। নিম্নে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ -

১. নিম্ন আদালত ঃ অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী নিম্ন আদালত দুভাবে বিভক্ত; যথা (১) ফৌজদারি আদালত ও (২) দেওয়ানি আদালত। ফৌজদারি আদালতে অপরাধ সংক্রান্ত বিবাদের বিচার হয়। দেওয়ানি আদালতের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদগুলোর বিচার হয়। ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ফৌজদারি মামলার বিচার করে থাকেন। এসব ম্যাজিস্ট্রেট আদালত হতে দায়রা জজের আদালতে আপিল পেশ করা যায়। পূর্বে উপজেলা পর্যায়ের বিচারের জন্য মুন্সেফ আদালত' গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে সহকারী জজগণ উপজেলার বিচারের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও জেলা সদরে "সাব-জজ আদালত" রয়েছে, যা বর্তমানে "যুগ জেলা জজ আদালত নামে অভিহিত। যুগ জেলা জজগণ যখন ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করেন তখন তারা "সহকারী দায়রা জজ" হিসেবে অভিহিত হন। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার সালিসী আদালত।

২. জেলা জজের আদালত বা মাধ্যমিক স্তরের আদালত ঃ মাধ্যমিক স্তরের আদালত হলো দেওয়ানি মামলার জন্য জেলা জজের আদালত এবং ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির জন্য "দায়রা বা সেসন জজ আদালত।"-এছাড়া রয়েছে অতিরিক্ত জেলা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালত। কিন্তু অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজগণ সরাসরি কোনো মামলা গ্রহণ করেন না। জেলা জজ প্রেরিত মামলার বিচারই শুধু তারা করে থাকেন। নিম্ন আদালত হতে প্রদত্ত রায় পুনর্বিবেচনার জন্য মধ্যস্তরের অর্থাৎ জেলা জজ আদালতসমূহে আপিল করা হয়। এসব আদালতে বড় বড় মামলার প্রথম শুনানী ও বিচার হয়। অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং দায়রা জজের প্রধান আদালত আসামীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করতে পারে। তবে এরূপ মৃত্যুদণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের অনুমোদন লাভ করতে হয়।

সূচিপত্র

বর্তমানে "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত” নামে বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ আদালত দায়রা জজ আদালতের সমমানের।

৩. উচ্চ আদালত: সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। এই আদালত “আপিল বিভাগ” ও “হাইকোর্ট বিভাগ” নিয়ে গঠিত। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ আপিল বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। অন্যান্য বিচারকগণ হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। বিরাট অংকের মূল্য জড়িত মামলা এবং সংবিধানের গুরুতর প্রশ্ন জড়িত মামলার প্রথম শুনানী এই সর্বোচ্চ আদালতে গ্রহণ করা হয়। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানী গ্রহণ ও বিচার করা হয় সুপ্রিম কোর্টে।

৭.৫৯ বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি

Methods of Appointment of Judges

নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতিতে বিচারকদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে; যথা ঃ (১) জনগণ বা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচন, (২) আইনসভা কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচন এবং (৩) শাসন বিভাগ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করা হলো ঃ

১. জনগণ বা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রত্যক্ষ নির্বাচন ঃ ফ্রান্সে জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। তবে ফ্রান্সে এই নিয়োগ পদ্ধতি এখন আর প্রচলিত নেই। বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কতগুলো অঙ্গরাজ্যে, সুইজারল্যান্ডের অধঃস্তন আদালতসমূহে এরূপ নিয়োগ পদ্ধতি এখনও প্রচলিত রয়েছে।

জনগণ কর্তৃক বিচারক নির্বাচন ত্রুটিপূর্ণ। কেননা জনগণ দলীয় প্রচারে ও ভাবাবেগে বিভ্রান্ত হয়ে অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে পারে। যোগ্য ব্যক্তিগণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী নাও হতে পারে। এরূপ পদ্ধতি সম্পর্কে **হ্যারল্ড লাস্কি** বলেছেন যে, “বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ নির্বাচন হচ্ছে ব্যতিক্রমহীনভাবে নিকৃষ্ট " (of all methods of appointment, that of election by the people at large, is without exception the worst.)

২. আইনসভা কর্তৃক পরোক্ষ নির্বাচন ঃ সুইজারল্যান্ডের বিচারকগণ আইনসভা কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তবে অনেকেই এরূপ নিয়োগ পদ্ধতি সমর্থন করেন না। কেননা এর ফলে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত ব্যক্তিরাই শুধু বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হবেন এবং নিজ দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করবেন।

৩. শাসন বিভাগ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ ঃ শাসন বিভাগ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি বলে স্বীকৃত। এর ফলে বিচারকগণের পক্ষে রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী বা জনগণের প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারকার্য সম্পাদন করা সম্ভব। এরূপ পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিদেরকে নিয়োগ করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে বিচারপতিদের দ্বারা গঠিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বা সুপারিশকৃত লোককেই রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক বিচারক পদে নিয়োগ করা উচিত।

৭.৬০ বিচার বিভাগের কার্যাবলি

Functions of the Judiciary

বিচার বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

১. বিচারসংক্রান্ত কাজ ঃ বিচার বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রয়োগ করা। বিচার বিভাগ বিভিন্ন মামলায় রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে থাকে।

২. আইনের ব্যাখ্যা ঃ বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ হচ্ছে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান । বিচারকগণ যদি আইনসভা প্রণীত কিংবা প্রথাগত আইনের ভাষাকে অস্পষ্ট বা পরস্পর-বিরোধী বলে মনে করে তাহলে এর ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। আইনের এই ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে নজির বা আইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩. আইন প্রণয়নমূলক কাজ ঃ বিচারকগণ কোনো মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে যদি মনে করেন যে, মামলাটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণীত হয়নি, তাহলে তারা নিজেদের ন্যায়বোধ ও সুবিবেচনা প্রয়োগ করে আইনটির ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা নতুন আইন তৈরি করে মামলাটির বিচার নিষ্পত্তি করতে পারেন। বিচারক প্রণীত এরূপ আইন বা আইনের ব্যাখ্যাকে পরবর্তী সময়ে নজির হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এসব আইনকে বিচারক প্রণীত আইন' (Judge-made laws) বলে।

৪. সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রাধান্য রক্ষণসংক্রান্ত কাজ ঃ বিচার বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের অভিভাবক। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে কেন্দ্র ও অঙ্গরাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত বিচারপতি হিউজেস বলেছেন, “আমরা একটি সংবিধানের অধীন, কিন্তু বিচারকগণ যা বলেন, তাই সংবিধান। " (we are under a constitution, but the constitution is what the judges say it is.)

৫. নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ঃ বিচার বিভাগ নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠান যদি সংবিধানে লিপিবদ্ধ নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে বিচার বিভাগ তা প্রতিহত করে।

৬. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ঃ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বিচার বিভাগের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিচার বিভাগ মামলা পরিচালনায় সত্য অনুসন্ধানের জন্য নথিপত্র তলব ও সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করে অপরাধীর শাস্তি প্রদান করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পবিত্র কর্তব্য পালন করে থাকে।

৭. পরামর্শদান সংক্রান্ত কাজ ঃ আইনের জটিল প্রশ্ন নিরসনে কিংবা সংবিধানসংক্রান্ত জটিল প্রশ্নে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের নিকট পরামর্শ চাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ সঠিক পরামর্শ প্রদান করে আইনগত ও সাংবিধানিক জটিলতা নিরসনে সাহায্য করে থাকে।

৮. তদন্তসংক্রান্ত কাজ ঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের সম্পত্তি ও জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করা। এ জন্য বিচার বিভাগ জোরজবরদস্তিমূলক অপরাধ এবং দুর্ঘটনার তদন্ত করে থাকে।

৯. শাসনসংক্রান্ত কাজ ঃ বিচার বিভাগ নিজ বিভাগে কর্মচারী নিয়োগ, নাবালকদের সম্পত্তি দেখাশোনা এবং নাবালকদের জন্য অভিভাবক নিয়োগ, লাইসেন্স প্রদান এবং দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদায়কারীর ভূমিকা পালন করে থাকে।

৭.৬১ প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ
Separation of Judiciary from the Executive

বর্তমানে শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিযুক্ত হন। অনেক রাষ্ট্রেই সরকারপ্রধান ও প্রভাবশালী শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ বিচার বিভাগের ওপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে থাকেন। বাংলাদেশসহ অনেক দেশে জেলা ও থানা পর্যায়ে আমলা-প্রশাসকগণ বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও পরিচালনা করে থাকেন। এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয়। বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। যথার্থ আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় না।

বর্তমানে প্রায় সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, চিন্তাশীল ব্যক্তি, আইনজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবিগণ মনে করেন যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিচার বিভাগকে অবশ্যই প্রশাসন বা শাসন বিভাগ থেকে

পৃথক করতে হবে। শাসন বিভাগ বা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠার দাবি বর্তমানে সর্বজনীন দাবিতে পরিণত হয়েছে। এজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ

১. বিচার বিভাগকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

২. কেন্দ্র হতে দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিচার বিভাগের সব স্তরে বিচার বিভাগীয় ক্যাডারের লোক নিয়োগ করতে হবে।

৩. স্থায়ী বিচারকমণ্ডলীর সুপারিশ ছাড়া সর্বোচ্চ বিচারালয়ে কোনো ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা যাবে না।

৪. প্রশাসনিক আইন ও প্রশাসনিক আদালত ব্যবস্থা রহিত করতে হবে।

৫. যথার্থ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ংলাদেশ প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু অতীতে এ নিয়ে কোনো সরকারই আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়নি। অতি সম্প্রতি প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক ও স্বাধীন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.৬২ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

Independence of the Judiciary

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের ক্ষমতা বা স্বাধীনতা। স্বাধীন বিচার বিভাগ বলতে তাই শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত বিচার বিভাগকে বোঝায়।

কেন্ট (Kent) বলেন, "বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় এ বিভাগের নিরপেক্ষতা ও অন্য বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকা।"

বিচারপতি আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন (A. Hamilton) বলেন, "বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হলো সরকারের অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপমুক্ত হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারের রায় ঘোষণা করা।"

সিজউইক (Sidgwick) এর মতে, "সম্পূর্ণরূপে প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীন থেকে ন্যায়পরায়ণতা ও সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে নিরপেক্ষতার নীতি অনুযায়ী বিচার কাজ সম্পন্ন করাকেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে।" গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব অসীম।

গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য যে সকল শর্ত পূরণ করতে হয় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কেননা ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ, আইন ভঙ্গকারীর শাস্তিবিধান, সংবিধানের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো বিচার বিভাগ সম্পাদন করে থাকে। **লর্ড ব্রাইস** এ জন্যই বলেছেন যে, "বিচার বিভাগের কর্মদক্ষতা অপেক্ষা সরকারের উৎকর্ষ বিচারের আর কোনো শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড নেই!" (There is no better test of the excellence of a government than the efficiency of its judicial system.)

বিচার বিভাগকে তাই স্বাধীন, দুর্নীতিমুক্ত ও নিরপেক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা বিচারকরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়লে কিংবা চাপ ও ভয়-ভীতির শিকার হলে ন্যায়বিচার পদদলিত হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে ধনী, সবল ও দুষ্টরাই টিকে থাকবে; দুর্বল, দরিদ্র ও নিরীহ মানুষ তাদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত হতে বাধ্য হবে। ন্যায়বিচারের বাতি নিভে গেলে নিশ্চিত ও ভয়াবহ অন্ধকারের সৃষ্টি হবে-গণতন্ত্র তখন শূন্যগর্ভ তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হবে। এ জন্য গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সবার আগে প্রয়োজন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা এবং তা সযত্নে সংরক্ষণ করা।

সূচিপত্র

৭.৬৩ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

Safeguards of the Independence of Judiciary

১. বিচারকদের যোগ্যতা ঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইনজ্ঞ, সৎ সাহসী এবং দলীয় রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন ব্যক্তিদেরকে বিচারপতি পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। অধ্যাপক গার্নার এজন্যই বলেছেন যে, "বিচারকগণ যদি জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধের অভাবে রায় দিতে অসমর্থ হন তবে বিচার বিভাগ যে উচ্চ লক্ষ্য সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা রক্ষা হবে না।" (If the judge, lack wisdom, Probity and freedom of decision, the high purposes for which the judiciary is established can not be secured.)

২. বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতি ঃ বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতিই উত্তম। এক্ষেত্রে একটি স্থায়ী বিচারকমণ্ডলীর কমিটির সুপারিশক্রমে শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারক নিয়োগ করা উচিত। ৩. বিচারকগণের কার্যকাল ঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধান প্রয়োজন। কার্যকালের স্থায়িত্ব নিশ্চিত থাকলে বিচারকগণ নির্ভীক ও সততার সাথে বিচারকাজ সম্পাদন করতে পারবেন।

৪. বিচারকগণের অপসারণ ঃ বিচারপতিদের অপসারণের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এক্ষেত্রে আইনসভা কর্তৃক অভিশংসন প্রস্তাব (Impeachment motion) এবং বিচার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আদেশে বিচারকদেরকে অপসারণ করা উচিত ।

৫. বিচারকদের উপযুক্ত বেতন ভাতাদি এবং সামাজিক মর্যাদা ঃ বিচারকদের জন্য আকর্ষণীয় বেতন, ভাতাদি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিত। এর ফলে তারা সৎ ও নির্লোভ থাকবে। তারা হীনমন্যতাবোধে ভুগবে না। ভবিষ্যতে সৎ ও মেধাবী আইনজ্ঞগণ বিচারক হতে আগ্রহী হবেন।

৬. পদোন্নতি ঃ বিচারকদের কর্মদক্ষতা ও বৃদ্ধির জন্য পদোন্নতির বিধান থাকতে হবে। সময়মত পদোন্নতি না পেলে বিচারকগণ হতাশায় ভুগবেন। তবে পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতা দুটোকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

৭. বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য ঃ এরিস্টটল থেকে মন্টেস্কু পর্যন্ত অনেক চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বলেছেন যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ না থাকলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার সংরক্ষিত হয় না। লাস্কির মতে, "স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য অত্যাবশ্যক।"

৮. জনগণ ও রাজনীতিবিদদের আগ্রহ ঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য জনগণ ও রাজনীতিবিদদের আগ্রহ থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চাপ প্রয়োগ ও আন্দোলন করতে হবে। জনমত গড়ে তুলতে হবে।

৯. জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস ঃ বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা, আস্থা ও বিশ্বাস অটুট রাখা এবং তা বৃদ্ধি করার দায়িত্ব বিচারকগণেরই। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অটুট থাকলে ক্ষমতাসীন শাসকগণ বিচারকদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহসী হবেন না।

৭.৬৪ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি দেশের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ণয়ের জন্য বিচার বিভাগের দক্ষতা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। বিচার বিভাগের অস্তিত্ব

ছাড়া সুসভ্য সামাজিক জীবন কল্পনা করা যায় না। সমাজজীবনে সম্ভাব্য সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার নির্যাতন, নিপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রধান শক্তিই হলো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগ আছে বলেই একটি দেশের সরকার সংবিধানের নির্দেশিত পথে চলতে বাধ্য হয়। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই বিচার বিভাগ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে সমুন্নত রেখে স্থিতিশীল শাসন কায়েম করে এবং জনজীবনে সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।

স্বাধীনতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হলো আইনের শাসন। অধ্যাপক এ.ভি. ডাইসি-এর মতে, আইনের শাসনের অর্থ হলো- (ক) আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান, (খ) সকলের জন্য একই ধরনের আইন থাকবে, (গ) বিনা অপরাধে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না, (ঘ) বিনা বিচারে কাউকে আটক করা যাবে না, (ঙ) অভিযুক্তকারীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে এবং (চ) সকল মানুষের জন্য অভিন্ন বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যথার্থ আইনের শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা আইন না থাকলে যেমন অনাচার সৃষ্টি হয় তেমনি আইন না মানলে সমাজ ও রাষ্ট্রে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। অনেক দেশেই আইন আছে কিন্তু তার প্রয়োগ নেই। জনগণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। এজন্যই বলা হয় যে, যথার্থ আইনের শাসন না থাকলে নাগরিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অধিকার ও সাম্য বলতে কিছুই থাকে না।

তবে আইনের শাসন কথাটি শুধু মুখে মুখে স্বীকার বা সংবিধানে সন্নিবেশিত করলেই হবে না, এর বাস্তব প্রয়োগও ঘটাতে হবে। এটা সম্ভব স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গড়ে তোলার মাধ্যমে। এজন্যই সিজউইক বলেছেন যে, রাজনৈতিক সভ্যতায় একটি জাতির অবস্থান নির্ণয়ে বিচার বিভাগের ভূমিকা যাচাই করার থেকে আর কোনো মাপকাঠি শ্রেষ্ঠ নয়।”

৭.৬৫ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক

সরকারের কাজ তিন প্রকারের, যথা আইন প্রণয়ন করা, শাসন কাজ পরিচালনা করা এবং বিচার করা। সরকারের তিনটি বিভাগ এ কাজ সম্পাদন করে থাকে। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ সে আইন প্রয়োগ করে এবং বিচার বিভাগ আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে থাকে। এ তিনটি বিভাগের সমন্বয়ে সরকার গঠিত হয়।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে আইনসভার আস্থা-অনাস্থার ওপর। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। বাংলাদেশ, ভারতের মতো রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিকেও আইনসভা নির্বাচন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারি কর্মচারী নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর প্রদান তাদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ ও প্রদান, প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন ও অধ্যাদেশ প্রণয়ন প্রভৃতি কাজ করে থাকে। বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও এগুলোর সদস্যপদ গ্রহণ এবং সেখানে প্রতিনিধি প্রেরণ করা শাসন বিভাগের কাজ। এমনকি শাসন বিভাগ কিছু কিছু আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কাজও করে থাকে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে। কেননা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণ আইনসভারই সদস্য। এছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভার অধিবেশন আহবান, স্থগিত ও প্রয়োজনবোধে ভেঙে দিতে পারেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোনো আইন প্রণয়নে বাধা দিতে পারেন। সেদেশে রাষ্ট্রপতির মনোনয়নসমূহ সিনেট অনুমোদন করে থাকে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের সাথে সরকারের অন্য দুটি বিভাগের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অনেক রাষ্ট্রেই বিচার বিভাগ ন্যায়নীতির মাধ্যমে অনেক সময় আইন প্রণয়ন করে। একাধিক আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়েও

বিচারকগণ নতুন নতুন আইনের সৃষ্টি করেন। সংবিধানসম্মত না হলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের যে কোনো সিদ্ধান্ত ও কংগ্রেস প্রণীত আইনকে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল ঘোষণা করতে পারে। সেদেশে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি' (Cheaks and Balance) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে সরকারের কোনো বিভাগ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। বরং এর ফলে তিনটি বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয়েছে।

৭.৬৬ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

Separation of Power : Theoritical Explanation

সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে, যথাঃ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ সরকারের এ তিনটি বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করে দেয়া। এক বিভাগের কাজ অন্য বিভাগের কাজ থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র হবে। প্রতিটি বিভাগ পৃথক বা স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হবে। প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে।

সুতরাং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অর্থ হলো সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্র বা আলাদাভাবে সংগঠিত করা এবং এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করা। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

৭.৬৭ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তাগণ ও তাদের মতামত

Exponents of Separation of Power Theory and Their Views

সরকারের ক্ষমতাকে তিনটি বিভাগের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার চিন্তাভাবনা শুরু হয় প্রাচীনকাল থেকেই। তখনও এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারের বিশেষ কোনো বিভাগ, সংগঠন বা ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা দেয়া। সে উদ্দেশ্য আজও অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে আধুনিক চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে, সরকারের কোনো একটি বিভাগের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার প্রবণতা রোধ করে নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করাই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য ।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক **এরিস্টটল** রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে (১) আলোচনামূলক (Deliberative), (২) শাসন সম্পর্কীয় (Magisterial), (৩)বিচার সংক্রান্ত (Judicial)–এ তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, রাষ্ট্রের তথা সরকারের ক্ষমতাকে উক্ত তিন ভাগে বিভক্ত করাই উত্তম। তার মতে, "এই তিন ক্ষমতা একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত হলে শাসন কাজের নিপুণতা হ্রাস পেতে পারে।"

মধ্যযুগে পাদুয়ার **মার্সিলিও** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, "শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের ক্ষমতা বিভক্ত হওয়া উচিত বা বাঞ্ছনীয়।"

প্রখ্যাত ফরাসি **চিন্তাবিদ জ্যা বোদার** মতে, সরকার যে ধরনেরই হোক না কেন তার ক্ষমতা তিন ভাগে বিভক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু তাই নয়, সব বিভাগকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত। ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই শুধু নয়, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্যও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ প্রয়োজন।

১৭৪৮ সালে ফরাসি দার্শনিক **মন্টেস্কু** তার "The Spirit of Laws" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে সর্বপ্রথম পরিপূর্ণভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির আধুনিক ব্যাখ্যা দান করেন। মন্টেস্কুর মতে, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে একচেটিয়া সরকারি ক্ষমতা প্রদান ঠিক নয়। তার মতে, এক বিভাগের ক্ষমতা দিয়ে অন্য বিভাগের ক্ষমতা সংযত ও

সীমিত করতে হবে। কোনো বিভাগ তার নিজস্ব এখতিয়ারের বাইরে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চাইলে অন্য বিভাগ তা প্রতিরোধ করবে। মন্টেস্কু বলেন, "সরকারের তিন ধরনের ক্ষমতা অবশ্যই পৃথক হবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা এমনভাবে ব্যবহৃত হবে যেন একটি অপরটির সাথে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষা করে। " (The three powers then must be separated, exercised by different individuals in such a way as to act as checks and balances againstone another.) তার মতে, "যখন আইন সংক্রান্ত ও শাসন সংক্রান্ত বিষয় একই লোকের বা একদল শাসকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তখন জনগণের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়ে যায়। অপরপক্ষে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা আইন পরিষদ বা শাসন বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র না হলে স্বাধীনতা বজায় থাকে না।" (When legislative and executive power are united in the same person or the governing body there can be no freedom; nor is there freedom where the power to adjudicate is not separated from the legislative and executive power.)

ইংল্যান্ডের আইন বিশারদ **ব্লাকস্টোন** বলেছেন যে, "যখনই আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকরী করার অধিকার একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে ন্যস্ত করা হয়, তখন সেখানে কোনো ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকে না।" (Whenever the right of making and enforcing the law is vested in the same man or the somebody of men, there can be no public liberty.)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **ম্যাডিসন** (Madison) বলেন, "ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি হচ্ছে সরকারের তিনটি ভাগের ওপর ন্যস্ত ক্ষমতার পৃথক পৃথক ব্যবহার ও নিশ্চিত প্রয়োগ, যেখানে এক বিভাগ অন্য বিভাগের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করবে না।"

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বৈশিষ্ট্য ঃ উপরের মতামত ব্যাখ্যা করলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির চারটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়; যথাঃ

১. সরকারের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা তিনটি পৃথক বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা উচিত।

২. প্রতিটি বিভাগের ক্ষমতা ও কাজ নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকবে। পৃথক ব্যক্তিবর্গ দ্বারা তিন বিভাগের ক্ষমতা ও কাজ সম্পাদিত হবে।

৩. প্রতিটি বিভাগ তাদের নিজ এখতিয়ারে স্বাধীন ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে। ৪. এক বিভাগ অন্য বিভাগের ওপর অযথা হস্তক্ষেপ করবে না।

৭.৬৮ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমালোচনা

Criticism of Separation of Power Theory

১. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয় ঃ সরকারের ক্ষমতাকে তিনটি বিভাগের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে ভাগ করে দেওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ সরকারের বিভাগগুলো জীবদেহের ন্যায় একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং সরকারের তিনটি বিভাগ পৃথক করলে পরস্পরের সহযোগিতা ও সমঝোতা নষ্ট হবে। প্রত্যেক বিভাগ নিজস্ব খেয়ালখুশি মতো কাজ করবে। এর ফলে শাসনব্যবস্থায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে।

২. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অবাস্তব ঃ পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বাস্তবায়ন আজ পর্যন্ত কোনো দেশে সম্ভব হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হয়েছে বলে দাবি করা হয়। কিন্তু বাস্তবে সেখানে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি কার্যকর হয়েছে। সেখানে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পরস্পর পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩. এ নীতি গ্রহণযোগ্য নয় ঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সরকারের তিনটি বিভাগকে তিন ভাগে ভাগ করার ফলে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ফলে সরকারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না।

সূচিপত্র

অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "শাসনব্যবস্থায় তিনটি বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ পরস্পরের মধ্যে সংঘাত আনবে এবং সমঝোতা নষ্ট হবে। সরকারি কাজ পরিচালনায় সবাই দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে এবং শাসন কাজে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।"

৪. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সঠিক নয় ঃ এ নীতি সঠিক নয়। কারণ সরকারের তিনটি বিভাগকে একই পর্যায়ে ফেলা যায় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেশি।

৫. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ভ্রান্ত ঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি একটি ভ্রান্ত নীতি। কেননা শুধু ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ করলেই স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এজন্য নাগরিকের সদা সতর্কতা, সচেতনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন ।

৬. পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ অবাস্তব ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী যদিও এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল, কার্যত এর পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব হয়নি। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, আইন পরিষদ সেখানে অনেক শাসন বিভাগীয় কাজ করে। প্রেসিডেন্টের মনোনয়নসমূহ সেখানকার সিনেট অনুমোদন করে। আইন পরিষদ অনেক সময়ই বিচার বিভাগীয় কাজ করে। যেমন, রাষ্ট্রপ্রধান আইনপরিষদ কর্তৃক অপসারিত হয়ে থাকেন। বিচার বিভাগ ন্যায়নীতির ভিত্তিতে অনেক সময় আইন প্রণয়ন করে একাধিক আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়েও বিচারকগণ নতুন নতুন আইনের সৃষ্টি করেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যদিও সরাসরিভাবে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করেন না, তবুও আইন পরিষদকে প্রভাবিত করে অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন রচনায় সমর্থ হয়েছেন।

৭. স্বতন্ত্রীকরণ নীতি শাসন ব্যবস্থার মান অবনত করে ঃ বিভিন্ন বিভাগকে স্বতন্ত্র এবং একে অপরের নিকট সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে নিলে শাসনকার্যের মান অনেকাংশে অবনত হতে বাধ্য। উত্তম আইন প্রণীত না হলে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত বা কার্যকর হতে পারে না। অধ্যাপক ফাইনার তাই বলেছেন, "ক্ষমতাত্রয়কে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করলে সরকার কখনো মূর্ছা যাবে, কখনো কখনো ধনুষ্টংকার রোগীর মতো হাত পা ছুড়তে থাকবে, আবার কখনো অসাড় হয়ে পড়ে থাকবে।" সুতরাং এটি সুস্থ নীতি নয়।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল্যায়ন

Evaluation of the Theory of Separation of Powers

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কিন্তু এরপরও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে ন্যস্ত থাকা উচিত নয়। শাসন কাজের সুবিধার জন্য আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যক্তি অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করতেই হবে। সুতরাং এ নীতির গুরুত্ব অসামান্য।

৭.৬৯ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ও ভারসাম্য নীতি

Theory of Separation of Powers and Theory of Checks and Balances

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা মন্টেস্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। সেখানে আইন বিভাগের ক্ষমতা কংগ্রেসের ওপর, শাসন বিভাগের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের ওপর এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট ও অধঃস্তন আদালতের হাতে অর্পিত হয়েছে। কংগ্রেসের কোনো সদস্য মন্ত্রিসভার সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারেন না। প্রেসিডেন্ট ও তার মন্ত্রিসভার সদস্য বা শাসন বিভাগীয় কোনো কর্মকর্তা কংগ্রেসের সদস্য হতে পারেন না। প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের সম্মতি নিয়ে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকদের নিযুক্ত করেন। বিচারকগণ শাসন ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করেন।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বিদেশে কূটনৈতিক মিশনে দূত প্রেরণ, শান্তি চুক্তি ও সন্ধি এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সিনেটের সম্মতি প্রয়োজন। অপরপক্ষে কংগ্রেসের বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য প্রেসিডেন্টের সম্মতি অপরিহার্য। সংবিধানসম্মত না হলে প্রেসিডেন্টের যে কোনো সিদ্ধান্ত ও কংগ্রেস প্রণীত আইনকে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল ঘোষণা করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এমনকি পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রেই পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বাস্তবে কার্যকর হয়নি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যে নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে তা হলো ক্ষমতার ‘নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি' (Checks & Balance theory)। কেননা সে দেশে রাষ্ট্রপতি (শাসন বিভাগ), কংগ্রেস (আইন বিভাগ) ও সুপ্রিম কোর্ট (বিচার বিভাগ) একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণের পরিবর্তে বরং ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। সেদেশের সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্যও ছিল সরকারের এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা। এভাবে তারা সরকারের বিভাগগুলোর স্বেচ্ছাচারী হবার প্রবণতারোধ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছেন।

৭.৭০ সরকারের অঙ্গসমূহের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা

সরকারের কাজ তিন প্রকার, যথা- আইন প্রণয়ন, শাসন কাজ পরিচালনা এবং বিচার কাজ সম্পাদন। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ সে আইন প্রয়োগ করে এবং বিচার বিভাগ আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের সাথে সরকারের অন্য দুটি বিভাগের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বিচার বিভাগের কাজ হচ্ছে আইন প্রয়োগ এবং আইনের ব্যাখ্যা দান করা। বিচারকগণ যদি আইনসভা প্রণীত কিংবা প্রথাগত আইনের ভাষাকে অস্পষ্ট বা পরস্পর বিরোধী বলে মনে করে তাহলে এর ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। আইনের এই ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে নজির বা আইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিচারকগণ কোনো মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে যদি মনে করেন যে, মামলাটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণীত হয়নি, তাহলে তারা নিজেদের ন্যায়বোধ ও সুবিবেচনা প্রয়োগ করে আইনটির ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা নতুন আইন তৈরি করে মামলাটির বিচার নিষ্পত্তি করতে পারেন। বিচারক প্রণীত এরূপ আইন বা আইনের ব্যাখ্যাকে পরবর্তীতে নজির হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ ধরনের আইনকে বিচারক প্রণীত আইন' বলা হয়।

পৃথিবীতে যেসব রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে সেখানে বিচার বিভাগ সংবিধানের অভিভাবক। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে কেন্দ্র ও অঙ্গরাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখে।

নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক হিসেবেও বিচার বিভাগ দায়িত্ব পালন করে। আইনের জটিল প্রশ্ন নিরসন কিংবা সংবিধান সংক্রান্ত জটিল প্রশ্নেও শাসন বিভাগ কিংবা আইন বিভাগ সর্বোচ্চ আদালতের নিকট সঠিক পরামর্শ চাইতে পারে। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগ সঠিক পরামর্শ প্রদান করে আইনগত ও সাংবিধানিক জটিলতা নিরসনে সাহায্য করে থাকে।

সরকারের তিনটি বিভাগের কাজকে ভাগ করে দেওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল এরিস্টটলের সময় থেকেই। এরপর ফরাসি চিন্তাবিদ জ্যা বোদা ও মন্টেস্কু এই তিনটি বিভাগের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের জন্য আরো জোরালো বক্তব্য রাখেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা মন্টেস্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি’ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত

হন। সেদেশের সংবিধান অনুযায়ী আইন বিভাগের ক্ষমতা কংগ্রেসের ওপর, শাসন পরিচালনা ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের ওপর এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। সে দেশের বিচারকগণ শাসন ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকেন।

কিন্তু বাস্তবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বাস্তবে কার্যকর হয়নি। সেদেশে কার্যকর হয়েছে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি' (Checks & Balance theory) । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেস এবং সুপ্রিম কোর্ট একে অপরকে সহযোগিতা ও নিয়ন্ত্রণ করছে। বিদেশে কূটনৈতিক মিশনে দূত প্রেরণ, শান্তি চুক্তি ও সন্ধি এবং উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ সিনেটের সম্মতি প্রয়োজন। অপরপক্ষে কংগ্রেসের কোনো বিলকে আইনে (Act) পরিণত করার জন্য প্রেসিডেন্টের সম্মতি অপরিহার্য। আবার সংবিধানসম্মত না হলে প্রেসিডেন্টের যে কোনো সিদ্ধান্ত ও কংগ্রেস প্রণীত আইনকে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল ঘোষণা করতে পারে।

প্রকৃত অর্থে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতাগণের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা। এর দ্বারা তারা সরকারের বিভাগগুলোর স্বেচ্ছাচারী হবার প্রবণতা রোধ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতো পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই একদিকে যেমন সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতাকে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত করা হয়েছে, তেমনি তিনটি বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার নীতিকেও ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে সরকারের কোনো বিভাগের পক্ষে যেমন স্বেচ্ছাচারী হবার প্রবণতা রোধ হয়েছে তেমনি তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টির পথও প্রশস্ত হয়েছে।

সূচিপত্র

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

(√ চিহ্নটি সঠিক উত্তর)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। সরকারের বিভাগ কোনটি?

ক. আইন বিভাগ

খ. শাসন বিভাগ

গ. বিচার বিভাগ

ঘ, ক, খ ও গ √

২। কোন্ ভিত্তি বা মাপকাঠি অনুযায়ী এরিস্টটল সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন?

ক. সংখ্যানীতি

খ. উদ্দেশ্যনীতি

গ, ধর্মনীতি

ঘ. ক ও খ √

৩। আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারকে যে দু ভাগে ভাগ করা হয় তা হলো—

ক. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র

খ, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্র

গ, সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত √

ঘ. গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

৪। আঞ্চলিক ক্ষমতা বন্টনের নীতিতে সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, এগুলো হলো—

ক, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্র √

খ. সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত

গ. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র

ঘ. গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

৫। রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতালাভের পদ্ধতি অনুসারে সরকার হয় দু ধরনের; যথা

ক, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র √

খ. গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

গ. সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত

ঘ, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়

৬। সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান অনুসারে সরকার হয় দু রকম; যথা

ক. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র

খ. গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র √

গ. সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত

ঘ, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়

৭। নিম্নের কোন দেশে সংসদীয় সরকার প্রচলিত নেই?

ক. বাংলাদেশ

খ. ভারত

গ, যুক্তরাজ্য

ঘ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র √

৮। নিম্নের কোন দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে?

ক, যুক্তরাজ্য √

খ. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

গ.ফ্রান্স

ঘ, রাশিয়া

৯। নিম্নের কোন দেশটি প্রজাতন্ত্র?

ক. সউদী আরব

খ, জাপান

গ. জর্ডান

ঘ, বাংলাদেশ √

১০। এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত রয়েছে এমন রাষ্ট্রটি হলো—

ক. সুইজারল্যান্ড

খ. কানাডা

গ. ভারত

ঘ, যুক্তরাজ্য √

১১। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রচলিত রয়েছে কোন দেশে?

ক. ভারত √

খ. যুক্তরাজ্য

গ. বাংলাদেশে

ঘ, চীন

১২। সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রচলিত রয়েছে কোন দেশে?

ক. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

খ, রাশিয়া

গ. জার্মানি

ঘ. কিউবা √

১৩। গণতন্ত্র সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংজ্ঞাটি কে প্রদান করেছেন?

ক. নেলসন ম্যান্ডেলা

খ. অধ্যাপক সিলি

গ, আব্রাহাম লিংকন √

ঘ. অধ্যাপক ডাইসি

১৪। সমাজতন্ত্রের যুক্তিভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেন

ক. এরিস্টটল

খ. প্লেটো

গ, কার্ল মার্কস √

ঘ. হিটলার

১৫। 'এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা"—এটি কোন সরকারের আদর্শ?

ক. গণতন্ত্র

খ. রাজতন্ত্র

গ. সমাজতন্ত্র

ঘ. একনায়কতন্ত্র √

১৬। আব্রাহাম লিংকন কোন দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন?

ক. চীন

খ, রাশিয়া

গ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র √

ঘ, যুক্তরাজ্য

১৭। হিটলার কোন দেশের একনায়ক ছিলেন?

ক. ইতালি

খ, জার্মানি √

গ. স্পেন

ঘ, পাকিস্তান

সূচিপত্র

১৮। গ্রিক শব্দ ডিমোস (Demos)-এর অর্থ কী?

ক. সরকার

খ. মন্ত্রিসভা

গ. জনগণ √

ঘ. ক্ষমতা

১৯। ডিমোস' শব্দটি এসেছে কোন ভাষা থেকে? -

ক. টিউটনিক

খ. ল্যাটিন

গ. গ্রিক √

ঘ. স্প্যানিশ

২০। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অতীতে কোথায় প্রচলিত ছিল?

ক. প্রাচীন রোমে

খ প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রে √

গ.প্রাচীন চীনে

ঘ, প্রাচীন সউদী আরবে

২১। সংসদীয় সরকারে সরকারপ্রধান কে?

ক. রাষ্ট্রপতি

খ. প্রধানমন্ত্রী √

গ. স্পিকার

ঘ, চীফ হুইপ

২২। বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত?

ক. রাষ্ট্রপতি শাসিত

খ, এককেন্দ্রিক √

গ, যুক্তরাষ্ট্রীয়

ঘ. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

২৩। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি কোন ধরনের?

ক. রাজতান্ত্রিক

খ. সমাজতান্ত্রিক

গ, প্রজাতান্ত্রিক √

ঘ. ধর্মতান্ত্রিক

২৪। ফোয়েডাস কোন ভাষার শব্দ?

ক. গ্রিক

খ, ল্যাটিন √

গ. রোমান

ঘ, জার্মান

২৫। ফোয়েডাস শব্দের অর্থ কী?

ক. যুদ্ধ-বিগ্রহ

খ. শান্তি

গ, মিলন/সন্ধি √

ঘ, সহযোগিতা

২৬। গণতন্ত্র কত ভাগে বিভক্ত?

ক, দুই √

খ. তিন

গ. চার

ঘ. পাচ

২৭। গণতন্ত্রের বিপরীতধর্মী সরকার কোনটি?

ক. রাজতন্ত্র

খ. প্রজাতন্ত্র

গ, একনায়কতন্ত্র √

ঘ. ধনিকতন্ত্র

২৮। গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা কার হাতে থাকে?

ক. রাষ্ট্রের জনগণের হাতে √

খ. রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে

গ. রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর হাতে

ঘ. রাষ্ট্রের এক ব্যক্তি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে

২৯। একনায়কতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা কার হাতে থাকে?

ক, এক ব্যক্তি বা একদলের হাতে √

খ, রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে

গ. প্রধানমন্ত্রীর হাতে

ঘ. জনগণের হাতে

৩০। গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা জটিল?

ক. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

খ, এককেন্দ্রিক

গ, যুক্তরাষ্ট্রীয় √

ঘ. সংসদীয়

৩১। গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি কী?

ক. শিক্ষা ও সচেতনতা

খ, সাম্য ও স্বাধীনতা √

গ, মানবতাবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ

ঘ, অধিকার ও কর্তব্যবোধ

৩২। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র কী?

ক. সাম্য, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা

খ. সাম্য, স্বাধীনতা ও অধিকার

গ, সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব √

ঘ. অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব

৩৩। সরকারের অঙ্গ বা বিভাগ কয়টি?

ক, ২টি

খ, ৩টি √

গ. ৪টি

ঘ, ৫টি

৩৪। শাসন বিভাগের মূল কাজ হলো—

ক, আইন প্রয়োগ √

খ. আইন প্রণয়ন

গ. আইন সংশোধন

ঘ. বিচার করা

৩৫। আইন বিভাগের মূল কাজ কী?

ক, আইন প্রণয়ন √

খ. আইন প্রয়োগ

গ. আইনের আলোকে বিচার করা

ঘ. বিদেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা

৩৬। গ্রেট ব্রিটেন/যুক্তরাজ্যের আইনসভার নাম কী?

ক. কংগ্রেস

খ. লোকসভা

গ.সিনেট

ঘ, পার্লামেন্ট √

৩৭। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম কী?

ক. পার্লামেন্ট

খ. মজলিস

গ. কংগ্রেস √

ঘ, সিনেট

৩৮। বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী?

ক. পার্লামেন্ট

খ. বিধানসভা

গ, জাতীয় সংসদ √

ঘ. মজলিস

৩৯। বিচার বিভাগের কর্মদক্ষতা অপেক্ষা সরকারের উৎকর্ষ বিচারের আর কোনো শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড নেই –উক্তিটি কার?

ক. অধ্যাপক লাস্কি

খ. জন স্টুয়ার্ট মিল

গ, লর্ড ব্রাইস √

ঘ. বিচারপতি হিউজেস

৪০। বিচারক নিয়োগের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি কোনটি?

ক: জনগণের ভোটে

খ, আইনসভার ভোটে

গ, বিচারকগণের ভোটে

ঘ, শাসন বিভাগ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ

৪১। ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য –উক্তিটি কার?

ক, লর্ড ব্রাইস

খ. বিচারপতি হিউজেস

গ, অধ্যাপক লাস্কি √

সূচিপত্র

ঘ, আব্রাহাম লিংকন

৪২। সরকারের কাজ কত প্রকার?

ক. দুই

খ, তিন √

গ. চার

ঘ. পাচ

৪৩। সরকারের বিভাগ কয়টি?

ক. দুইটি

খ, তিনটি √

গ. চারটি

ঘ. পাচটি

৪৪। গঠনগত দিক দিয়ে আইনসভা কয়ভাগে বিভক্ত?

ক, দুই √

খ. তিন

গ. চার

ঘ. পাচ

৪৫। ব্রিটেনের উচ্চকক্ষ গঠিত হয় কীভাবে?

ক. নির্বাচনের মাধ্যমে

খ, উত্তরাধিকার সূত্রে √

গ. প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে

ঘ, সাংসদদের ভোটের মাধ্যমে

৪৬। ব্রিটেনের নিম্নকক্ষের নাম কী?

ক, লর্ডসভা

খ. কমন্সসভা √

গ.সিনেট

ঘ. নেসেট

৪৭। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চকক্ষকে কী বলে?

ক, সিনেট √

খ. রাজ্যসভা

গ. লর্ডসভা

ঘ. কমন্সসভা

৪৮। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের নাম কী?

ক, প্রতিনিধি সভা √

খ. কমন্সসভা

গ. লর্ডসভা

ঘ. বিধানসভা

৪৯। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা কাকে বলা হয়?

ক. এরিস্টটল

খ. জন লক

গ, জ্যা বোদা

ঘ. মন্টেস্কু √

৫০। যখন আইনসংক্রান্ত ও শাসনসংক্রান্ত বিষয় একই ব্যক্তির বা একদল শাসকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তখন জনগণের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়ে যায়। অপরপক্ষে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা আইন পরিষদ বা শাসন বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র না হলে স্বাধীনতা বজায় থাকে না—উক্তিটি কার?

ক. জন লক

খ, মন্টেস্কু √

গ, ব্লাকস্টোন

ঘ. ম্যাডিসন

৫১। The Spirit of Laws গ্রন্থখানি কার লেখা?

ক. এরিস্টটল

খ. জন অস্টিন

গ, মন্টেস্কু √

ঘ. ব্লাকস্টোন

৫২। মন্টেস্কু কোন দেশের অধিবাসী?

ক. জাপান

খ. অস্ট্রিয়া

গ.ফ্রান্স √

ঘ. স্পেন

৫৩। মন্টেস্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন কোন দেশের সংবিধান প্রণেতারা?

ক. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতারা

খ. ভারতের সংবিধান প্রণেতারা

গ.ফ্রান্সের সংবিধান প্রণেতারা ।

ঘ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা √

৫৪। আইন প্রণয়ন কোন বিভাগের কাজ?

ক, আইন বিভাগ √

খ. শাসন বিভাগ

গ. বিচার বিভাগ

ঘ, সুপ্রিম কোর্ট

৫৫। মার্সিলিও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক. মস্কো

খ. রোম

গ. বার্সেলোনা

ঘ, পাদুয়া √

৫৬। সরকারের কতটি বিভাগ রয়েছে?

ক, দুইটি

খ, তিনটি √

গ, চারটি

ঘ. পাচটি

৫৭। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে, কোন ধরনের সরকার?

ক. সংসদীয় সরকার

খ, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার

গ. একনায়কতান্ত্রিক সরকার √

ঘ, এককেন্দ্রিক সরকার

৫৮। একনায়কতন্ত্র বিশ্বাসী নয়–

ক. উগ্র বর্ণবাদে

খ. উগ্র জাতীয়তাবাদে

গ. সর্বাত্মকবাদে

ঘ, সাম্য ও স্বাধীনতায় √

৫৯। একনায়ক হিসেবে সকলেই চেনে যাদেরকে–

ক. আব্রাহাম লিংকন, রুজভেল্ট, নেলসন ম্যান্ডেলা

সূচিপত্র

খ, ডাইসি, ম্যাকাইভার, জন স্টুয়ার্ট মিল

গ. মাহাথির মোহাম্মদ, জওহরলাল নেহরু, চার্চিল

ঘ, হিটলার, মুসোলিনী, ফ্রাঙ্কো √

৬০। গণতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস–

ক. রাষ্ট্রপতি

খ. প্রধানমন্ত্রী

গ জনগণ √

ঘ. আইনসভা

৬১। বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত?

ক. রাষ্ট্রপতি শাসিত

খ, যুক্তরাষ্ট্রীয়

গ, সংসদীয়/মন্ত্রিপরিষদ শাসিত √

ঘ, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

৬২। বর্তমানে ধর্মতান্ত্রিক সরকার প্রচলিত রয়েছে কোন কোন দেশে?

ক. সউদী আরব, ইয়েমেন

খ, জর্ডান, সিরিয়া

গ, আফগানিস্তন, পাকিস্তান

ঘ, ইরান, ভ্যাটিকান সিটি √

৬৩। ধর্মতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের মালিক কে?

ক. জনগণ

খ. সরকার

গ. রাষ্ট্র

ঘ, আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা √

৬৪। বেনিটো মুসোলিনি কোন দেশের একনায়ক ছিলেন?

ক. জার্মানি

খ. স্পেন

গ. ইতালি √

ঘ, প্রশিয়া

৬৫। সংসদীয় সরকার প্রচলিত রয়েছে—

ক. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

খ, দক্ষিণ কোরিয়া

গ. বাংলাদেশ √

ঘ, ইরান

৬৬। কোনটি সরকারের অঙ্গ বা বিভাগ নয়?

ক. আইন বিভাগ

খ. শাসন বিভাগ

গ. বিচার বিভাগ

ঘ. জনমত √

৬৭। অধ্যাদেশ জারি করতে পারে কোন বিভাগ?

ক. আইন বিভাগ

খ, শাসন বিভাগ √

গ, বিচার বিভাগ

ঘ. সব বিভাগ

৬৮। ভারত, গ্রেট ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কত কক্ষবিশিষ্ট?

ক. এক কক্ষবিশিষ্ট

খ, দুই কক্ষবিশিষ্ট √

গ তিন কক্ষবিশিষ্ট

ঘ. চার কক্ষবিশিষ্ট

৬৯। বাংলাদেশের আইনসভা কত কক্ষবিশিষ্ট?

ক, এক কক্ষবিশিষ্ট √

খ, দুই কক্ষবিশিষ্ট

গ: তিন কক্ষবিশিষ্ট

ঘ, চার কক্ষবিশিষ্ট

৭০। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম কী?

ক. প্রতিনিধি সভা

খ, সিনেট √

গ. লর্ড সভা

ঘ. কমন্স সভা

৭১। গ্রেট ব্রিটেন/যুক্তরাজ্যের আইনসভার নিম্নকক্ষের নাম কী?

ক. লর্ড সভা

খ. কমন্স সভা √

গ, প্রতিনিধি পরিষদ

ঘ. লোকসভা

৭২। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা কোন বিভাগের কাজ?

ক. আইন বিভাগ

খ. শাসন বিভাগ

গ, বিচার বিভাগ √

ঘ, পুলিশ বিভাগের

৭৩। কোন দেশের বিচারপতিগণ আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত হন?

ক. বাংলাদেশ

খ. ভারত

গ, জাপান

ঘ, সুইজারল্যান্ড √

৭৪। বাজেট পাস বা অনুমোদন করে সরকারের কোন বিভাগ?

ক, আইন বিভাগ √

খ. শাসন বিভাগ

গ, বিচার বিভাগ

ঘ. কোন বিভাগই নয়

৭৫। আইনসভার প্রথম কক্ষকে কী বলে?

ক. উষ্চকক্ষ

খ-নিম্নকক্ষ √

গ. উষ্চ আদালত

ঘ. নিম্ন আদালত

৭৬। আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষকে কী বলে?

ক, উষ্চকক্ষ √

খ. নিম্নকক্ষ

গ. উষ্চ আদালত

ঘ. নিম্ন আদালত

৭৭। শাসন করা বা আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করা কোন বিভাগের কাজ?

ক. আইন বিভাগ

খ, শাসন বিভাগ √

গ. বিচার বিভাগ

ঘ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ

৭৮। আইন অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান ও বিচার করা কোন বিভাগের কাজ?

ক. আইন বিভাগ

খ. শাসন বিভাগ

গ, বিচার বিভাগ √

ঘ. স্বরাষ্ট্র বিভাগ

৭৯। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হলেন নামমাত্র শাসক। কারণ প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে—

ক. রাজনৈতিক দল ও দলীয় নেতার হাতে

খ. প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে √

গ. জনগণ ও জননেত্রীর হাতে

ঘ. বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বিচারকদের হাতে

৮০। শাসন বিভাগের ওপর আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। কারণ এর মাধ্যমে শাসন বিভাগের—

ক, স্বেচ্ছাচারিতা রোধ হয় √

খ, দুনীতি রোধ হয়

গ. স্বজনপ্রীতি রোধ হয়

ঘ, স্বৈরাচার রোধ হয়

৮১। আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণের অর্থই হলো পরোক্ষভাবে জনগণের নিয়ন্ত্রণ। কারণ–

ক. আইনসভা জনগণের নিয়ন্ত্রণের অধীন

খ. আইনসভার সদস্যগণ হলেন জনগণের নেতা

গ, আইনসভার সদস্যগণ হলেন জনপ্রতিনিধি √

ঘ, আইনসভার সদস্যগণ হলেন খুবই ক্ষমতাশালী

৮২। বিচার বিভাগকে স্বাধীন, দুনীতিমুক্ত ও নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। কারণ বিচারকদের দুনীতির কারণে—

ক, ন্যায়বিচার পদদলিত হয় √

খ, রাষ্ট্র বিপদমুখী হয়

গ, জনগণ বিদ্রোহী হয়

ঘ. দুনীতির বিস্তার ঘটে

৮৩। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি’ কার্যকর রয়েছে কোন রাষ্ট্রে?

ক: যুক্তরাজ্য

সূচিপত্র

খ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র √

গ.ফ্রান্স

ঘ, জার্মানি

৮৪। সুইজারল্যান্ডের শাসন ক্ষমতা কতজনের হাতে ন্যস্ত?

ক. ৬

খ. ৭ √

গ. ৮

ঘ. ৯

৮৫। সাধারণত আইনসভার নিম্নকক্ষ অত্যধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয় কেন?

ক. রক্ষাকবচ থাকায়

খ, স্বেচ্ছাচারী হওয়ায়

গ. দ্বিতীয় কক্ষ হওয়ায়

ঘ, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক হওয়ায় √

৮৬। সংবিধানের অভিভাবক কে?

ক. শাসন বিভাগ

খ. আইন বিভাগ

গ, বিচার বিভাগ √

ঘ. সামরিক বাহিনী

৮৭। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য কোনটি?

ক. জনগণের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা

খ, জনগণের যা খুশি করার প্রবণতা রোধ করা

গ, জনগণের কাজের স্বাধীনতা খর্ব করা

ঘ, জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা √

বহুপদি সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৮৮। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা হলেন–

i. ম্যাকাইভার

ii. মন্টেস্কু

iii. ব্লাকস্টোন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii ও iii √

গ. i ও ii

ঘ. i ও iii

৮৯। শাসন বিভাগের কাজ হলো—

i. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা

ii. স্বরাষ্ট্র বিষয় দেখাশুনা

iii. অপরাধীকে দণ্ড বা শাস্তি প্রদান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও iii

খ. i ও ii √

গ. iii ও ii

ঘ. i, ii ও iii

৯০। আইন বিভাগের কাজ হলো—

i, আইন প্রণয়ন ও সংশোধন

ii. সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন

iii. অধ্যাদেশ প্রণয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও iii

খ. ii ও iii

গ. i ও ii √

ঘ. i, ii ও iii

৯১। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পরিবর্তে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

i. বাংলাদেশে

ii, যুক্তরাজ্যে

iii. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i

গ. iii √

ঘ. ii

৯২। সংসদীয় সরকার প্রচলিত রয়েছে—

i. বাংলাদেশে

ii. ভারতে

iii. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii √

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৯৩ ও ৯৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

শিকদার মহিলা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী শমি ও সুচিত্রা। শমির রাষ্ট্রে অসংখ্য রাজনৈতিক দল আছে। সেখানে একটি কেন্দ্র থেকে শাসন পরিচালিত হয় এবং কোনো প্রদেশ নেই। শমির রাষ্ট্রে মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। সুচিত্রা যে রাষ্ট্রে বসবাস করে তার সাথে শমির রাষ্ট্রের একটি জায়গায় অমিল রয়েছে এবং তা হলো- সুচিত্রার দেশে অনেকগুলো প্রদেশ রয়েছে এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে বন্টন করে দিয়েছে সংবিধান।

৯৩। শমি যে রাষ্ট্রের নাগরিক সেখানে যে সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান তা হলো—

i, সংসদীয়

ii এককেন্দ্রিক

iii. একনায়কতান্ত্রিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii √

ঘ. i, ii, iii

৯৪ । সুচিত্রা যে রাষ্ট্রের নাগরিক সেখানে যে সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান তা হলো—

i, সংসদীয়

সূচিপত্র

ii. যুক্তরাষ্ট্রীয়
iii. গণতান্ত্রিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii √

খ. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

১. ছকটি দেখ এবং নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

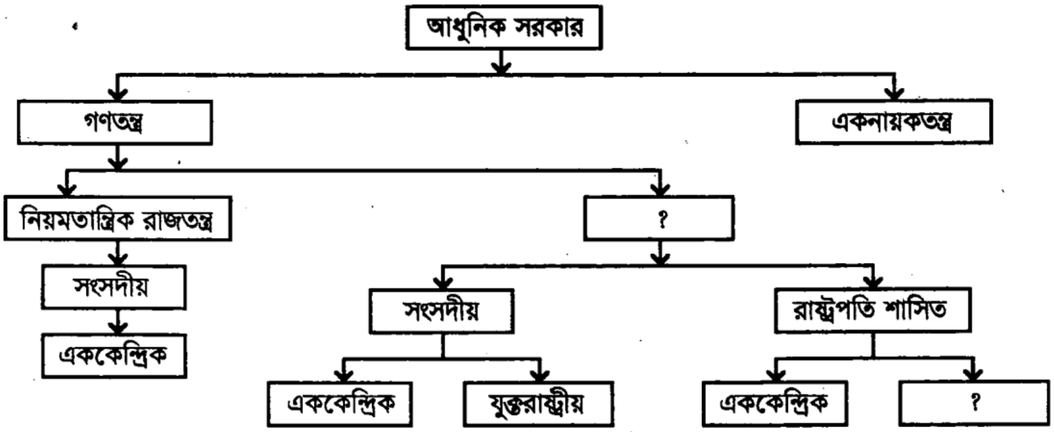

প্রশ্নঃ

ক. ছকের প্রশ্নবোধক চিহ্নের শূন্যস্থান দুটি পূরণ কর।
খ, কীসের ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়?
গ. সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রীদের মর্যাদা ও ক্ষমতার তুলনা কর।
ঘ. "বর্তমান সময়ের সকল প্রকার শাসনের মধ্যে গণতন্ত্রই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা।"—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর ।

২. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ ।

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিভাগগুলো ছাড়াও পার্শ্ববর্তী কলেজগুলোকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। পীরগাছা কলেজের অধ্যাপক আব্দুল মাবুদ, পীরগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক সেকেন্দার আলী ও অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম, কাউনিয়া কলেজের অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন ও অধ্যাপক মোফাজ্জল হোসেন শামীম-এর নেতৃত্বে ছাত্ররা এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিল। বিতর্কের বিষয় ছিল বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশে সব থেকে বেশি ক্ষতি করেছে সামরিক শাসন' ।

প্রশ্নঃ

ক. পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রয়োগ ঘটে কোন কোন প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি?
খ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কী?
গ. সংসদীয় সরকারের সাথে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লেখ।
ঘ. উদ্দীপকে বিতর্কের শিরোনাম ছিল বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সামরিক সরকার' শিরোনামটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

৩. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান হলো সরকার। সরকার হলো রাষ্ট্রের মুখপাত্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরকার গঠন করে থাকে। রাষ্ট্রভেদে সরকারের রূপ ও সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন হয়। নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র সকল শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সর্বোত্তম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

প্রশ্নঃ

ক. রাষ্ট্রের মুখপাত্র কে?

খ, সরকার বলতে কী বুঝঃ।

গ. সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কী কী?

ঘ, নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র সকল শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সর্বোত্তম বলা যায়—উক্তিটির যথার্থতা - যাচাই কর।

৪. ছকটি দেখ এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

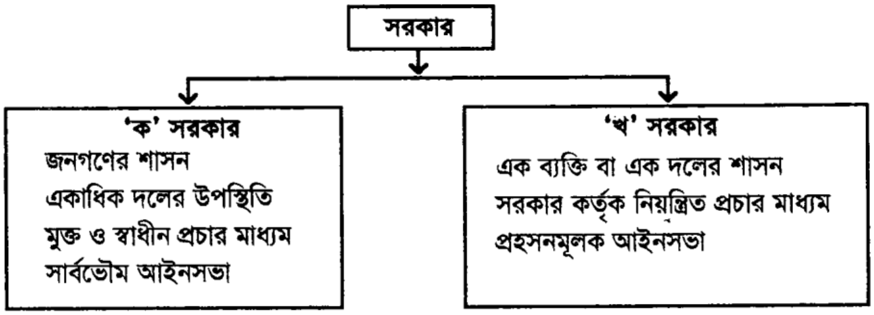

প্রশ্নঃ

ক. আব্রাহাম লিংকন প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি কী?

খ, একনায়কতন্ত্র বলতে কী বুঝ?

গ. উপরের ছকের 'ক' সরকারের সাথে 'খ' সরকারের পার্থক্য নির্দেশ কর।

ঘ. উপরের ছকে বর্ণিত ক ও খ সরকারের মধ্যে কোনটিকে তুমি শ্রেষ্ঠ সরকার বলবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৫. ছকটি দেখ এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

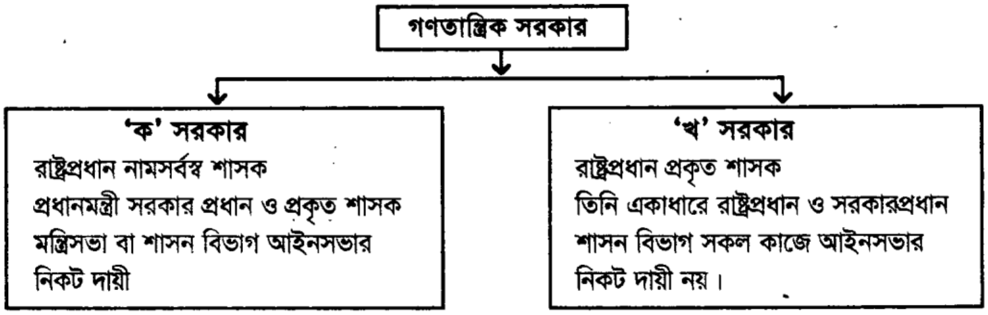

প্রশ্নঃ

ক. সরকার কাকে বলে?

খ, দায়িত্বশীল সরকার বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' সরকারের সাথে 'খ' সরকারের পার্থক্য নির্দেশ কর।

ঘ, বাংলাদেশের জন্য তুমি ক' অথবা 'খ' কোন ধরনের সরকারকে উপযোগী বলে মনে কর? কেন?

৬. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শিপ্রার বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে। সে বেড়াতে এসেছে বাংলাদেশে। সে বাংলাদেশে তার অনেক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াবে। খালাত বোন লতার সাথে সে বসে গল্প করছিল নিজ নিজ দেশ সম্পর্কে। শিপ্রা বলল যে, আমাদের দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে কিন্তু তোমাদের দেশে রয়েছে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা। লতা বলল যে, কিন্তু এক জায়গায় আমাদের উভয় দেশের মিল রয়েছে। সেটি হলো উভয় দেশেই সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে।

প্রশ্নঃ

ক. এরিস্টটল যে দুটি নীতি বা ভিত্তি বা মাপকাঠির সাহায্যে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন তা' কী কী?

খ, গণতন্ত্র কত প্রকার ও কী কী? বর্তমান বিশ্বে কোন ধরনের গণতন্ত্র বেশি প্রচলিত?

গ. উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, শিপ্রার দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং লতার দেশে এককেন্দ্রিক সরকার রয়েছে। এই দুই সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

ঘ. উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে, শিপ্রা ও লতার উভয়ের দেশেই একই ধরনের অর্থাৎ সংসদীয় সরকার প্রচলিত রয়েছে। সংসদীয় সরকারে আইনসভা কীভাবে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৭. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

রফিক, শফিক ও আনোয়ার তিন বন্ধু। রফিক প্রশাসন ক্যাডারের ম্যাজিস্ট্রেট এবং শফিক বিচারক। আনোয়ার ওর বাবার ব্যবসা এবং রাজনীতির হাল ধরেছে। সে সংসদ সদস্য হতে চায়। রফিক ইদানিং বলছে যে, আমলা-প্রশাসকদের ওপর রাজনৈতিক নেতাদের অহেতুক হস্তক্ষেপ তাকে কষ্ট দিচ্ছে। শফিক বলে যে, বিচার বিভাগ স্বাধীন হওয়ায় সে খুব খুশি। আনোয়ার চায় জাতীয় সংসদ হোক জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল।

প্রশ্ন ঃ

ক. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে এমন কয়েকটি রাষ্ট্রের নাম লেখ।

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বুঝ?

গ. শফিক কেন বলছে যে, সে খুব খুশি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আনোয়ার জাতীয় সংসদকে কেমন দেখতে চায়? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৮. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সৈয়দপুর ক্যান্ট, পাবলিক কলেজের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মনে করেন যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিচার বিভাগকে অবশ্যই শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে। বাংলাদেশে এ দাবি দীর্ঘদিনের। ইতিমধ্যে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রশ্নঃ

ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী এবং তা কতটি কক্ষবিশিষ্ট?
খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বুঝ?

সূচিপত্র

গ. অধ্যাপক নজরুল ইসলাম কেন মনে করেন যে, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অধ্যাপক নজরুল ইসলামের উক্তির আলোকে বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ সংগ্রামের মূল্যায়ন কর।

৯. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শিমুল, মোহন ও ফারুক তিন বন্ধু। তারা ঢাকার একটি ভালো কলেজে ভর্তি হয়েছে। শিমুলের বাবা জাতীয় সংসদ সদস্য, মোহনের বাবা জাতীয় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী এবং ফারুকের বাবা একজন বিচারক। তারা তিনজনই তাদের বাবারা কী কাজ করেন, কীভাবে করেন সে সম্পর্কে মাঝে মাঝে গল্প করেন। তাদের স্যার বলেছেন যে, একটি দেশের উৎকর্ষজ এবং সরকারের যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি হলো সে দেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আছে কীনা তা দেখা।

প্রশ্ন ঃ

ক. সরকারের অঙ্গ বা বিভাগ কয়টি ও কী কী?

খ, উদাহরণসহ নামমাত্র শাসক এবং প্রকৃত শাসক সম্পর্কে ধারণা দাও।

গ, শিমুলের বাবা আইনসভার সদস্য। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় কীভাবে আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে?

ঘ, "বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা কোনো সরকারের যোগ্যতা বিচার করার অধিকতর উপযোগী মানদণ্ড আর নেই"—উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

১০. ছকটির আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

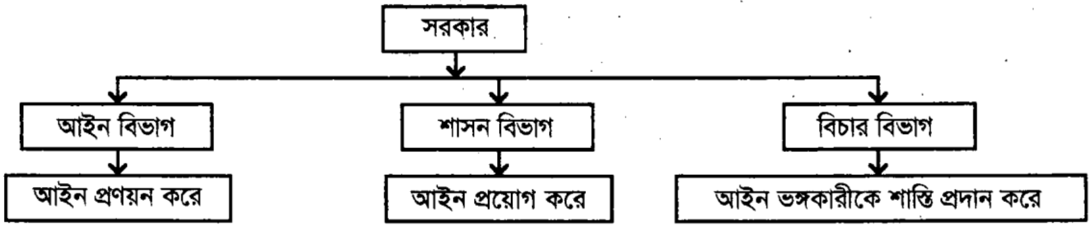

প্রশ্ন ঃ

ক. আইন প্রণয়ন ছাড়া আইন বিভাগ যে কাজগুলো করে এরূপ দুটি কাজের নাম লেখ।

খ. বাংলাদেশের আইনসভার নির্বাচনমূলক কাজ কী কী?

গ, একটি ছকের সাহায্যে শাসন বিভাগ সংগঠনের বিভিন্ন মাত্রা দেখাও।

ঘ, "বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা কোনো সরকারের যোগ্যতা বিচার করার অধিকতর মানদণ্ড আর নেই"—উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

১১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

অধ্যাপক আবু তালেব মণ্ডল রংপুরের একটি খ্যাতনামা কলেজে পৌরনীতি ও সুশাসন পড়ান। তিনি শ্রেণিকক্ষে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পর্কে পাঠদান করছিলেন। একজন ছাত্র দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে স্যার এই নীতি কোথাও কী

পুরোপুরি কার্যকর রয়েছে? তালেব সাহেব বললেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা এই নীতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে সেখানেও এই নীতি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। সেদেশে প্রয়োগ করা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি ।

প্রশ্ন ঃ

ক. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তাগণের নাম লেখ।

খ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূলকথা কী?

গ. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বাস্তবায়িত না হয়ে যে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি' কার্যকর হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

ঘ. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এমনকি পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই পূর্ণ ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর করা হয়নি'–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

[এ অধ্যায়ের প্রশ্ন-সংকেত]

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। সরকার কী?

২। গ্রিক দার্শনিক কয়টি নীতি বা ভিত্তি বা মাপকাঠির সাহায্যে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন এবং তা কী কী?

৩। এরিস্টটলের মতে স্বাভাবিক সরকার কোনগুলো?

৪ লের মতে কৃত সরকার কোনগুলো? –

৫ । সরকারের আধুনিক শ্রেণিবিভাগ করেছেন এমন কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ কর ।

৬। গণতন্ত্রের একটি সংজ্ঞা দাও।

৭। অধ্যাপক সিলি প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি লেখ।

৮ । আব্রাহাম লিংকন প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি লেখ ।

৯। গণতন্ত্র কত প্রকার ও কী কী?

১০ । পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কী কী?

১১ । একনায়কতন্ত্রের একটি সংজ্ঞা দাও ।

১২। বিশ্বের কয়েকজন বিখ্যাত একনায়কের নাম লেখ ।

১৩। কোন সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতার অতিমাত্রায় কেন্দ্রীয়করণ ঘটে?

১৪। কোন সরকার ব্যবস্থায় প্রচারযন্ত্রের একচেটিয়া ব্যবহার হয়?

১৫। কোন সরকার ব্যবস্থা সর্বাত্মকবাদী, যুদ্ধবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী?

১৬। কোন সরকার শান্তি ও আন্তর্জাতিকতার বিরোধী?

১৭। কোন সরকার উগ্র জাতীয়তাবাদী?

সূচিপত্র

১৮। সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি কী?

১৯। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের একটি সংজ্ঞা দাও।

২০। অধ্যাপক ফাইনার প্রদত্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সংজ্ঞা লেখ।

২১। অধ্যাপক ডাইসি প্রদত্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সংজ্ঞা লেখ।

২২। অধ্যাপক কে. সি. হোয়ের প্রদত্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সংজ্ঞা লেখ।

২৩। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন দেশে কার নেতৃত্বে কত সালে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে?

২৪। কার্ল মার্কস কী জন্য বিখ্যাত?

২৫। কোন সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপরিচালনায় সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে?

২৬। সামরিক সরকার কী?

২৭। সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান নীতি অনুযায়ী সরকারকে যে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয় তার নাম কী কী?

২৮। কোন নীতি বা পদ্ধতির ভিত্তিতে সরকারকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র—এ দুভাগে বিভক্‌ত করা হয়?

২৯। কোন নীতি বা ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়—এ দুভাগে বিভক্ত করা হয়

৩০। সরকারের অঙ্গ বা বিভাগ কয়টি ও কী কী?

৩১। সরকারের আইন প্রণয়ন, সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে কোন বিভাগ?

৩২। আইন বিভাগ কাকে বলে?

৩৩। এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলতে কী বোঝায়?

৩৪। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলতে কী বোঝায়?

৩৫। আইনসভার দ্বি-কক্ষ কীভাবে গঠিত হয়?

৩৬। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভার গঠন কাঠামো কীরূপ হয়?

৩৭। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় আইনসভার গঠন কাঠামো কীরূপ হয়?

৩৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভার গঠন কাঠামো কীরূপ হয়?

৩৯। একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রে আইনসভার গঠন কাঠামো কীরূপ হয়?

৪০। এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে এমন কয়েকটি রাষ্ট্রের নাম লেখ।

৪১। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে এমন কয়েকটি রাষ্ট্রের নাম লেখ।

৪২। আইনবিভাগ প্রণীত আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ এবং অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা করে কোন বিভাগ

৪৩। বিচার কাজ পরিচালনা, আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি প্রদান, সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ করে কোন বিভাগ?

৪৪। বাংলাদেশে সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী এবং তা কোন কোন বিভাগ নিয়ে গঠিত

৪৫। সংবিধানের ব্যাখ্যাদান ও বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সম্পর্কে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি হিউজেস কী উক্তি করেছেন?

৪৬। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা কে তিনি কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?

৪৭। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি দ্বারা কোনো দেশের সংবিধান প্রণেতাগণ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন?

৪৮। মন্টেস্কু লিখিত কোন গ্রন্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটির ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। সরকার কী?

২। পলিটি বলতে এরিস্টটল কী বুঝিয়েছেন?
৩। স্বাভাবিক সরকার বলতে এরিস্টটটল কী বুঝিয়েছেন?
৪। বিকৃত সরকার বলতে এরিস্টটল কী বুঝিয়েছেন?
৫। ডেমোক্রেসি’ বা জনতাতন্ত্রকে এরিস্টটল বিকৃত সরকার বলেছেন কেন?
৬। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?
৭। প্রজাতন্ত্র কী/বলতে কী বোঝায়?
৮। গণতন্ত্র বলতে কী বুঝ?
৯ । গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও ।
১০। গণতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ কর।
১১। গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট কী কী?
১২। আধুনিক গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বলা হয় কেন?
১৩। গণভোট কী?
১৪। গণতন্ত্রকে সফল করতে শিক্ষার ভূমিকা কতটুকু?
১৫। গণতন্ত্রকে সফল করতে অর্থনৈতিক সাম্যের ভূমিকা কতটুকু?
১৬। গণতন্ত্রকে সফল করতে সহনশীলতার ভূমিকা কতটুকু?
১৭। গণতন্ত্রকে সফল করতে সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কতটুকু?
১৮। গণতন্ত্রকে সফল করতে মুক্ত ও স্বাধীন প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা কতটুকু?
১৯। গণতন্ত্রকে সফল করতে জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতার ভূমিকা কতটুকু?
২০। একনায়কতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?
২১। একনায়কতন্ত্রের ২টি বৈশিষ্ট্য লেখ ।
২২। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রে দল ব্যবস্থার প্রকৃতি কীরূপ?
২৩। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রে আইনসভার ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রকৃতি কীরূপ?
২৪। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রে সম্মতির ভূমিকা কীরূপ?
২৫। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা কীরূপ?
২৬। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার কাকে বলে?
২৭। দায়িত্বশীল সরকার কাকে বলে?
২৮। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে কী বোঝায়?
২৯। সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে সংসদের মর্যাদা ও ভূমিকা কীরূপ?
৩০। সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ও ভূমিকা কীরূপঃ
৩১। সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে মন্ত্রীদের মর্যাদা ও ভূমিকা কীরূপ?
৩২। এককেন্দ্রিক সরকার বলতে কী বোঝায়?
৩৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কী বুঝ?
৩৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গঠন পদ্ধতি কীরূপ?
৩৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন নীতি কী?
৩৬। যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব কী?
৩৭। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার জন্য ভৌগোলিক সান্নিধ্যের গুরুত্ব কতটুকু?
৩৮। বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় রাষ্ট্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার উপযোগী কেন?

৩৯। সমাজতান্ত্রিক সরকার বলতে কী বোঝায়?
৪০। কাল্পনিক সমাজতন্ত্র' বলতে কী বোঝায়?
৪১। সর্বহারার একনায়কত্ব' বলতে কী বোঝায়?
৪২। সমাজতান্ত্রিক সরকারের গুণগুলো কী?
৪৩। সমাজতান্ত্রিক সরকারের দোষগুলো কী?
৪৪। সামরিক সরকার কত প্রকার ও কী কী?
৪৫। সামরিক সরকারের দোষগুলো কী?
৪৬। ধর্মতান্ত্রিক সরকারের প্রকৃতি কীরূপ?
৪৭। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইন বিভাগ কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে?
৪৮। আইনসভার নির্বাচনমূলক কাজ কী কী?
৪৯। বাংলাদেশের আইনসভা কী কী নির্বাচনমূলক কাজ করে থাকে?
৫০। সংবিধান প্রণয়ন, সংশোধন ও পরিবর্ধনে আইনসভার ভূমিকা কী?
৫১। আইনসভা কীভাবে জাতীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করে?
৫২। আইনসভা কীভাবে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে?
৫৩। উদাহরণসহ নামমাত্র ও প্রকৃত শাসক সম্পর্কে ধারণা দাও।
৫৪। আইন প্রণয়নে শাসন বিভাগের ভূমিকা সম্পর্কে লেখ ।
৫৫। শাসন বিভাগের বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা ও কাজ কী?
৫৬। শাসন বিভাগের পররাষ্ট্রবিষয়ক কাজ কী কী?
৫৭। সংবিধানের বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা সম্পর্কে লেখ ।
৫৮। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বুঝ?
৫৯। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি বলতে কী বুঝ?
৬০। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতিতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ ।
৬১। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পর্কে মন্টেস্কুর মতামত লেখ ।
৬২। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয় কেন?
৬৩। শাসন বিভাগ কাকে বলে?
৬৪। আইন বিভাগ কাকে বলে?
৬৫। বিচার বিভাগ কাকে বলে ।
৬৬। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বুঝঃ

প্রয়োগ দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১। ছকের সাহায্যে এরিস্টটলের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। ছকের কোন সরকারকে তিনি সর্বাপেক্ষা বাস্তবধর্মী বা উত্তম
২। ছকের সাহায্যে আধুনিক সরকারের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।
৩। গণতন্ত্রকে আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সরকার বলা হয় কেন? যুক্তি দেখাও।
৪। গণতন্ত্র হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত শাসন একথা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

সূচিপত্র

৫। একনায়কতন্ত্র সর্বাপেক্ষানিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা তুমি কি এই উক্তির সাথে একমত। যুক্তি পেশ কর।

৬। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শাসনব্যবস্থা–উক্তিটির সমর্থনে যুক্তি দেখাও।

৭। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক একটি ছকের সাহায্যে দেখাও।

৮। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে?—ব্যাখ্যা কর।

৯। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে আইন বিভাগের সাথে শাসন বিভাগের সম্পর্ক একটি ছক/চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

১০ । সংসদীয়/মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের সাথে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনা কর।

১১ । সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে মন্ত্রীদের মর্যাদা ও ক্ষমতার তুলনা কর।

১২। সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ও ক্ষমতার তুলনা কর।

১৩। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন মেটাবার জন্য ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাই উপযুক্ত'—উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

১৪ । দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে তুমি কী কী যুক্তি দেখাবে?

১৫। একটি ছকের সাহায্যে শাসন বিভাগ সংগঠনের বিভিন্ন মাত্রা দেখাও।

১৬। একটি ছকের সাহায্যে শাসন বিভাগের কার্যাবলির শিরোনাম লেখ ।

১৭। বর্তমান সময়ে আইনসভার প্রভাব ও ক্ষমতা অনেকক্ষেত্রে হ্রাস পাচ্ছে এবং এর পাশাপাশি শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।–এর কারণ কী কী?

১৮। কোন কোন পদ্ধতিতে বিচারকদের নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে? এর মধ্যে কোন পদ্ধতিটি ভালো তা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

১৯। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তুমি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করবেঃ

২০। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা কর।

২১। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমালোচনা কী কী?

২২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পরিবর্তে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায় কেন? কারণ ব্যাখ্যা কর ।

২৩। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি কীভাবে কার্যকর হয়েছে?

চিন্তন দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কঠিন, কেননা এর পূর্বশর্ত অনেক—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২। গণতন্ত্রের ত্রুটিসমূহ বিশ্লেষণ কর।

৩। গণতন্ত্র অক্ষমতার শাসন প্রণালি –উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৪। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শাসনব্যবস্থা–উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর।

৫। নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রকে সকল শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলা যায়—উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর।

৬। বাংলাদেশের জন্য কোন ধরনের সরকার উপযোগী? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৭। বাংলাদেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রই উত্তম –উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

৮। যুক্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষ জটিল শাসনব্যবস্থা–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৯। বাংলাদেশে উত্তম সরকার প্রতিষ্ঠার পথে কী কী বিষয়কে তুমি অন্তরায় বলে মনে কর?

১০। তুমি কি মনে কর যে, বাংলাদেশে উত্তম সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? কীভাবে?

১১। সামরিক সরকার ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১২। এককক্ষের হাতে ক্ষমতার মেরুকরণ কক্ষটিকে স্বৈরাচারী, অসংযমী ও দুনীতিপরায়ণ করে তোলে—জেমস মিলের এই উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১৩। দ্বিতীয় কক্ষ যদি প্রথম কক্ষকে অনুসরণ করে তবে এটা অনাবশ্যক, আর যদি তা প্রথম পরিষদকে অনুসরণ না করে তবে তা অনিষ্টকর'—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১৪। বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা কোনো সরকারের যোগ্যতা বিচার করার অধিকতর উপযোগী মানদণ্ড আর নেই –উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

১৫। "ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়"—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১৬। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর।

সূচিপত্র

অষ্টম অধ্যায়

জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

PUBLIC OPINION AND POLITICAL CULTURE

আধুনিক গণতন্ত্র হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ হলো জনমত। সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতের ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। জনসম্মতির ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সরকারি দল জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে বাধ্য হয়। গণতন্ত্রে সদাজাগ্রত জনমত সরকারের স্বেচ্ছাচার রোধ করে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। জনমত সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে। জনমতের চাপে সরকার যুগোপযোগী, প্রগতিশীল ও জনকল্যাণের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এভাবেই জনমতের চাপে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতি সম্প্রতিকালে রাজনীতি বিজ্ঞান আলোচনায় রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। কোনো দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য রাজনৈতিক কৃষ্টি বা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কেননা একটি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও উন্নয়ন সে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা কৃষ্টির ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল।

শিখন ফল ঃ এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

১। জনমতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

২। জনমত গঠনের মাধ্যমগুলো বর্ণনা করতে পারবে।

৩। জনমত গঠনের বাহনসমূহের তুলনা করতে পারবে।

৪। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৫ । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে ।

৬। রাজনৈতিক সংস্কৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

৭। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনমতের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৮। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমতের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দ (Key Words):
জনমত (Public opinion), মিডিয়া, আইন সভা, সুশাসন (Good Governance), রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Political culture), রাজনৈতিক মনোভাব (Political idea), রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি (Political attitude), অর্ন্তনিহিত প্রকাশ (Inherent expression), জ্ঞান সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি (Cognitive Orientations)।

৮.১ জনমতের ধারণা ও সংজ্ঞা

Coception and Definition of Public Opinion

সাধারণ অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতকে জনমত' বলা হয়। এ অর্থে যে কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের সমষ্টিকে জনমত বলা যেতে পারে। কিন্তু পৌরনীতিতে সকল মতামতই জনমত নয়। পৌরনীতিতে কেবল প্রভাবশালী, যুক্তিযুক্ত, স্পষ্ট এবং কল্যাণকামী মতামতকেই জনমত বলা হয়। জনমত' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় রুশোর লেখনীতে। গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে জনমতের ধারণাও বিকশিত হতে থাকে।

এল. ডব্লিউ. ডুব (L, W. Doob)-এর মতে, "একই সামাজিক সংগঠনের সভ্য হিসেবে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জনগণের মতামতই জনমত।" (Public opinion refers to peoples attitudes onan issue when they are members of the same social groups.)

কিমবল ইয়ং (Kimbal Young) বলেছেন, "একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণ যে মতামত পোষণ করে, তাই জনমত।" (Public opinion consists of the opinions held by a public at a certain time.)

লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce)-এর মতে, "জনমত হলো সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের অভিমতের সমষ্টি।" (The aggregate of the views men hold regarding matters that affect the interest of the Community.)

ই. এম. সেইট (E.M. Sait)-এর মতে, "জনমত বলতে আমরা এই বুঝি যে, এটা হলো জনসমষ্টির মত, জনগণেরই মত।"

অধ্যাপক লাওয়েল বলেন, "জনমত বলে অভিহিত হওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হওয়াই যথেষ্ট নয়, আবার সকলের ঐকমত্যেরও প্রয়োজন নেই।" (In order that an opinion may be public a majority is not enough and unanimity is not required.)

জন স্টুয়ার্ট মিল-এর মতে, "কোনো সুনির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার ওপর জনগণের সংগঠিত অভিমতের নাম জনমত।" মরিস জিন্সবার্গ-এর মতে, "জনমত হলো সমাজের বিভিন্ন মতামতের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলাফল।" (Public opinion is a social product due to the interaction of many minds.)

অস্টিন রেনি-এর মতে, "জনমত হলো সেসব ব্যক্তিগত মতামতের সমষ্টি যার প্রতি সরকারি কর্মচারীবৃন্দ কিছুটা সজাগ এবং সরকারি কার্যাবলি নির্ধারণের সময় তারা এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, জনমত হচ্ছে কল্যাণধর্মী বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

৮.২ জনমতের বৈশিষ্ট্যসমূহ
Features of Public Opinion

জনমত সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও পৌরনীত বিশারদগণ আলোচনা করেছেন এবং সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাদের সেই আলোচনা ও সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাওয়া যায় ঃ

১. জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট মতামত ঃ জনমত হচ্ছে জনগণের সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অভিমত। ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত অভিমত জনমত নয়। ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত কোনো মত জনমত হতে পারে না যতক্ষণ তা সকল বা অধিকাংশ জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গড়ে না ওঠে।

২. জনকল্যাণকামী ঃ জনমত সৎ ও গণকল্যাণকামী। জনকল্যাণকামী না হলে তাকে জনমত বলা যায় না। তাছাড়া অসৎ কোনো মত বা চিন্তা গণকল্যাণ বয়ে আনে না এবং তা জনগণ গ্রহণও করে না।

৩. যুক্তিভিত্তিক ঃ জনমত যুক্তিভিত্তিক। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অযৌক্তিক মত জনমত নয়। গায়ের জোরে কোনো মত বা চিন্তা বা ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করা অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে বাধ্য।

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ঃ জনমত একজনের মতও হতে পারে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতও হতে পারে। তবে জনমত নির্ধারণে সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়।

৫. জাতীয় সমস্যা ও তার সমাধান ঃ মূল জাতীয় সমস্যা ও তার সমাধানকে কেন্দ্র করে জনমত গড়ে ওঠে। জনমত সবসময় একটি জাতির মূল সমস্যা এবং তার সমাধান কী হবে সেটাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থান পায়।

সূচিপত্র

৬. সুনির্দিষ্টতা ঃ জনমত সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। অস্পষ্ট মত বা মতের সমষ্টি জনমত নয়। অস্পষ্ট মত বা চিন্তা সর্বজন গ্রাহ্যতা পায় না।

৭. সুচিন্তিত ঃ জনমত সুচিন্তিত মত। লক্ষ্যহীন মতের সমষ্টিকে জনমত বলা যায় না। জনমত সুচিন্তিত এজন্য যে, তা সময়ের বিবর্তনে বহুজনের সমর্থনে গড়ে ওঠে।

৮. নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ঃ জনমত জনগণ ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। কেননা গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন। সরকার জনমতের চাপে যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সরকার জনমতের চাপে দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট হয়, প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করে তোলে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়।

৮.৩ জনমত সংগঠনের মাধ্যম বা বাহন

Methods or Media of Forming Public Opinion

আধুনিক গণতন্ত্র হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ হলো জনমত । সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতের ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনমত সংগঠনের ও প্রকাশের মাধ্যমগুলো নিম্নরূপঃ

১. সংবাদপত্র ঃ সংবাদপত্র জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম। সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ দেশ-বিদেশের যাবতীয় সংবাদ জানতে পারে, বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। বিরোধী দলের অভিমত সংবাদপত্র পাঠ করলে জানতে পারা যায়। সংবাদপত্রের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকারকে ংযত থাকতে হয়। এজন্যই বলা হয় যে, ‘প্রেস যেভাবে বলে, জনমত সেভাবে গড়ে ওঠে । তাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকা উচিত। তবে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করা উচিত নয়। কেননা তা সুষ্ঠ জনমত গঠনে সহায়ক নয়। অধ্যাপক লাস্কি তাই বলেছেন, “রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সৎ ও অবিকৃত সংবাদ পরিবেশন একান্ত প্রয়োজন ।”

২. পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম ঃ পত্র-পত্রিকাও জনমত সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো পত্র-পত্রিকা, প্রচারপত্র ও প্রাচীর পত্রের মাধ্যমে জনমত সংগঠনে সচেষ্ট থাকে ।

৩. সভাসমিতি ঃ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে জনমত গঠনে সভাসমিতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও বিশেষজ্ঞ এবং বুদ্ধিজীবিগণ সভা-সমিতির মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করে। এর ফলে জনগণ বিভিন্ন দল ও মতের তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে সঠিক মতামত তৈরি করতে সমর্থ হয়।

৪. চলচ্চিত্র, রেডিও ও টেলিভিশন ঃ চলচ্চিত্র, রেডিও ও টেলিভিশন জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণির মানুষকে সংগঠিত ও প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের ভূমিকা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাস্তবধর্মী ও চেতনামূলক ছায়াছবি পরিবেশনের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জনমত গঠনে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশ-বিদেশের খবরাখবর, সংবাদ পর্যালোচনা, সমীক্ষা, টক শো, সমাজ-সচেতন নাটক ইত্যাদি প্রচার করে রেডিও-টেলিভিশন সুষ্ঠু জনমত সংগঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. রাজনৈতিক দল ঃ রাজনৈতিক দল সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা, প্রাচীরপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রচার করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। সরকারি দল চেষ্টা করে নিজের সফলতাকে প্রকাশ ও প্রচার করে জনমত গঠনের। বিরোধী দলগুলোও সরকারের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালায়। রাজনৈতিক দল জনগণকে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুপ্রেরণা যোগায়। রাজনৈতিক দলের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড জনগণকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজ যারা ছাত্র-ছাত্রী, তাদের অনেকেই আগামী দিনে রাষ্ট্রনেতা বা নেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে শিক্ষা লাভ করে তাদের তা পরবর্তী জীবনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। শিক্ষকগণ যে আদর্শ বা ধ্যান-ধারণাকে কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য বলে যুক্তি প্রদর্শন করেন, ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

৭. আইনসভা ঃ আইনসভা বর্তমানে জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আইনসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিজ দলের পক্ষে এবং অপর দলগুলোর বিপক্ষে বক্তব্য ও যুক্তি প্রদান করে থাকেন। এসব বিতর্কের বিবরণ রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জনগণ এসব বক্তব্য-বিবৃতির মূল্যায়ন করে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতামত গঠন করে থাকে।

৮. পরিবার ঃ পরিবার হলো রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম। পরিবার সামাজিক জীবনের চিরন্তন বিদ্যাপীঠ। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পরিবারে যেসব আলাপআলোচনা হয় তা জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯. ধর্মীয় সংঘ ঃ অনেক সময় জনমত গঠনে ধর্মীয় সংঘগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা ধর্মীয় সংঘগুলোর আলোচনা বা উপদেশ জনগণকে অনেকটা প্রভাবিত করে।

১০. পেশা বা ব্যবসায় ভিত্তিক সংঘ ঃ বিভিন্ন পেশা-ভিত্তিক সংঘ, ইউনিয়ন বা সমিতি প্রায়ই বক্তব্য-বিবৃতি ও আলোচনা দ্বারা জনমত গঠনে সাহায্য করে।

৮.৪ গণতন্ত্র ও জনমত

Public Opinion and Democracy

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমতের ওপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্র ও জনমত প্রায় সমার্থক শব্দ। গণতন্ত্র হচ্ছে 'জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন । জনসম্মতির ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সরকারি দল জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে বাধ্য হয়। তাই বলা হয়ে থাকে যে, গণতন্ত্রে সদাজাগ্রত জনমত সরকারের স্বেচ্ছাচার রোধ করে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল জনমতকে ভয় করে চলে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে। জনমত সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে থাকে জনমতের চাপে সরকার রক্ষণশীল মনোভাব পরিত্যাগ করে। সরকার যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জনমত যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের অনুকূল থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সরকার দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে যে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণীত ও পরিবর্তিত হয় জনমতের চাপে বা প্রভাবে।

সুতরাং জনমত হচ্ছে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি বা প্রাণ।

৮.৫ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমত

যুক্তিযুক্ত, প্রভাবশালী, স্পষ্ট ও কল্যাণকামী মতামতকেই জনমত বলা হয়। গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে জনমতের ধারণাও বিকশিত হতে থাকে। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জনমতের ওপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্র ও জনমত প্রায় সমার্থক শব্দ। গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমত ও সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল জনমতকে ভয় করে চলে। জনমত গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়ে থাকে। জনমত সরকারকে । গতিশীল হতে সাহায্য করে থাকে। জনমতের চাপে সরকার যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার জনমতের চাপে জনকল্যাণকর আইন প্রণয়ন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুশাসনের জন্য সরকার এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সুষ্ঠু জনমত গড়ে তুলতে হলেও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সরকার জনমতের চাপে দুনীতি দূর করতে সচেষ্ট হয়, প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করে তোলে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। এভাবে জনমতের চাপে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, সুষ্ঠ জনমতের সাথে সুশাসনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়।

৮.৬ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঃ ধারণা ও সংজ্ঞা

Political Culture : Conception and Definition

অতি সাম্প্রতিককালে রাজনীতি বিজ্ঞান আলোচনায় রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। কোনো দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য রাজনৈতিক কৃষ্টি বা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কেননা একটি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও উন্নয়ন সে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা কৃষ্টির ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল।

অধ্যাপক জি. এ. আলমন্ড (G.A. Almond) বলেন, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এর বিভিন্ন অংশে ব্যক্তির নিজ ভূমিকা সম্পর্কে রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সুনির্দিষ্ট প্রতিকৃতি বা

সূচিপত্র

দিক নির্দেশনা।" (Political culture is the pattern of individual attitudes and orientations toward polities among the members of a political system.)

এ্যালান আর. বল (Allan R. Bal)-এর মতে, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমাজের সে সকল মনোভাব, বিশ্বাস, আবেগ ও মূল্যবোধ নিয়ে গঠিত হয়, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রশ্নসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত।" (Apolitical culture is composed of the attitudes, beliefs, emotions and values of society that relate to the political system and to political issues.)

সিডনি ভার্বা (Sidney verba) বলেন যে, "পরীক্ষালব্ধ বিশ্বাস, প্রকাশযোগ্য প্রতীক এবং মূল্যবোধের সমষ্টিই হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি ব্যাখ্যা করে রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনীতির মনস্তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশ করে।"

লুসিয়ান ডব্লিউ পাই (Lw. Pye)-এর মতে, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে মানুষের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস ও অনুভূতির এমন এক সমষ্টিকে বোঝায় যা রাজনৈতিক কার্যাবলিকে অর্থপূর্ণ করে তোলে এবং এদের মধ্যে একপ্রকার সুশৃঙ্খল ভাবের অভিব্যক্তি ঘটায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেই তাদের অন্তর্নিহিত ও মনস্তাত্বিক দিকের সার্বিক প্রকাশ ঘটে।"

ডেনিস ক্যাভাং (Dennis Kavangh)-এর মতে, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক বিষয়াদির প্রতি নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গির এক সামগ্রিক বন্টনব্যবস্থা।" সুতরাং রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে সেসব মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধকে বোঝায় যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৮.৭ রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Political Culture

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে রাজনৈতিক সংস্কৃতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায় ঃ

১. রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি (Political idea and attitude) ঃ একটি রাজনৈতিক সমাজের বা একটি দেশের মানুষ রাজনৈতিক বিষয়ে কী ভাবে বা চিন্তা করে এবং কী ভাবে বা চিন্তা করে অর্থাৎ তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি কীরূপ—তাই হচ্ছে উক্ত সমাজ বা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

২. রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি (Political Mirror) ঃ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ বা প্রতিচ্ছবি। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি দেখে সে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কীরূপ তা সহজেই অনুমান করা যায়।

৩. অন্তর্নিহিত ও মনস্তাত্বিক দিকের প্রকাশ (Inherent and Psychological expression)ঃ রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করে এর অন্তর্নিহিত ও মনস্তাত্বিক দিকের প্রকাশ ঘটায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দাবি যথাযথ স্থানে পেশ করতে সাহায্য করে।

8. রাজনৈতিক অনুভূতির সৃষ্টি (Affective Orientations or Collection of Political Thinking) ঃ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক অনুভূতিসমূহের সমষ্টি। একটি রাজনৈতিক সমাজে মানুষ যা ভাবে বা অনুভব করে তার সমষ্টিই হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি। -

৫. রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে জ্ঞান সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি (Cognitive Orientations) : রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার রীতিনীতি, লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি, বিরোধ মীমাংসার অনুসৃত নীতি-পদ্ধতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বিষয়ে ঐক্য ও সমঝোতা বিষয়ক জ্ঞান সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

৮.৮ জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঃ তুলনা, সম্পর্ক ও পার্থক্য

Public Opinion & Political Culture : Comparison, Relation and Distinction

তুলনা ঃ জনমত হলো জনগণের যুক্তিভিত্তিক ও সচেতন মতের সমষ্টি। অপরদিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধের সমষ্টি। জনমত দ্রুত গড়ে উঠতে পারে কিংবা ধীরে ধীরেও গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতি সাধারণত ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়। একটি বিশেষ ঘটনা বা সংবাদ জনমতকে পাল্টে দিতে পারে বা তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে জনমত পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু বিশেষ কোনো সময়ে সংঘটিত কোনো ঘটনা বা সংবাদ রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে পাল্টাতে বা পরিবর্তন করতে পারে না। রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হলে মানুষের মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দীর্ঘদিনের সযত্ন লালিত মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এ কাজ খুবই শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। জনমত অপেক্ষা রাজনৈতিক সংস্কৃতির শিকড় তাই সমাজের গভীরে প্রোথিত।

সম্পর্ক ঃ জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। জনমত বলতে জনকল্যাণকর ও সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রধান প্রধান জাতীয় সমস্যার ওপর জনগণের প্রভাবশালী অংশের যে মত তাকে বোঝায়। জনমত যুক্তিভিত্তিক ও সচেতন মত। সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ। কেননা গণতন্ত্র জনগণেরই শাসন। শিক্ষার বিস্তার না ঘটলে, সংবাদ মাধ্যম নিরপেক্ষ না হলে, জনগণের রাজনৈতিক চেতনার স্তর উন্নত না হলে, জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে না উঠলে সুষ্ঠু জনমত গড়ে ওঠে না। অর্থাৎ সুষ্ঠ জনমত গড়ে তুলতে হলে চাই সুস্থ ও উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি। জনগণের রাজনৈতিক মূল্যবোধ যদি সুস্থ ও উন্নত না হয়, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস যদি উদার ও মানবিক না হয়, জনগণ যদি অপরের মতের প্রতি সহনশীল না হয় সং মাধ্যম যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হয়—তাহলে আমরা বলতে পারি যে সেখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি বা উঠলেও তার মান অত্যন্ত দুর্বল। কোনো দেশে যদি রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান দুর্বল হয় তাহলে সে দেশে সুষ্ঠ জনমত গড়ে উঠতে পারে না। আবার জনমতের প্রভাবেও রাজনৈতিক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত ও প্রভাবিত হয়।

পার্থক্য ঃ জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে গভীর সম্পর্ককে স্বীকার করলেও একথা বলতে হয় যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও কম নয়। জনমত যত দ্রুত পরিবর্তনশীল, রাজনৈতিক সংস্কৃতি তত দ্রুত পরিবর্তনশীল নয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনেকটা স্থায়ী, কিন্তু জনমত অনেকটা অস্থায়ী। রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু জনমত গঠনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঘটনাবলিরও প্রভাব থাকতে পারে।

তবে জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে যত সূক্ষ্ম পার্থক্যই থাকনা কেন উভয়ের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি একে অপরকে প্রভাবিত ও সাহায্য করে থাকে।

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

(√ চিহ্নটি সঠিক উত্তর)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো—
ক. রাজনৈতিক আদর্শ
খ. রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা
গ. রাজনৈতিক আবেগ
ঘ, রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সুনির্দিষ্ট প্রতিকৃতি √
২। সাধারণ অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতকে কী বলা হয়?
ক, জনমত √
খ. স্বাধীনতা
গ. সকল জনগণের সকল মতামত
ঘ, জনগণের মতামত
৩। "একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণ যে মতামত পোষণ করে তাই জনমত"—এটি কার উক্তি?
ক. ই. এম. সেইট
খ. ই. এম. হোয়াইট
গ. এল. ডব্লিউ ডুব
ঘ, কিম্বল ইয়ং √
৪। জনমতের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক, জনমত সৎ ও জনকল্যাণধর্মী √
খ, জনমত সুচিন্তিত মতের বিরোধী
গ, জনমত সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নয়
ঘ, জনমত অযুক্তিভিত্তিক
৫। স্বৈরতান্ত্রিক প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে কারা?
ক.শিক্ষিত জনমত
খ, আবেগনির্ভর জনমত
গ. সদাজাগ্রত জনমত √
ঘ, স্বেচ্ছাচারী জনমত
৬। সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে কোনটি?
ক, দুনীতিমুক্ত মন্ত্রিসভা
খ, দুনীতিমুক্ত বিচার বিভাগ
গ, জনমত √
ঘ. নির্বাচন কমিশন
৭। সুষ্ঠ জনমত গঠনে কীসের গুরুত্ব অপরিসীম?
ক. শিক্ষার প্রসার
খ. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা √

গ. সামাজিক স্বার্থ
ঘ. ঐক্য ও সংহতির মনোভাব
৮। জনগণের যুক্তিভিত্তিক ও সচেতন মতের সমষ্টি কী?
ক. রাজনৈতিক সংহতি
খ, গণতন্ত্র
গ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি
ঘ, জনমত √
৯। জনসাধারণের ইচ্ছা কিসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়?
ক, সভা-সমিতি
খ, জনমত √
গ. সংবাদপত্র
ঘ, আইন পরিষদ
১০। জনমতের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই যথেষ্ট নয় এবং সব বিষয়ে ঐকমত্য অপরিহার্য নয়’–উক্তিটি কার?
ক, অস্টিন রেনী
খ. অধ্যাপক লাওয়েল √
গ, জন স্টুয়ার্ট মিল
ঘ. কিম্বল ইয়ং
১১। কোনটি জনমত?
ক. প্রভাবশালী ব্যক্তির মতামত
খ. অকল্যাণকামী মতামত
গ, কল্যাণকামী ও যুক্তিযুক্ত মতামত √
ঘ. বহু ব্যক্তির মতামত
১২। জনমত গঠনের মাধ্যম নয় কোনটি?
ক. সংবাদপত্র
খ, আইনসভা
গ. রাজনৈতিক দল
ঘ, আমলা-প্রশাসক √
১৩। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকে অগ্রাহ্য করার অর্থ–
ক. সরকারের পতন ডেকে আনা √
খ. সরকারের ক্ষমতা শক্ত হওয়া
গ, জনগণের শক্তি বৃদ্ধি করা
ঘ, সরকারের স্থায়িত্ব কাল বৃদ্ধি করা
১৪। গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে—
ক, জনমত √
খ. মন্ত্রিসভা
গ. উপদেষ্টামণ্ডলী
ঘ, রাজনৈতিক দল
১৫। সমার্থক শব্দ কোনটি?

ক. জনমত ও একনায়কতন্ত্র
খ. জনমত ও সমাজতন্ত্র
গ, জনমত ও গণতন্ত্র √
ঘ, জনমত ও স্বৈরতন্ত্র
১৬। গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন দল জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে কেন?
ক বিরোধী দলের ভয়ে
খ, সেনাবাহিনীর ভয়ে
গ. গৃহযুদ্ধের আশঙ্কায়
ঘ. ক্ষমতা হারানোর ভয়ে √
১৭। সংবাদপত্রে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করা উচিত নয়। কারণ এর ফলে রাষ্ট্রে সৃষ্টি হয়—
ক, বিশৃঙ্খলা √
খ. বিদ্রোহ
গ. গৃহযুদ্ধ
ঘ. অনৈক্য
১৮। কাকিনা উত্তর বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ মনোয়ারুল ইসলাম বলেন, আমাদের দেশে সুষ্ঠ জনমত গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। এজন্য করণীয়—
ক. জনগণকে সচেতন ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলা
খ, সুস্থ ও উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা √
গ, গতিময় ও স্থায়ী রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা
ঘ, শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা
১৯। কীসের ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে?
ক. নেতাকর্মীদের ওপর
খ. নির্বাচনের ওপর
গ. অধিক ভোট প্রাপ্তির ওপর
ঘ, সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতের ওপর √
২০। সচেতন জনমতের প্রভাবে কী হয়?
ক. সরকার সচেতন হয়
খ, সরকার গতিশীল হয় √
গ. সরকার দক্ষ হয়
ঘ, সরকার আরো গণতান্ত্রিক হয়

বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১। পৌরনীতি ও সুশাসনে সকল মতামত জনমত নয়। কেননা পৌরনীতি ও সুশাসনে জনমত বলা হয়—
i. প্রভাবশালী মতামতকে
ii, যুক্তিভিত্তিক মতামতকে
iii. জনকল্যাণধর্মী মতামতকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii

সূচিপত্র

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii √

২২। রাজনৈতিক সংস্কৃতি দুর্বল হলে সৃষ্টি হয়—

i. যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা লাভের মোহ

ii. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

iii. উপদলীয় কোন্দল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. Iii

ঘ. i, ii ও iii √

২৩। মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত "অরুনোদয়ের অগ্নিসাক্ষী" একটি ভালো সিনেমা। এত দেখানো হয়েছে–

i. মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ দিকগুলো

ii. মুক্তিবাহিনীর গৌরবময় ভূমিকা

iii. সস্তা বিনোদন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও iii

খ. ii ও iii

গ. iii

ঘ. i ও ii √

২৪। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান সুস্থ ও সবল হওয়া উচিত—

i, সুষ্ঠ জনমত গঠনের জন্য

ii. সুষ্ঠু রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য

iii. সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনার জন্য নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i √

খ. ii.

গ. Iii

ঘ. i, ii ও iii √

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে সীডর, আইল্যা, মহাসেন প্রভৃতি বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই আঘাত হেনে চলেছে। সংবাদপত্রে এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়। ফলে সরকার সজাগ হয়ে ওঠে এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সাম্প্রতিক সময়ে মহাসেন মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।

২৫। সংবাদ মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে লেখালেখির ফলাফল কী হয়?

i, জনমত বিভ্রান্ত হয়

ii. জনমত গড়ে ওঠে

iii. সংবাদপত্রের বিক্রি বেড়ে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii √
গ. iii
ঘ. । ও iii
২৬। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে লেখালেখির ফলে সরকারের প্রতিক্রিয়া কী হয়?
i, সংবাদপত্র সম্পাদকদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়
ii. সংবাদপত্রের ভূমিকার সমালোচনা করে
iii. সময়োপযোগী ও সুষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ. Iii √
ঘ. । ও ii

খ. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বেগম রোকেয়া কলেজের অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম জনমত সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে পড়াতে গিয়ে বলেন যে, সাধারণ অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতকে জনমত বলা হয়। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনে সকল মতামতই জনমত নয়। শিউলি আখতার নামে একজন ছাত্রী দাড়িয়ে বললো যে, তাহলে কোন মতকে জনমত বলা যাবে? অধ্যাপক সাহেব বললেন যে, সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ।

প্রশ্ন ঃ

ক. জনমত কী?

খ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বুঝ?

গ, জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল এবং রেডিও ও টেলিভিশনের ভূমিকা কতটুকু ব্যাখ্যা কর।

ঘ, "সুষ্ঠু ও সচেতন জনমত গণতন্ত্রের প্রাণ"—উদ্দীপকে উল্লেখিত উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ২০১০ সালে কারমাইকেল কলেজ পরিদর্শনে এলে ছাত্র-শিক্ষক, স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও সুশীল সমাজ তাকে এ কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ছাত্র ভর্তির অনুমোদন প্রদানের জন্য অনুরোধ জানায়। তিনি বলেন যে, বর্তমান সরকার শিক্ষার প্রসারে সদা সচেষ্ট ও আন্তরিক এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অচিরেই কারমাইকেল কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ছাত্রভর্তির অনুমোদন দেয়া হবে।' মন্ত্রী মহোদয় ঢাকায় ফিরে যাবার অল্পদিন পরই কলেজটি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ছাত্রভর্তির অনুমোদন লাভ করে।

প্রশ্ন:

ক. জনমতের একটি সংজ্ঞা লেখ।
খ. জনমতের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
গ, জনমত গঠনে বর্তমানে কোন কোন মাধ্যমকে তুমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর এবং কেন?

সূচিপত্র

ঘ, সুষ্ঠ জনমতের সাথে সুশাসনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়–উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

৩. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

হাসিব, সুহৃদ ও সুহাস টেলিভিশনে বড় বড় নেতাদের দেখতে দেখতে চিনে ফেলেছে। তারা লক্ষ্য করে যে, তাদের প্রতিবেশী এবং বাড়ির বড়রা সভা সমাবেশ থেকে বাড়িতে ফিরে এসে অনেক নেতার পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলেন। অনেক সময় এভাবে কথা বলার সময় তাদের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনাও দেখা দেয়। হাসিব, সুহৃদ ও সুহাসের দাদু একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। তিনি এদের সবাইকে সহনশীল ও উদার হতে বলেন। দাদুর মতে, এসব গঠনমূলক আলোচনা থেকে সুস্থ জনমত গড়ে ওঠবে।

প্রশ্নঃ

ক. পৌরনীতি ও সুশাসনে কী ধরনের মতামতকে জনমত বলা হয় ।

খ, জনমত গঠনে পরিবারের ভূমিকা কীরূপ?

গ, জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক বর্ণনা কর।

ঘ, সুস্থ জনমত গড়ে তোলার জন্য দাদু কীসের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেনঃ দাদুর দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ কর।

৪. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জাকিরুল আলম সাহেব যুক্তিবাদী ও রাজনীতি সচেতন মানুষ হিসেবে এলাকায় সবার শ্রদ্ধেয়। তার পাড়ায় দুজন রাজনীতিবিদ এদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা। দল দুটিকে যেমন কোনো বিষয়েই একমত হতে দেখা যায় না, তেমনি এ দুজনও সবসময় পরস্পর বিরোধী অবস্থান নিয়ে থাকেন। জাকিরুল আলম সাহেব এ দুজন নেতাকে এর অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করেন। তিনি সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার ওপর সবসময় গুরুত্ব প্রদান করেন। এর ফলে তার বক্তব্যের সপক্ষে জনমত গড়ে ওঠছে।

প্রশ্নঃ

ক. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বুঝ?

খ, জনমত গঠনে আইনসভার ভূমিকা কতটুকু?

গ, জাকিরুল আলম সাহেব কীভাবে জনমত গড়ে তুলছেন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ, জাকিরুল আলম সাহেব সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন কেন? যুক্তি দেখাও।

৫. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাংলাদেশের বেশ কিছু দৈনিক পত্রিকা রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, পরিবেশবিদসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিভিন্ন ইসুযতে দেয়া বক্তব্যের ওপর জরিপ চালান। নির্দিষ্ট কিছু মানুষের কাছে এসব বক্তব্য সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয়। অনেক সময় দেশের চলমান সংকট কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ইসু নিয়েও এরূপ জরিপ চালানো হয় এবং তা প্রকাশ করা হয়। এর ফলে সুষ্ঠু জনমত গড়ে ওঠে।

প্রশ্নঃ

ক. জন স্টুয়ার্ট মিল প্রদত্ত জনমতের সংজ্ঞাটি লেখ।

খ. জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কতটুকু?

গ. বাংলাদেশে জনমত গঠনের জন্য তুমি কোন কোন মাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর? যুক্তি দিয়ে আলোচনা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে সংবাদপত্র যেভাবে জনমত গড়ে তুলছে তা যথার্থ তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

সূচিপত্র

৬. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জনমতের ওপর নির্ভরশীল। ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদল উভয়ই জনমতকে ভয় করে চলে। সরকার জনকল্যাণ স্থাপনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তা সাধারণত জনমতের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়ে থাকে। জনমত হচ্ছে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি বা প্রাণ।

প্রশ্নঃ

ক. কী ধরনের মতামতকে পৌরনীতি ও সুশাসনে জনমত বলা হয়?

খ, জনমত সংগঠনের মাধ্যমে বা বাহন হিসেবে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সম্পর্কে লেখ।

গ, জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি একে অপরকে কীভাবে প্রভাবিত ও সাহায্য করে থাকে? আলোচনা কর।

ঘ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ'-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

[এ অধ্যায়ের প্রশ্ন-সংকেত]

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। জনমত কী বা কাকে বলে?
২। জনমতের সংজ্ঞা দাও।
৩। জন স্টুয়ার্ট মিল প্রদত্ত জনমতের সংজ্ঞাটি লেখ।
৪। লর্ড ব্রাইস প্রদত্ত জনমতের সংজ্ঞাটি লেখ।
৫। এল. ডব্লিউ. ডুব প্রদত্ত জনমতের সংজ্ঞাটি লেখ।
৬। রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী বা কাকে বলে?
৭। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে জি. এ. আলমন্ড প্রদত্ত সংজ্ঞাটি লেখ।
৮। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে সিডনি ভার্ব প্রদত্ত সংজ্ঞাটি লেখ।
৯। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে এ্যালান আর. বল প্রদত্ত সংজ্ঞাটি লেখ।
১০। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে লুসিয়ান ডব্লিউ পাই প্রদত্ত সংজ্ঞাটি লেখ।
১১। কিম্বল ইয়ং প্রদত্ত জনমতের সংজ্ঞাটি লেখ।
১২। মরিস জিন্সবার্গ প্রদত্ত জনমতের সংজ্ঞাটি লেখ।
১৩। পৌরনীতি ও সুশাসনে কী ধরনের মতামতকে জনমত বলা হয়?
১৪। জনমতকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের কী মনে করা হয়?
১৫। সুষ্ঠু জনমত গড়ে তুলতে হলে কী প্রয়োজন?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। জনমতের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
২। জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা কী?
৩। জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কী?
৪। জনমত গঠনে সভাসমিতির ভূমিকা কী?
৫। জনমত গঠনে চলচ্চিত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনের ভূমিকা কী?

৬। জনমত গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী?

৭। জনমত গঠনে আইনসভার ভূমিকা কী?

৮। জনমত গঠনে পরিবারের ভূমিকা কীরূপ?

৯। জনমতের ৩টি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখ ।

১০ । জনমতের মাধ্যম বা বাহনগুলোর নাম লেখ ।

১১। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বুঝ?

১২। রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট কী কী?

প্রয়োগ দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১। জনমত সংগঠনের বা প্রকাশের জন্য তুমি কোন কোন মাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর? আলোচনা কর।

২। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমতের ওপর নির্ভরশীল—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৩। সুষ্ঠু জনমত গড়ে তোলার জন্য তুমি কী কী শর্ত বা বিষয়কে প্রাধান্য দিবে?

৪। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সৎ ও অবিকৃত সংবাদ পরিবেশন একান্ত প্রয়োজন—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর ।

৫ । 'গণতন্ত্র ও জনমত প্রায় সমার্থক'_ব্যাখ্যা কর। -

৬। সুষ্ঠ জনমত গঠন করার জন্য প্রচার মাধ্যমকে ক্ষমতাসীন দল বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখা উচিত—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৭। জনমত হলো যুক্তিভিত্তিক ও সচেতন মতের সমষ্টি –ব্যাখ্যা কর।

৮। জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির তুলনা কর।

৯। প্রেস যেভাবে বলে বা চায়, জনমত সেভাবে গড়ে ওঠে—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

১০। রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দর্পণ বা প্রতিচ্ছবি-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

চিন্তন দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১। জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ'-উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২। সুষ্ঠু জনমত গড়ে তুলতে হলে চাই সুস্থ ও উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি—উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

৩। জনমতের ওপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভরশীল—উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

৪। রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ–উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

৫। রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্কে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে?

৬। যে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি যত বেশি উন্নত, সে দেশের রাজনীতির মানও তত উন্নত—উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর ।

৭। জনগণের রাজনৈতিক বিন্যাস যদি প্রগতিশীল হয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ যদি উন্নত হয়, জনগণ ও রাজনৈতিক নেতাকমীরা যদি পরমতসহিষ্ণু হয় তাহলে একদিকে যেমন রাজনৈতিক সংস্কৃতি উন্নত হবে তেমনি গণতন্ত্রও সার্থক এবংগ্রেস্থ হয়ে উঠবে"—উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

সূচিপত্র

নবম অধ্যায়

জনসেবা ও আমলাতন্ত্র

PUBLIC SERVICE AND BUREAUCRACY

আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমলা বা সিভিল সার্ভেন্ট ছাড়া কোনো দেশের পক্ষেই সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সাধারণত রাষ্ট্রীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মন্ত্রী বা রাজনৈতিক প্রশাসকগণ। এসব নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন আমলারা। রাজনৈতিক প্রশাসক বা মন্ত্রীদের সময়ের অভাব বা কর্মব্যস্ততা,তাদের টেকনিক্যাল ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি কারণে নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা আমলাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। বর্তমান জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ও কার্যাবলি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।

শিখন ফল ঃ এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। আমলাতন্ত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২। আমলাতন্ত্রের প্রধান কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩। জনসেবায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৪। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দ (Key words): আমলা (Bureaucrat), আমলাতন্ত্র (Bureaucracy), পদসোপান (Hierarchy), নিয়োগ ও পদোন্নতি (Appointment and Promotion), প্রশিক্ষণ (Training), আনুষ্ঠানিকতা (Formality), দক্ষতা (Skill), নিরপেক্ষতা (Neutrality), যুক্তিসংগত মডেল (Legal & rational model), লাল ফিতার দৌরাত্ম্য (Red Tapism), জনবিচ্ছিন্নতা (Public Isolation), জনসেবা (Public Service), জবাবদিহিতা (Accountability), দায়িত্বশীলতা (Responsibility)

৯-১ আমলাতন্ত্র ঃ ধারণা, সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

Bureaucracy : Conception, Definition and Nature

আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমলা বা সিভিল সার্ভেন্ট ছাড়া কোনো দেশের পক্ষেই সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

আমলা' আরবি শব্দ। এর অর্থ আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন। শব্দগতভাবে তাই যে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকারের আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন করে তাদেরকে আমলা বলে। আমলাদের সংগঠনকে বলে আমলাতন্ত্র।

অন্যদিকে আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Bureaucracy. তবে ফরাসি ব্যুরো' (Bureau) এবং গ্রিক ক্রেটিন' (Kratein) শব্দ থেকে ব্যুরোক্রেসি (Bureaucracy) শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। ব্যুরো' শব্দের অর্থ লেখার টেবিল (Desk) এবং ক্রেটিন' শব্দের অর্থ শাসন। সুতরাং উৎপত্তিগত অর্থে আমলাতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে “Desk Government” বা “দপ্তর সরকার”। আক্ষরিক অর্থে “আমলাতন্ত্র” বলতে আমলা বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের শাসন বোঝায়। আমলাতন্ত্র হচ্ছে স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ ও পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন। আমলারা সুশৃঙ্খলভাবে পরস্পর সংযুক্ত এবং রাজনীতিনিরপেক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন। আমলাতন্ত্রের আধুনিক আলোচনার অগ্রনায়ক প্রখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার। তিনি সর্বপ্রথম আমলাতন্ত্রকে একটি আইনগত ও যুক্তিসঙ্গত মডেল (Legal and rational model) হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনিই ছিলেন আদর্শ আমলাতন্ত্রের (Ideal Bureaucracy) উদ্ভাবক।

অধ্যাপক ফিফনার এবং প্রেসথাস (Prof. Priffner and Presthus)-এর মতে, “আমলাতন্ত্র হলো বিভিন্ন ব্যক্তি এবং তাদের কার্যাবলিকে এমন একটি পদ্ধতিতে সংগঠিত করা যা সুসংহতভাবে গোষ্ঠী শ্রমের উদ্দেশ্য অর্জনে

সক্ষম R3 I” (Bureaucracy is the systematic organization of tasks and individuals into a pattern which can effectively attain the end of group effort.)

পল এইচ. অ্যাপলবি (Poul. H. Apperby) বলেন, “আমলাতন্ত্র অসংখ্য ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে ও জটিল শর্তে সুশৃঙ্খলভাবে পরস্পর একত্রিত হওয়াকে বোঝায়।” (Bureaucracy is inseparable from the phenomenon of systematic interaction of many persons associated in common and complex terms.)

অধ্যাপক ফাইনার (Prof Finer) বলেন, “আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী, বেতনভুক্ত এবং দক্ষ চাকরিজীবী শ্রেণি।” (The civil service is a body of officials—permanent, paid and skilled.)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আগ (ogg) বলেন, “রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দ বা আমলা হচ্ছেন সুদক্ষ, পেশাদারি, অরাজনৈতিক, স্থায়ী এবং অধীনস্থ কর্মকর্তা।” (The body of the civil servants is an expert, professional, non-political, permanent and subordinate staff.)

সুতরাং আমলাতন্ত্র হলো স্থায়ী, বেতনভুক্ত, দক্ষ ও পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন। আমলাতন্ত্র সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে।

৯.২ আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

Characteristics or Features of Bureaucracy

আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় ঃ –

১. দক্ষতা ঃ আমলা বা সরকারি কর্মকর্তাগণ হলেন দক্ষ। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে কর্মচারীরা সর্বোচ্চ মাত্রায় বিশেষ দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট থাকেন। কেবল ব্যক্তির দক্ষতা নয়, সংগঠনের দক্ষতাও আমলাতন্ত্রে সর্বোচ্চ মাত্রায় লক্ষ করা যায়। আমলাতন্ত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

২. সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র ঃ আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্মচারীদের কাজ ও দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। কর্মকর্তা কর্মচারিগণ নিয়মিত কাজ বা কর্তব্য হিসেবে এগুলো করে থাকেন। কর্মকর্তাকর্মচারিগণ সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন।

৩. পদ সোপানভিত্তিক ঃ আমলাতান্ত্রিক সংগঠন পদসোপানভিত্তিক (Hierarchical)। পদ সোপান নীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস ও সংগঠন করা হয়। প্রত্যেক নিম্নতর পদই কোনো উচ্চতর পদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন পদের মধ্যে কর্তৃত্বগত সম্পর্ক থাকে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ নির্দেশ নিম্নতর কর্মকর্তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকেন।

৪. পেশাদারি ও বেতনভুক্ত ঃ আমলা বা বেসামরিক সরকারি কর্মচারিগণ পেশাদারি ও বেতনভোগী। তারা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতাদি পান।

৫. নিরপেক্ষতা ঃ আমলা প্রশাসন রাজনীতি নিরপেক্ষ সংগঠন। আমলার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে, ঘৃণা ও আবেগকে পরিহার করে নিয়মসিদ্ধভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। প্রত্যেক কর্মচারীই তার ব্যক্তিগত জীবনকে প্রশাসনিক জীবন থেকে পৃথক রাখেন।

৬. নিয়োগ ও পদোন্নতি ঃ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনে নিয়াগ প্রদান করা হয় মেধার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। সিনিয়রিটি বা জ্যেষ্ঠতা এবং কৃতিত্ব বা সাফল্য এই দুই মানদণ্ডেই তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়।

সূচিপত্র

৭. আনুষ্ঠানিকতা ঃ আমলাতন্ত্রে আনুষ্ঠানিকতার ওপর, অনমনীয় বিধি ও কার্যপদ্ধতির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বিধি মোতাবেক যথাযথ নিয়মে সবকিছু করা হয়। সমস্ত কাজই হয় রুটিনমাফিক।

৮. স্থায়িত্ব ঃ আমলাদের চাকরি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্থায়ী। অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকেন। সরকার পরিবর্তন ঘটলেও তারা থেকেই যান। শুধুমাত্র দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তারা চাকরিচ্যুত হতে পারেন।

৯.৩ আমলাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও চাকরির শরত

Appointment, Training and Conditions of service of the Bureaucrats

আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের সদস্যদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও চাকরির শর্তাদি নির্দিষ্ট থাকে। এগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

আমলাদের নিয়োগ (Appointment) ঃ সাধারণত সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা আমলাদের নিয়োগ বিধি নির্ধারণ করা হয়। আমলাদের নিয়োগপদ্ধতি নিরপেক্ষ হয়ে থাকে স্বজনপ্রীতি যেন না ঘটে সেজন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে আমলাদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এজন্য এক বা একাধিক নিরপেক্ষ কর্ম কমিশন (Public Service Commission) গঠন করা হয়।

আমলাদের প্রশিক্ষণ (Training) ঃ কর্মে নিযুক্তি লাভের পর আমলাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে তোলা হয়। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে তাদেরকে দৈহিক ও মানসিকভাবে উপযুক্ত করে তোলা হয় এবং নিজ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে অবহিত করা হয়। প্রশাসনিক বিধি-বিধান সম্পর্কে এ সময়ে তাদেরকে পুথিগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান দান করা হয়।

আমলাদের চাকরির শর্তাবলি (Conditions of service) ঃ সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে সংসদ (Parliament) আইনের দ্বারা আমলাদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে এরূপ বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপ্রধান তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে আমলা বা প্রশাসক পদে নিয়োগলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নিজরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হয়, নির্দিষ্ট বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়। সংবিধান নির্দিষ্ট বা অপেক্ষা অধঃস্তন কর্তৃপক্ষ দ্বারা বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনত করা যাবে না। চুক্তির মাধ্যমে কোনো কর্মচারী নিযুক্ত হয়ে থাকলে চুক্তির অবসানের সাথে সাথে তার কর্মের অবসান ঘটবে।

৯.৪ আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি

Functions of Bureaucracy

আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে আমলাদের কাজের পরিধি নিম্নরূপঃ

১. আইন কার্যকর করা ঃ আমলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করে সরকারের প্রাত্যহিক রুটিনমাফিক কাজ সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ আমলারাই আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন।

২. আইন প্রণয়নে সাহায্য দান ঃ বর্তমানে আইনসভায় উপস্থাপিত খসড়া বিলের অধিকাংশই আমলারা প্রস্তুত করে থাকেন। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়, অর্থ-ব্যাংক-বিমা সম্পর্কিত বিষয়ে খসড়া বিল প্রশাসনিক বিভাগই তৈরি করে থাকে। তবে এগুলো আইনসভায় উপস্থাপন করতে হয় এবং সেখানে তা সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

৩. সরকারি নীতি নির্ধারণে সাহায্য দান ঃ সাধারণত বলা হয় যে, আমলাদের কাজ সরকারি নীতি বাস্তবায়ন, নীতি নির্ধারণ নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, মন্ত্রী বা রাজনৈতিক প্রশাসকগণ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয়ে নীতি

নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমলাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে থাকেন। কেননা আমলারা এসব বিষয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অধিকারী। -

৪. বিচার সংক্রান্ত কাজ ঃ ট্রেড মার্ক, জমি ক্রয়-বিক্রয় রেজিস্ট্রি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমলারাই আইন মোতাবেক অনেক বিরোধ মীমাংসা করে থাকেন। আমলারাই এ সব বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে থাকেন।

৫. দৈনিক কার্যাবলি সম্পাদন ঃ আমলারা বিধি মোতাবেক রুটিনমাফিক প্রশাসনিক কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকেন।

৬. সরকারের নিকট জনগণের দাবি-দাওয়া জ্ঞাপন ঃ আমলারা সরকারের নিকট বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থ এবং দাবি-দাওয়া তুলে ধরে থাকেন।

৭. তথ্য পরিবেশন ঃ আমলাতন্ত্র আইনসভার সদস্য ও মন্ত্রীদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও পরিসংখ্যান প্রদান করে থাকে। আমলাদের পরিবেশিত তথ্যাদিই সরকার দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করে থাকে।

৮. পেশাগত ও নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা ঃ আমলাতন্ত্র পেশাগত ও নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।

সুতরাং আমলাতন্ত্র আধুনিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি উপসর্গ। বর্তমান জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।

৯.৫ আমলাতন্ত্রে জনবিচ্ছিন্নতা ও লালফিতার দৌরাত্ম্য
Public Isolation and Red Tapism in Bureaucracy

জনবিচ্ছিন্নতা ঃ আমলা বা বেসামরিক কর্মকর্তাগণ রাজনৈতিক প্রশাসকদের মতো জনপ্রতিনিধি নন। জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক ও দাপ্তরিক। আমলাগণ তাদের কাজের জন্য সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। আমলাদের শিক্ষাদীক্ষা, জীবন ধারণ পদ্ধতি, গোষ্ঠীগত সংহতি, দৃষ্টিভঙ্গি সব কিছুই সাধারণ জনগণ থেকে অনেকটা ভিন্ন। অনুন্নত বিশ্বে আমলাগণ নিজেদেরকে জনগণের সেবক মনে করেন না। আমলারা মনে করেন তারাই জনগণের প্রভু"। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসনই এর জন্য দায়ী। এর ফলে আমলারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অনেক সময় তারা নিজেরাও জনবিচ্ছিন্ন থাকতে ভালোবাসেন।

লালফিতার দৌরাত্ম্য ঃ লালফিতা বলতে পূর্ববর্তী নিয়মকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়। Red Tapism' বা লালফিতা প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত হয়। সে সময়ে সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। এখান থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য কথাটির ব্যবহার শুরু হয়। আমলাতন্ত্রে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য খুব বেশি। আমলারা খুব বেশি আনুষ্ঠানিক (Formal)। সবকিছুই তারা করতে চান প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে। এর ফলে সমস্যার মানবিক দিকটি উপেক্ষিত হয়। সমস্যা-সমাধানে বিধি মোতাবেক যথাযোগ্য নিয়মে (Through Proper channel) অগ্রসর হতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় এবং সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। জনগণের চাওয়া পাওয়া, আবেদন আমলাতন্ত্রের ফাইলের লালফিতার বাধনে আটকা পড়ে থাকে। জনগণের হয়রানি বেড়ে যায়। এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনের মুহূর্তেও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না। এর ফলে শুধু

আমলাতন্ত্রই অপ্রিয় হয়ে ওঠে না, নির্বাচিত সরকারও জনবিচ্ছিন্ন ও অপ্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য, আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি, অহেতুক বিলম্ব—এসব বোঝাতেই মন্দ অর্থেই লালফিতার দৌরাত্ম্য' শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

৯.৬ জনসেবা

Public Service

অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা। জনসেবা মানুষের এক মহৎ গুণ, এক মহৎ হৃদয়বৃত্তি। মহৎ হৃদয় মানুষই কেবল জনসেবা করতে পারে। জনসেবা করতে চাইলে উদার মনের মানুষ, বড় হৃদয়বান মানুষ হতে হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ সমাজে জন্মগ্রহণ করে, সমাজে লালিত-পালিত হয় এবং সমাজেই মৃত্যুবরণ করে। এজন্যই এরিস্টটল বলেছেন যে, মানুষ স্বভাবই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। যে সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু নয়তো দেবতা। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে পারস্পরিক সাহায্য ছাড়া কেউ চলতে পারে না। মানুষ তাই বিপদে-আপদে একে অন্যের পাশে এসে দাড়ায়, সহমর্মিতা দেখায়।

পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মেই মানবসেবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ধর্মীয় গুরু, নবি-পয়গম্বর, মহামানবগণ জনসেবার অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

জনসেবা করতে চাইলে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়। কোনো প্রতিদানের আশায় নয়, অপরের দুঃখকষ্টে পাশে দাঁড়ানের মানসিকতা, অপরের জন্য নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বর্থকে উপেক্ষা করার মন নিয়েই জনসেবা করতে হয়।

অর্থহীনকে অর্থ দিয়ে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিয়ে, ক্ষুধার্তকে খাবার দিয়ে, অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা শুশ্রষা দিয়ে সেবা করা যায়। রাজনীতিবিদরা জনকল্যাণে কাজ করে, আমলা প্রশাসকরা নিজেদেরকে জনগণের সেবক ভেবে কাজ করলে সেটাও জনসেবা। মোটকথা জনসেবার সময় প্রত্যেককে ভাবতে হবে যে,

"সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

৯.৭ আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন

Accountability of Bureaucracy and good governance

আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমলা বা জনকৃত্যক (সিভিল সার্ভেন্ট) ছাড়া কোনো দেশের পক্ষেই সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সাধারণত নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মন্ত্রী বা রাজনৈতিক প্রশাসকগণ। এসব নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন আমলারা। এমনকি নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও আমলারা অনেক সময় রাজনৈতিক প্রশাসকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। রাজনৈতিক প্রশাসক বা মন্ত্রীদের সময়ের অভাব বা কর্মব্যস্ততা, তাদের টেকনিক্যাল ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি কারণে নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত। গ্রহণে তারা আমলাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই আমলাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত গতিতে বেড়েই চলেছে। আমলা বা বেসামরিক কর্মকর্তাগণ রাজনৈতিক প্রশাসকদের বা মন্ত্রীদের মতো জনপ্রতিনিধি নন। জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক ও দাপ্তরিক। আমলাগণ তাদের কাজের জন্য সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। তাদের

শিক্ষাদীক্ষা, জীবনযাপন পদ্ধতি, গোষ্ঠীগত সংহতি সব কিছুই সাধারণ জনগণ অপেক্ষা অনেকটা ভিন্ন। অনুন্নত বিশ্বে আমলাগণ নিজেদেরকে জনগণের সেবক না ভেবে জনগণের প্রভু' মনে করেন। এর জন্য অবশ্য অতীতের ঔপনিবেশিক শাসনই দায়ী। জবাবদিহিতার অভাবের জন্য আমলারা স্বেচ্ছাচারীও হয়ে ওঠেন। ফলে তারা দ্রুত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাদের দৌরাত্ম্য, আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অহেতুক বিলম্ব বৃদ্ধি পায়। লালফিতার দৌরাত্ম্যে (Red Tapism) জনসেবা ও জনকল্যাণ বাধাগ্রস্ত হয়। জনগণ হয়রানির শিকার হয়। প্রশাসনে দুর্নীতির বিস্তার ঘটে। জবাবদিহিতার অভাব এবং অস্বচ্ছতার অভাবে আমলারা শুধু দুর্নীতিপরায়ণই হয়ে ওঠে না তারা হয়ে পড়ে স্বৈরাচারী। ফলে যা সৃষ্টি হয় তাকে অপশাসন (Bad governance) বলা হয়।

জবাবদিহিতা সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক বা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যদি সরকার অর্থাৎ শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়, যদি প্রশাসন স্বচ্ছ হয়, তথ্যের অবাধ প্রবাহ প্রতিষ্ঠিত হয়, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করা হয়, শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকে তাহলে দুর্নীতির বিস্তার ঘটতে পারে না। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

জবাবদিহিতার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সরকার পরিচালনা এবং প্রশাসন পরিচালনায় জবাবদিহিতার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মন্ত্রিসভা ও শাসন বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করবে। প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা আমলারা জনপ্রতিনিধিদের নিকট জবাবদিহি করবে। শুধু তাই নয় আমলারা তাদের উর্ধ্বতন আমলা-প্রশাসকদের নিকটও জবাবদিহি করবে।

৯.৮ জনসেবায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

আমলাতন্ত্রকে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ বলা হয়। আমলা বা সিভিল সার্ভেন্ট ছাড়া কোনো দেশেই সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

আমলাতন্ত্র আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে সমালোচনার অন্ত নেই। জনসেবা কিংবা নাগরিক সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আমলাদের উদাসীনতাকে অনেকেই শুধু সমালোচনা করে ক্ষান্ত হননি, তারা বরং আমলাদের এরূপ আচরণকে "অমানবিক বলেও অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক রবসন তার The Civil Service in Britain and France গ্রন্থে আমলাতন্ত্রের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, আমলারা সর্বদাই নিজেদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। নিজেদের পদ সম্পর্কেও তারা অতিরিক্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। নাগরিকদের সুবিধা-অসুবিধা এবং ভাবানুভূতির প্রতি তারা উদাসীন, বিভাগীয় সিদ্ধান্তের অনমনীয় কর্তৃত্ব ও বাধ্যবাধকতা, পূর্ব নজির ব্যবস্থা বা আঙ্গিকের অনমনীয় কর্তৃত্বে তারা আবদ্ধ, পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে তারা কতটুকু নিকৃষ্টভাবে কাজ করে বা কতটুকু অন্যায় করে সে ব্যাপারে তারা ভ্রূক্ষেপহীন, তারা বিধিবিধান ও আনুষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে ব্যাধিগ্রস্ত।

অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিক (formal) হতে গিয়ে, ক্ষমতার দাপট দেখাতে গিয়ে আমলারা অনেকক্ষেত্রে অমানবিক ও যন্ত্রে পরিণত হন। তারা জনগণকে এমনকি অন্য পেশার মানুষদের অবজ্ঞা করতে শুরু করেন। অনেকের সাথেই তারা নিয়মকানুনের দোহাই দিয়ে হয়রানি করেন। এগুলো আমলাদের অবিবেকী কার্যকলাপ এবং এজন্য তারা জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলছেন।

সূচিপত্র

বাংলাদেশে আমলাদের আচরণ আরো মারাত্মক। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসনামলে আমলারা যেভাবে নিজেদেরকে জনগণের সেবক না ভেবে প্রভু মনে করতেন, বাংলাদেশের আমলাদের মানসিকতা আজও অনেকটা তেমনি রয়েছে। নিজেদেরকে আজও তারা স্বর্গে-সৃষ্ট এক কর্ম ব্যবস্থা' (a heaven born service) বলে মনে করেন এবং আত্মতুষ্টি লাভ করেন।

তবে পাকিস্তান আমলের শেষদিকে বাঙালি আমলাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত জাতির জনক বন্ধবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার জন্য বাঙালি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রায় সকলেই সহযোগিতা প্রদান করেছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অনেক আমলা প্রশাসক এতে যোগদান করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর আক্রমণে বহুসংখ্যক বাঙালি সামরিক-আধাসামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাকে জীবন হারাতে হয়েছিল।

পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে এসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেষ্টা করেছিলেন এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে, যেটি হবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে উপযোগী এবং মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট নির্মমভাবে প্রাণ হারাতে হয় তাকে। ফলে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে প্রশাসন গড়ে তোলার তার স্বপ্নসাধ ছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং তার মৃত্যুর পর সামরিক-বেসামরিক আমলাদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হতে থাকে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন আমলের মতো করে। এর সাথে পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে দলীয়করণ, দুনীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি। জবাবদিহিতার অভাব, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের শিথিলতা, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অভাব প্রভৃতি কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র হয়ে ওঠেছে আরো বেপরোয়া।

তবে আমলাদের মধ্যে এখনো দেশপ্রেম হারিয়ে যায়নি। আমলাদের অনেকেই নিজেদের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চান, দুনীতির নির্মূল চান। তার চান জনগণের সেবা করতে, সুখে-দুঃখে জনগণের পাশে দাড়াতে। বিগত দিনগুলোতে । প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়, ঝড়-জলোচ্ছাস-সিডর-আইল্যা-মহাসেনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের রক্ষায় বাংলাদেশের আমলারা দেশে বিদেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে, আমলাদের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত হলে, দেশে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠলে আরো দক্ষতার সাথে, নিবেদিত হয়ে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য আমলারা তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

(√ চিহ্নটি সঠিক উত্তর)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
ক. Mobocracy
খ. Bureaucracy √
গ. Bureaucraty
ঘ. Bureaucrat
২। Bureau শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
ক. ইংরেজি
খ. জার্মান
গ, ফরাসি √
ঘ, ল্যাটিন ভাষা
৩। উৎপত্তিগত অর্থে আমলাতন্ত্রের অর্থ কী?
ক. Desk Government √
খ. Table Government
গ. Chair Government
ঘ. Permanent Government
৪। আদর্শ আমলাতন্ত্রের উদ্ভাবক কে?
ক. পল এইচ অ্যাপলবি
খ, অধ্যাপক হারম্যান ফাইনার
গ. ফিফনার ও প্রেসথাস,
ঘ. ম্যাক্স ওয়েবার √
৫। সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি বাস্তবায়ন করে কে?
ক, আমলা প্রশাসকগণ √
খ, রাষ্ট্রপ্রধান
গ, পরিকল্পনামন্ত্রী
ঘ, প্রধানমন্ত্রী
৬। কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ কার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য?
ক, জনগণের নিকট
খ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট √
গ. প্রধানমন্ত্রীর নিকট
ঘ. মন্ত্রীদের নিকট
৭। কোন নীতি অনুসারে আমলাতন্ত্রে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস ও সংগঠন করা হয়?
ক. দলীয় নীতি

খ, পদসোপান নীতি √
গ. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি
ঘ. রাষ্ট্রীয় নীতি
৮। আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনে নিয়োগ প্রদান করা হয় কীসের ভিত্তিতে?
ক. স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে
খ- দৈহিক শক্তির ভিত্তিতে
গ. দলীয়করণের ভিত্তিতে
ঘ, মেধার ভিত্তিতে √
৯। সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও কারা দায়িত্ব ও কর্তৃত্বে থেকেই যান?
ক, আমলা প্রশাসক √
খ, রাজনীতিবিদগণ
গ. মন্ত্রীগণ
ঘ. আইনসভার স্পিকার
১০। আমলাদের নিয়োগবিধি নির্ধারণ করা হয় কীসের দ্বারা?
ক, চুক্তির দ্বারা
খ, আলাপ আলোচনার দ্বারা
গ. সংসদ আইনের দ্বারা √
ঘ, ভোটের দ্বারা
১১। আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন কারা?
ক, আমলা প্রশাসকগণ √
খ, সেনাবাহিনী
গ. মন্ত্রীগণ
ঘ. আইনসভার সদস্যগণ
১২। আমলাদের কাজ কী?
ক. নীতিনির্ধারণ
খ, নীতি বাস্তবায়ন √
গ, আইন প্রণয়ন
ঘ. রাষ্ট্র পরিচালনা
১৩। আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে থাকেন কারা?
ক. আইনজীবিগণ
খ, আমলা প্রশাসকগণ √
গ. মন্ত্রীগণ
ঘ. জনগণ
১৪। জনগণের সাথে কাদের সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক ও দাপ্তরিক?
ক, আমলাদের √
খ. মন্ত্রীদের
গ. প্রধানমন্ত্রীর
ঘ, রাষ্ট্রপতির

সূচিপত্র

১৫। অনুন্নত বিশ্বে আমলারা নিজেদেরকে কী মনে করেন?
ক, জনগণের প্রভু √
খ, জনগণের সেবক
গ. জনগণের বন্ধু
ঘ. জনগণের রক্ষক
১৬। লালফিতার দৌরাত্ম্য খুব বেশি কোথায় দেখা যায়?
ক. রাজতন্ত্রে
খ, আমলাতন্ত্রে √
গ, একনায়কতন্ত্রে
ঘ. গণতন্ত্রে
১৭। অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। কেননা অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র
ক. সুশিক্ষার জন্য ভয়াবহ
খ. দেশের জন্য ভয়াবহ
গ, গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ √
ঘ, সুস্থ রাজনীতির জন্য ভয়াবহ
১৮। নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কারা?
ক, মন্ত্রীগণ √
খ, আমলা প্রশাসকগণ
গ, শিক্ষকগণ
ঘ. আইনজীবিগণ
১৯। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে কর্মচারীরা সর্বোচ্চ মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করেন কীভাবে?
ক, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে √
খ. সুযোগ-সুবিধার কারণে
গ. নেতাদের আগ্রহের কারণে
ঘ, অর্থনৈতিক সুযোগের কারণে
২০। আমলা প্রশাসন রাজনীতি নিরপেক্ষ সংগঠন; কারণ তারা–
ক. রাজনীতি হতে বিরত থাকে √
খ. দেশপ্রেমিক মানুষের থেকে দূরে থাকে
গ, জনগণ হতে দূরে থাকে
ঘ. সুশীল সমাজ থেকে দূরে থাকে
২১। আমলাগণের নিয়োগদান সমালোচনার উর্ধ্বে। কারণ তারা নিয়োগ লাভ করেন–
ক. অর্থের ভিত্তিতে
খ. বংশের ভিত্তিতে
গ, মেধার ভিত্তিতে √
ঘ, আত্মীয়তার সূত্রে
২২। আমলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তাদেরকে—
ক. দক্ষ করে তুলতে √
খ. চতুর করে তুলতে

গ, বিচক্ষণ করে তুলতে
ঘ. বুদ্ধিমান করে তুলতে
২৩। আমলাতন্ত্র সাধারণ জনগণের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে কেন?
ক, লালফিতার দৌরাত্ম্যের জন্য √
খ, জবাবদিহিতার অনুপস্থিতির জন্য
গ, জনবিচ্ছিন্নতার জন্য
ঘ, প্রভুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য
২৪। কোন সংগঠনকে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী কর্তৃক দলীয়করণ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়?
ক. নাগরিক সংগঠন
খ. সাংস্কৃতিক সংগঠন
গ, আমলাতান্ত্রিক সংগঠন √
ঘ, সামাজিক সংগঠন
২৫। আমলাদের নিয়োগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কেন হয়?
ক. নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য
খ. স্বজনীতি রোধের জন্য √
গ. কম মেধাবীদের নিয়োগের জন্য
ঘ. অযোগ্যদের নিয়োগের জন্য
২৬। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে দলীয়করণের কারণে প্রশাসনে কী বৃদ্ধি পায়?
ক. বিশৃঙ্খলা খ. পক্ষপাতিত্ব
গ, রাজনীতি √
ঘ. স্বজনপ্রীতি

বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৭। আমলাতন্ত্রে সমস্ত কাজ রুটিনমাফিক করা হয়, কারণ আমলাতন্ত্র গুরুত্ব দেয়—
i, আনুষ্ঠানিকতার ওপর
ii. কার্যপদ্ধতির ওপর
iii. বিধিবিধানের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ. i ও ii √
ঘ. ii ও iii

২৮। আমলাতন্ত্রে লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে কী হয়?
i, জনগণের হয়রানি বৃদ্ধি পায়
ii, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে
iii, প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও iii

সূচিপত্র

খ. ii ও iii
গ. i ও ii √
ঘ. i, ii ও iii
২৯ । মেধার ভিত্তিতে নিয়োগদানের ফলে প্রশাসনে কী ঘটে?
i.মেধাবী প্রশাসক সৃষ্টি হয়
ii. যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসক সৃষ্টি হয়
iii. সচেতন প্রশাসক সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ,i ও ii
ঘ. i, ii ও iii √

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকটি পড়ে ৩০ ও ৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করেন। এসব নীতি বাস্তবায়ন করে থাকেন আমলারা। সচিব থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছে আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।
৩০। আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে কোন সংগঠন?
i সেনাবাহিনী
ii, পুলিশ বাহিনী
iii. আমলাতন্ত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ. iii √
ঘ. i ও ii
৩১। মন্ত্রিসভা যে নীতি প্রণয়ন করেন তা বাস্তবায়ন করে—
i, আমলাতন্ত্র
ii. সেনাবাহিনী
iii. এন.জি.ও.
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i, ii
খ. iii
গ. I √
ঘ. i, ii ও iii

খ. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সূচিপত্র

জনাব আহমেদ হাসান একজন কেতাদুরস্থ আমলা। বিধি মোতাবেক যথাযথ নিয়মে সবকিছু যেন করা হয় সে বিষয়ে তিনি নিজে যেমন সজাগ তেমনি তার অধঃস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও এ বিষয়ে সচেতন থাকতে বলেন। তার এক নিকটাত্মীয় অধ্যাপক ও লেখক মাঝে মাঝে আমলারা কীভাবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এ নিয়ে জনাব আহমেদ হাসানের সাথে আলোচনা করেন। তিনি জনাব আহমেদ হাসানকে দুঃখ করে বলেন যে, অনেক আমলাই মনে করেন যে, তারা জনগণের সেবক নন, তারা জনগণের প্রভু।

প্রশ্নঃ

ক, আমলাতন্ত্রের আধুনিক আলোচনার জনক এবং আদর্শ আমলাতন্ত্রের উদ্ভাবক কে?
খ. আমলাতন্ত্র কী?
গ, আমলাতন্ত্রে লালফিতার দৌরাত্ম্য খুব বেশি–এ কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়ে থাকে?
ঘ, আমলারা অনেক সময় নিজেদেরকে জনগণের সেবক না ভেবে প্রভু মনে করেন। জনাব আহমেদ হাসানের আত্মীয়ের এই উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর ।

২. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অধ্যাপক নিগার সুলতানা কেয়া ছাত্রদের বললেন যে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমন একটি আমলা প্রশাসন গড়ে তোলা উচিত যারা নিজেদেরকে জনগণের প্রভু না ভেবে সেবক বলে ভাববেন। এজন্য আমলাদেরকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ।

প্রশ্ন ঃ

ক. আমলাতন্ত্রের আধুনিক আলোচনার অগ্রনায়ক কে?
খ, আমলাতন্ত্র বলতে কী বুঝ?
গ, আমলারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন কেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ–উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর ।

৩. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

হাতিবান্ধা আলিমুদ্দীন ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক মাহমুদা বেগম আমলাতন্ত্র সম্পর্কে ক্লাসে আলোচনা করছিলেন। তানিয়া নামের এক ছাত্রী দাড়িয়ে প্রশ্ন করলো যে, আমলারা কীভাবে নিয়োগ পান? উত্তরে মাহমুদা বেগম বললেন, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে আমলাদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে সাবধান থাকতে হয় যেন আমলাতন্ত্রে লালফিতার দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি না পায়।

প্রশ্ন ঃ

ক. আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী এবং এর উৎপত্তিগত অর্থ কী?
খ. আদর্শ আমলাতন্ত্র বলতে কী বুঝ?
গ. বাংলাদেশ কর্মকমিশন কর্তৃক আমলাদের নিয়োগ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. আমলাতন্ত্রে লালফিতার দৌরাত্ম্য' শব্দটি বিশ্লেষণ কর ।

৪. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সজীব ও সিমন দুই ভাই। সজীব মনে করে আমলাদের কারণেই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে। জনগণের চাওয়া-পাওয়া, আবেদন-নিবেদন আমলাতন্ত্রের ফাইলের লালফিতার বাধনে আটকা পড়ে। সিমন মনে করে, সব আমলাই নিজেদেরকে জনগণের প্রভু মনে করেন না, সকলেই দুনীতিপরায়ণ নয়। আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে যত কথাই

বলুক, আমলাতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ ।

প্রশ্নঃ

ক. আমলা কাকে বলে?

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বুঝ?

গ, সজীব কেন আমলাতন্ত্রের বিরোধী? উদ্দীপকের আলোকে উত্তর দাও।

ঘ, সিমন কেন মনে করে যে, আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ? ব্যাখ্যা কর।

৫. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আহসান হাবীব একজন আমলা। তবে তিনি সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। অন্যান্য আমলাদের মতো তিনি নিজেকে জনগণের প্রভু না ভেবে তাদের সেবক বা প্রজাতন্ত্রের অনুগত কর্মকর্তা মনে করেন। তার টেবিলে ফাইল পড়ে থাকে না। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন। সৎ কর্মকর্তা হিসেবেও তার সুনাম রয়েছে।

প্রশ্নঃ

ক. আমলাতন্ত্র বলতে কী বুঝ?

খ. পদসোপান নীতি বলতে কী বুঝ?

গ. আহসান হাবীব সাহেব কীরূপ আমলা? উদ্দীপকের আলোকে জবাব দাও ।

ঘ, আমলাতন্ত্র আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ’–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

[এ অধ্যায়ের প্রশ্ন-সংকেত]

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১ । আমলা কাকে বলে?

২। ব্যুরোক্রেসি (আমলাতন্ত্র) শব্দটির উৎপত্তিগত অর্থ কী?

৩। ফিফনার ও প্রেসথাস প্রদত্ত আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞাটি লেখ ।

৪ । পল এইচ. অ্যাপলবি প্রদত্ত আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞাটি লেখ ।

৫। অধ্যাপক ফাইনার প্রদত্ত আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞাটি লেখ ।

৬। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আগ প্রদত্ত আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞাটি লেখ ।

৭। আমলাতন্ত্রের আধুনিক আলোচনার অগ্রনায়ক কে?

৮। সর্বপ্রথম আমলাতন্ত্রকে একটি আইনগত ও যুক্তিসঙ্গত মডেল হিসেবে কে উপস্থাপন করেন?

৯ । আদর্শ আমলাতন্ত্রের উদ্ভাবক কে?

১০ । আদর্শ আমলাতন্ত্র বলতে কী বুঝ?

সূচিপত্র

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। আমলাতন্ত্র বলতে কী বুঝ?
২। আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কী কী?
৩। আদর্শ আমলাতন্ত্র বলতে কী বুঝ?
৪ । আমলাদের নিয়োগ সম্পর্কে কী জান?
৫। আমলাদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কী জান?
৬। আমলাদের চাকরির শর্ত কী কী?
৭। আমলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কীরূপ?
৮। লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বুঝ?
৯। আমলাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় কেন?
১০ । আমলাদের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা উচিত কেন?
১১। পদসোপান নীতি বলতে কী বুঝ?

প্রয়োগ দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১। আমলাতন্ত্রে লালফিতার দৌরাত্ম্য খুব বেশি–ব্যাখ্যা কর।
২। আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে তুমি এর কী কী বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবে?
৩। আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে আমলাদের কাজের পরিধি ব্যাপক –ব্যাখ্যা কর।
৪ । সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমলারা কী কী প্রক্রিয়া বা উপায় অবলম্বন করেন?

চিন্তন দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনটি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে এর কী কী সমস্যা লক্ষ করা যায়?
২। বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের বিকাশের ধারা স্বাভাবিক নয়'–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর এবং এজন্য কোন কোন বিষয়কে তুমি দায়ী করবেঃ
৩। অনেক দেশে অনেক আমলা নিজেদেরকে জনগণের সেবক না ভেবে জনগণের প্রভু মনে করেন—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
৪। অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ–উক্তিটি মূল্যায়ন কর।
৫। আমলার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে, ঘৃণা ও আবেগকে পরিহার করে নিয়মসিদ্ধভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন—উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর।
৬। আমলাতন্ত্রে আনুষ্ঠানিকতার ওপর, অনমনীয় বিধি ও কার্যপদ্ধতির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় –উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

দশম অধ্যায়

দেশপ্রেম ও জাতীয়তা

PATRIOTISM & NATIONALITY

উৎপত্তিগত দিক থেকে জাতি ও জাতীয়তা মূলত এক ও অভিন্ন। এদিক থেকে জাতি ও জাতীয়তা বলতে বোঝায় একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টি । কিন্তু বর্তমান সময়ের লেখকগণ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তাদের মতে জনসমাজের' (People) মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব ঘটলে তা জাতীয়তায়' (Nationality) পরিণত হয়। জাতীয়তার এই চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ জনসমাজ স্বাধীন হলে বা স্বাধীন হতে চাইলে তাকে জাতি' (Nation) বলে। জাতীয়তা একটি চেতনা, কিন্তু জাতি একটি রাজনৈতিক সংগঠন, ইতালীয় রাষ্ট্রদার্শনিক নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি জাতীয় রাষ্ট্রের (Nation State) স্বপ্নদ্রষ্টা। জাতীয়তাবাদের উন্মেষের রেনেসা' বা নবজাগরণের ভূমিকাও অসামান্য। ষোড়শ শতকের একচ্ছত্র রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন, ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব ইত্যাদিও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। উনিশ শতকের শেষাংশ এবং বিংশ শতক হলো জাতীয়তাবাদের স্বর্ণযুগ। জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের ফলেই ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় নতুন নতুন জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

দেশপ্রেম' জন্মভূমির জন্য মানুষের এক ধরনের অনুরাগময় ভাবাবেগ। জন্মভূমির জন্য প্রত্যেক মানুষের মনে জন্ম নেয় নিবিড় ভালোবাসা। মা, মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসার আবেগময় প্রকাশ ঘটে দেশপ্রেমের মধ্য দিয়ে। এজন্যই জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। দেশপ্রেমের মূলে রয়েছে জাতীয়তার চেতনা।

শিখন ফল ঃ এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা– ।

১। জাতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২। জাতীয়তার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩। জাতীয়তার উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
৪। জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫। জাতীয়তা নির্ধারণ নীতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৬ । দেশপ্রেমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
৭ । দেশপ্রেম ও জাতীয়তার সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।
৮। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দ (Key Words):

জাতি (Nation), জাতীয়তা (Nationality), জাতি রাষ্ট্র (Nation State), বংশগত ঐক্য (Racial unity), ভাবগত ঐক্য (Spritual unity), দেশপ্রেম (Patriotism), ভাষা আন্দোলন (Language movement) ।

জাতি ও জাতীয়তা

Nation and Nationality

‘জাতি' ও 'জাতীয়তার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো যথাক্রমে "Nation’ ও ‘Nationality'. ইংরেজি Nation' ও Nationality’ শব্দ দুটি উদ্ভূত হয়েছে ল্যাটিন শব্দ Natio’ বা "Natus থেকে, যার অর্থ হলো born" অর্থাৎ জন্ম। সুতরাং উৎপত্তিগত বা শাব্দিক দিক থেকে জাতি ও জাতীয়তা বলতে বোঝায় একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টি ।

সূচিপত্র

কিন্তু আধুনিক লেখকগণ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তাদের মতে, জাতীয়তা এক ধরনের চেতনা বা মানসিক অনুভূতি। জাতীয়তার চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ জনসমাজ স্বাধীন হতে চাইলে বা স্বাধীন হলে তাকে 'জাতি' বলে।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উন্মেষ ঘটে। জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার লাভের ফলেই পৃথিবীতে একসময় জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এক জাতি-এক দেশ (one nation-one state) এই শ্লোগানে উজীবিত হয়ে অনেক পরাধীন জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে এবং স্বাধীনতাসার্বভৌমত্ব লাভ করে। সুতরাং জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবাদী চেতনারই ফসল।

১০.২ জাতির ধারণা ও সংজ্ঞা

Conception and Definition of Nation

রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত সমাজকেই জাতি বা Nation বলে। জাতি হলো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী এমন এক জনসমষ্টি যারা ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এবং যাদের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে ঐক্য বিদ্যমান। একটি জনসমাজ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হলে এবং রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তিতে স্বাধীন হবার চেষ্টা করলে বা স্বাধীন হলে জাতিতে পরিণত হয়।

আলফ্রেড জিম্মান (zimmern) বলেন, "কোনো নির্দিষ্ট আবাসভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট, সংঘবদ্ধভাবে বিশেষ অন্তরঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ অনুভূতির প্রকাশই জাতীয়তাবোধ। এরূপ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিগণের সমষ্টিই জাতি।" (A nation is a body of people united by a corporate sentiment of peculiar intimacy, intensity and dignity, related to a difinite home country.)

লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) বলেন, "জাতি হলো রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত এমন এক জাতীয়তা যা স্বাধীন কিংবা স্বাধীনতাকামী।" (A nation is a nationality which has organised itself into a political body either independent or desiring to be independent.)

রামজে ম্যুইর বলেন, "জাতি হলো সেই জনসমষ্টি যারা প্রকৃতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ। তাদের এই ঐক্যবোধ এত দৃঢ়, বাস্তব ও প্রবল যে, তারা একত্রে বাস করতে চায় কিংবা একত্রে বাস করলে আনন্দিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হলে অসন্তুষ্ট হয় এবং তাদের সাথে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ নয় এরূপ কোনো জনগোষ্ঠীর শাসন তারা সহ্য করতে পারে না।" (Anation is a body of people who feel themselves to be naturally linked together by certain affinities which are so strong and real for them that they can live happily together, are dissatisfied when disunited and can not tolerate subjection to peoples who do not share these ties.)

অধ্যাপক ম্যাকাইভার (Melver)-এর মতে, "ঐতিহাসিক পরিস্থিতি দ্বারা সৃষ্ট, আধ্যাত্ম চেতনা দ্বারা সমর্থিত, একত্রে বাস করতে ইচ্ছুক, সম্প্রদায়গত মনোভাবের অধিকার জনসমাজ যখন নিজেদের শাসনব্যবস্থা নিজেরাই প্রণয়ন করতে চায়, তখন তাকে জাতি বলে।"

অধ্যাপক জে. এইচ. হায়েস (J. H. Hayes)-এর মতে, "জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং সার্বভৌম স্বাধীনতা লাভ করে জাতিতে পরিণত হয়।" (A Nationality by acquiring unity and sovereign independence becomes a nation".)

গিলক্রিস্ট (Gilchrist)-এর মতে, "জাতি হলো রাষ্ট্র এবং আরও কিছু বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে জাতি হলো রাষ্ট্রের অধীনে সুসংগঠিত একটি জনসমাজ।" (Nation is a state plus something else; the

state looked at from a certain point of view, viz., that of the unity of the people organised in one state.)

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক স্টালিন (Stalin)-এর মতে, "জাতি হলো ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত এমন একটি স্থায়ী জনসমাজ যাদের ভাষা এক, বাসভূমি এক, অর্থনৈতিক জীবন এবং মানসিক গঠনও এক এবং এই মানসিক গঠন একটি সাধারণ সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।" (A nation is a historically evolved, stable community of language, territory, economic life and psychological make-up manifested in a community of culture.")

সুতরাং জাতি বলতে বোঝায় এমন এক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ যারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী। জাতিতে রাজনৈতিক সংগঠন বিদ্যমান।

১০.৩ জাতীয়তার ধারণা ও সংজ্ঞা
Conception and Definition of Nationality

কোনো জনসমাজের মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়, তখন তাকে জাতীয়তা বলে। এ জন্য জাতীয়তাকে বলা হয়, "রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ" (Apolitically conscious people)।

জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)-এর মতে, "রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী যখন একই সরকারের অধীনে বাস করতে চায় এবং ইচ্ছা করে যে, সরকার হবে তাদের নিজস্ব সরকার বা তাদের একাংশের সরকার তখন তাকে জাতি বলে।" (A portion of mankind may be said to constitute a nationality if they are united among themselves by common sympathis which do not exist between them and any others which make them cooperate with each other more willingly than with other pepole desire to be under the same government and desire that it should be government by themselves, or a portion of themselves exclusively.)

ফরাসি লেখক রেনা (Renan) বলেন, "জাতীয়তা একটি মানসিক সত্তা এবং এক প্রকার সজীব মানসিকতা।"

অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি (H. J. Laski)-এর মতে, "জাতীয়তার ধারণা এক প্রকার মানসিক ধারণা।" (The idea of nationality is spiritual in character.)

হ্যান্স কোন (Hans Kohn)-এর মতে, "জাতীয়তাবোধ মূলত এক মানসিক অবস্থা এবং এক প্রকার সচেতনতা।" (Nationalism is first and foremost a state of mind, an act of consciousness.)

অধ্যাপক জিম্মান (Prof. Zimmern) বলেন, "কোনো জনসমাজের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি দেখা দিলেই তা জাতীয়তায় পরিণত হয়।" (If a people feels itself to be nationality, it is a nationality.)

সুতরাং জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের আধ্যাত্ম চেতনা ও মানসিক ধারণা। একই ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, বংশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক সান্নিধ্যতার সূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টি যখন নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি হতে আলাদা মনে করে তখন সেই জনসমষ্টিকে জাতীয়তা বলে। জাতীয়তার চেতনা একটি জনসমাজকে অন্য জনসমাজ থেকে পৃথক করে তোলে। তবে জাতীয়তায় রাজনৈতিক চেতনা থাকলেও রাজনৈতিক সংগঠন থাকে না।

১০.৪ জাতি ও জাতীয়তার সম্পর্ক
Relation between Nation & Nationality

উৎপত্তিগত সাদৃশ্য ঃ উৎপত্তিগত দিক থেকে জাতি ও জাতীয়তা মূলত এক ও অভিন্ন। কেননা জাতি ও জাতীয়তা' শব্দ দুটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Natio' এবং Natus থেকে যার অর্থ জন্ম। সুতরাং উৎপত্তিগত বা শাব্দিকভাবে জাতি ও জাতীয়তা বলতে বোঝায় একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টি ।

সূচিপত্র

পার্থক্য ঃ কিন্তু বর্তমান সময়ের লেখকগণ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তাঁদের মতে, জনসমাজের (People) মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব ঘটলে তা জাতীয়তায় পরিণত হয়। জাতীয়তার এই চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ জনসমাজ স্বাধীন হলে বা স্বাধীন হতে চাইলে তাকে জাতি বলে।

অধ্যাপক জে.এইচ. হায়েস (J. H. Hayes) বলেছেন, "জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং স্বাধীনতা লাভ করে জাতিতে পরিণত হয়।" অর্থাৎ হয়েসের মতে, জাতীয়তার সাথে স্বাধীনতা যুক্ত হলেই জাতি হয়।
জাতীয়তা ও জাতির মধ্যকার পার্থক্য এভাবে নির্ণয় করা চলে ঃ

জাতীয়তা = জনসমাজ + রাজনৈতিক চেতনা।

জাতি = জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ + রাজনৈতিক সংগঠন ও স্বাধীনতা।

উপরের আলোচনা থেকে জাতীয়তা ও জাতির মধ্যে নিম্নলিখিত মৌলিক পার্থক্যগুলো চোখে পড়ে ঃ

জাতীয়তা	জাতি
১ । এক ধরনের মানসিক ধারণা।	১ । একটি সক্রিয় ও বাস্তব রাজনৈতিক চেতনা।
২। রাজনৈতিক সংগঠন অনুপস্থিত এবং জরুরি নয়।	২। রাজনৈতিক সংগঠন বর্তমান এবং অত্যাবশ্যক।
৩। খুব বেশি সুসংহত বা স্বাধীন নাও হতে পারে।	৩। সুসংহত ও স্বাধীন কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত।
৪। অভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মানসিক ঐক্যানুভূতি।	৪। জাতি গঠনের পূর্বশর্ত জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা।
৫। অনেকগুলো চেতনার প্রাথমিক অবস্থা।	৫। এ সব চেতনার সমন্বিত রূপের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি।
৬। একটি বোধের সমন্বয়মাত্র।	৬ । একটি সংগঠিত আদর্শ।
৭। প্রাথমিক অবস্থা।	৭ । পরিণত রূপ।

অতএব, জাতি হলো দৃঢ়, বাস্তব ও সক্রিয় রাজনৈতিক চেতনা, কিন্তু জাতীয়তা মূলত একটি মানসিক ধারণা বা চেতনামাত্র। জাতিতে রাজনৈতিক সংগঠন বিদ্যমান, কিন্তু জাতীয়তায় তা অনুপস্থিত। ব্যাপক অর্থে, জাতীয়তা একটি চেতনা, কিন্তু জাতি একটি রাজনৈতিক সংগঠন। জাতীয়তা হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থা, কিন্তু জাতি হলো এর পরিণত রূপ।

১০.৫ জাতীয়তাবাদের বিকাশ

Growth of Nationalism

অনেকে মনে করেন যে, আদিম উপজাতীয় জীবনে জাতীয়তাবাদের সূক্ষ্ম চেতনা প্রথম অনুভূত হয়। অনেকে আবার মনে করেন যে, প্রাচীন গ্রিক, হিব্রুদের মধ্যেও জাতীয়তাবোধের এক ধরনের চেতনা বিরাজমান ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উন্মেষ ঘটে। ইতালীয় রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি তার দূরদৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করেন যে, আগামী দিনের রাষ্ট্র হবে জাতি রাষ্ট্র এবং তার ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ। মূলত তিনিই জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা। জাতীয়তাবোধের উন্মেষে রেনেসা বা নবজাগরণের ভূমিকাও ছিল অনন্য। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিকরাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে জাতি রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পেছনে ষোড়শ শতকের একচ্ছত্র রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনের ভূমিকাও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৭২ সালে পোল্যান্ডের ভাগাভাগি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব জাতীয়তাবাদী চেতনায়

বিশ্ববাসীকে আরো উজীবিত করে তোলে। উনিশ শতকের শেষাংশ এবং বিংশ শতক হলো জাতীয়তাবাদের স্বর্ণযুগ। জাতীয়তাবাদী চেতনারই ফসল হলো ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তি। জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের ফলেই ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় নতুন নতুন জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। নেদারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে পরিচিত। ফ্রান্সে জ্যাকোবিনবাদের স্বাদেশিক ভাবনা এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আমেরিকার মুক্তিকামী জনতার স্বাধীনতা যুদ্ধও জাতি রাষ্ট্রের ধারণাকে ত্বরান্বিত করে। যে, প্রত্যেক জাতিই স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার অধিকারী।

১০.৬ জাতি রাষ্ট্র

Nation State

জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রই জাতি রাষ্ট্র। সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বশাসনের লক্ষ্যে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। জাতি রাষ্ট্র একদিকে যেমন জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত, তেমনি তা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি অন্যদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করে বলে জাতি রাষ্ট্র গঠন করে। ইতালীয় রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলিকে জাতি রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা মনে করা হয়।

অতীতে প্রাচীন গ্রিসে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল তা ছিল নগররাষ্ট্র। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রগুলো আর নগররাষ্ট্র নয়। বর্তমান রাষ্ট্র হলো জাতি রাষ্ট্র'। বর্তমানে অসংখ্য জনপদ, শহর-নগর এবং একাধিক সংখ্যালঘু জাতিসত্তা (ethnic minorities) নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। এসব রাষ্ট্রের আয়তন যেমন বিশাল তেমনি জনসংখ্যাও বিপুল। অনেক সময় এসব জাতি রাষ্ট্রে বহু ধর্মের, বহু বর্ণের, বহু ভাষাভাষির মানুষ বসবাস করে। তবে তাদের জাতি পরিচয় থাকে একটি। অভিন্ন জাতীয়তাবোধে তারা উদ্বুদ্ধ হয়। নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তা অপেক্ষ রাজনৈতিক-রাষ্ট্রিক ভৌগোলিক জাতীয়তাই জাতি রাষ্ট্রে প্রাধান্য পায়। সাধারণত জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য থাকে।

১০.৭ জাতীয়তার উপাদানসমূহ

Elements of Nationality

যে সব উপাদান কোনো একটি জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে সেগুলোকে জাতীয়তার উপাদান বলা হয়। জাতীয়তার উপাদানগুলো হলো ঃ

১. বংশগত ঐক্য (Common Race or Racial Unity) ঃ যখন কোনো জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকল লোকই নিজেদেরকে এক বংশোদ্ভূত বলে মনে করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয় একাত্মবোধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে বংশগত ঐক্যকে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করা হয় না। নৃতত্ত্ববিদগণের অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়েছে যে, বর্তমানে কোনো জাতির রক্তই বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্রিত নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ নিজেদেরকে আমেরিকান জাতি বলে দাবি ও গর্ববোধ করে। কিন্তু তাদের মধ্যে উদ্ভবগত বা বংশগত ঐক্য নেই।

২. ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য (Common Language, Literature and Culture): মানুষের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন হলো ভাষা। যখন কোনো জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকল লোক একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য তাদেরকে সমভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। জার্মান দার্শনিক ফিকটে (Fichte) মনে করতেন যে, জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উপাদান হলো

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। তবে ভাষা জাতীয়তার অন্যতম উপাদান হলেও একথা ঠিক যে, বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষের মধ্যেও জাতীয় একাত্মবোধ গড়ে উঠতে পারে। একই ইংরেজি ভাষায় কথা বলা সত্ত্বেও ইংরেজ, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যান্ডের জনগণ এক জাতিতে পরিণত হয়নি। সউদি আরব, সুদান, মরক্কো, মিসর, কুয়েত ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের ভাষা আরবি হলেও তারা এক জাতিতে পরিণত হয়নি। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ আরবি ভাষাভাষি দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধও করতে পারেনি।

৩. আচরণ ও রীতিনীতিগত ঐক্য ঃ জাতীয়তাবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো আচরণ ও রীতিনীতিগত ঐক্য। অভিন্ন আচরণ ও রীতিনীতি কোনো জনসমষ্টির মধ্যে সহজেই ঐক্যের সৃষ্টি করে বা সমজাতীয়তার মনোভাব সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের নিজেদের কথাই বলা যায়। পাকিস্তানি শাসকগণ ধর্মের দোহাই দিয়েও আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবোধকে তাই মুছে ফেলতে পারেনি। সমস্ত ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে এবং সবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এক্ষেত্রে কাজ করেছে আমাদের আচরণ ও রীতিনীতিগত ঐক্য।

৪. ধর্মগত ঐক্য (Common Religion) ঃ প্রাচীন ও মধ্য যুগে ধর্মের ঐক্য জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান বলে বিবেচিত হতো। গিলক্রিস্টের মতে, "ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য যেখানে প্রবল, সেখানে জাতিগত ঐক্য স্বল্পস্থায়ী হতে বাধ্য।" ধর্মের পার্থক্যের কারণেই ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। তবে বর্তমানে জাতি গঠনের উপাদান হিসেবে ধর্মের গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। চীন, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রের জনগণ বহু ধর্মে বিশ্বাসী হলেও তারা এক একটি জাতি। অপরদিকে, একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও মুসলমানরা বহু জাতিতে বিভক্ত।

৫. ভৌগোলিক ঐক্য ঃ জাতীয়তাবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভৌগোলিক ঐক্য। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হলে এবং জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ও সংলগ্ন ভূখণ্ডে বসবাস করতে হয়। জাতি গঠনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভৌগোলিক ঐক্যের অভাবে একটি ভবঘুরে জনসমষ্টি (Nomadic Group) জাতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। ইহুদিরা দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহে বসবাস করে আসছিল। তাদের মধ্যে জাতীয়তার সুপ্ত ধারণা বিদ্যমান থাকলেও ইসরায়েল নামক রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে তারা জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি।

৬. ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য (History, Heritage and Culture) ঃ একই জনসমাজে বসবাসকারী মানুষ যখন সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, লাভ-লোকসান প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সম-অংশীদার বলে মনে করে তখনই জাতীয়তার সৃষ্টি হয়। একই প্রথা, রীতি-নীতি, ইতিহাস, একই জয়-পরাজয়ের গৌরব ও গ্লানি প্রভৃতি জনগণকে ঘনিষ্ঠ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে। এজন্যই বার্নস (Burns) বলেছেন, "রক্তের অভিন্নতা অপেক্ষা একটি যৌথ স্মৃতি, এক একটি যৌথ আদর্শ জাতি গঠনে অধিকতর সাহায্য করে।" সুতরাং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য বা বন্ধন জাতীয়তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সূচিপত্র

৭. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আকাজক্ষার ঐক্য (Unity of Common Political and Economic Aspirations) ঃ যখন কোনো জনগোষ্ঠী একই ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয় তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তার ভাব সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ জনগণ দীর্ঘদিন ধরে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের অধীনে থাকায় এগুলো তাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। বহু ধর্ম এবং ভাষার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসই সোভিয়েত জনগণকে জাতিতে আবদ্ধ করেছিল। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস হারানোর ফলেই আজ সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।

৮. মানসিক বা ভাবগত ঐক্য (Spiritual or Psychological Unity) : জাতীয়তার ভাব সৃষ্টিতে বা জাতি গঠনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক উপাদান হলো মানসিক বা ভাবগত ঐক্য। ভাষা, সাহিত্য, বংশ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঐক্য বা মিল না থাকলেও দেখা যায় যে, জাতীয়তার ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তাই জাতীয়তার মৌলিক উৎস হলো মানুষের গূঢ়তম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি-বশে আদিম জনগোষ্ঠী নিজস্ব ধর্ম, নিজস্ব দেব-দেবী এবং নিজস্ব আচার-ব্যবহারের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে সংহতি ও নিজ গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করতো। সেই একই প্রবৃত্তি-বশেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ আজও নিজেরা একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, নিজেদের সংহতি কামনা করে, নিজস্ব আশাআকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণের দাবি করে। জাতীয়তার ভাবধারা-পুষ্ট জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে দেখে। এজন্যই রেনা (Renan) বলেছেন যে, “জাতীয়তার ধারণা হলো মূলত ভাবগত।" অধ্যাপক স্প্রেংগলার বলেছেন, জাতীয়তার উপাদান বংশগত বা ভাষাগত নয়, বরং তা হলো ভাবগত বা মানসিক ঐক্য।” (The elment of nationalism is neither biological nor linguistic unity, but a spiritual unity.) **অধ্যাপক জিম্মারন**(Prof Zimmern) বলেন, “কোনো জনসমষ্টির মধ্যে ভাবগত বা মানসিক ঐক্য সৃষ্টি হলেই তারা জাতীয়তাবোৰে উদ্বুদ্ধ জনসমাজে পরিণত হয়" (If a people feels itself to be nationality, it is a nationality) **অধ্যাপক লাস্কি** (Prof. Laski) মনে করেন যে, “জাতীয়তার ধারণা েএক প্রকার মানসিক ধারণা।" (The idea of nationality is spiritual in character) তবে জাতীয়তার অন্য উপাদানগুলো কমবেশি যাই হোক না কেন, তা মানসিক বা ভাবগত ঐক্যবোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকে।

১০.৮ জাতীয়তা নির্ধারণ নীতি ঃ সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক
Determining Policy of Nationality : Cultural and Geographical

জাতীয়তা নির্ধারণের জন্য বেশ কিছু নীতি রয়েছে। জাতীয়তা নির্ধারণে সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের মধ্যে একই জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। জার্মান দার্শনিক ফিকটে মনে করতেন যে, জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উপাদান হলো ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। একই জনগোষ্ঠী যখন সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, লাভ-লোকসান প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সম-অংশীদার বলে মনে করে, তাদের মধ্যে একই রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশভূষা, চালচলন লক্ষ করা যায় তখন তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলা ভাষা এবং বাঙালি কৃষ্টি-লোকাচারের সাথে, সুকীদরবেশ প্রচারিত উদারপন্থি ইসলাম ধর্মের সাথে আউল-বাউল সংস্কৃতির সংমিশ্রণে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য আমরা রক্তদান করেছি এবং স্বাধীনতার জন্য প্রাণোৎসর্গ

করেছি। এজন্যই ১৯৭২ সালে প্রণীত আমাদের সংবিধানের নবম অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করেই বলা হযেছে যে, "ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত -একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে সেই জনগোষ্ঠীর ঐক্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।"

জাতীয়তা নির্ধারণের অপর নীতিটি হলো ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রিক একই ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হতে বা পরিচিত হতে পারে। যেমন, সকল ইংরেজ ভাষাভাষি বা সকল আরবীয় ভাষাভাষির মানুষ একই জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ নয়। তারা ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রিক পরিচয়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। পৃথিবীর সকল বাঙালি নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বাঙালি হলেও তাদের ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তা ভিন্ন ভিন্ন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও - ত্রিপুরার জনগণ বাঙালি হলেও তাদের ভৌগোলিক অবস্থান ভিন্ন, রাষ্ট্রিক পরিচয় ভিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে আশা-আকাঙ্ক্ষাও ভিন্ন। শুধুমাত্র পূর্ববাংলার ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী যে জনগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে, সেই জনগোষ্ঠীই বিশ্বে আজ বাঙালি জাতি বলে স্বীকৃত। সুতরাং জাতীয়তা নির্ধারণের সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক দুটি নীতি বা উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ।

১০.৯ দেশপ্রেম

Patriotism

ধারণা (Conception)ঃ দেশ ঠিক মায়ের মতোই। এজন্যই বলা হয় 'জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী। জন্মভূমির থেকে বড় কিছু নেই। নিজের দেশের জন্য একজন নাগরিক তাই প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার এই আবেগ ও অনুভূতিকেই বলে দেশাত্ববোধ, স্বদেশপ্রেম বা দেশপ্রেম। দেশের মাটি ও মানুষকে একাত্ম করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম। দেশপ্রেম জন্মভূমির জন্য মানুষের একধরনের অনুরাগময় ভাবাবেগ।

জন্মসূত্রে জন্মভূমির সাথে গড়ে ওঠে মানুষের নাড়ির যোগ। জন্মভূমির জন্যে তার মনে জন্ম নেয় নিবিড় ভালোবাসা। প্রত্যেক মানুষেরই জন্মভূমির ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সাথে গড়ে ওঠে শেকড়ের বন্ধন। মা, মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসার আবেগময় প্রকাশ ঘটে দেশপ্রেমের মধ্য দিয়ে। এজন্যই **কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** তাঁর স্ব-দেশ বন্দনায় বলেছেন,

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।

সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে।

অথবা,

ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা,

তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।

১০.১০ দেশপ্রেম ও জাতীয়তার সম্পর্ক

Relation between Patriotism and Nationality

দেশপ্রেমের সাথে জাতীয়তার সম্পর্ক গভীর। জন্মভূমির মাটি, আলোবাতাস, অন্ন-জলের প্রতি মানুষের মমত্ব অপরিসীম। দেশপ্রেমের এই ধারণা বা অনুভূতি থেকেই জন্ম নেয় জাতীয়তাবোধ। জাতীয়তার ধারণাকে এজন্যই এক প্রকার মানসিক ধারণা বলা হয়। একই ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, বংশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক সান্নিধ্যতার সূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টি যখন নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি হতে আলাদা মনে করে তখন সেই চেতনাকেই

সূচিপত্র

জাতীয়তা বলে। জাতীয়তার ভিত্তিতেই জাতি রাষ্ট্রের (Nation State) উদ্ভব ঘটে। সাধারণত একটি জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য থাকে।

দেশপ্রেম মানুষের অন্তরে সদা বহমান। তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিস্থিতিতে তা আবেগ-উদ্বেল হয়ে ওঠে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মাস্টারদা সূর্য সেন-এর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যে বিদ্রোহ ঘটেছিল এবং অনেকেই আত্মবলিদান করেছিলেন তা এই স্বদেশ প্রেমেরই বলিষ্ঠ প্রকাশ। আবার ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ছাত্রযুবসমাজের যে মহান আত্মত্যাগ, তা হয়েছিল বাঙালি চেতনা থেকেই। আমরা বাঙালি জনগণ, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য ১৯৫২-তে রক্ত দান করেছি। স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য প্রাণদান করেছি। '৬৯-এর গণআন্দোলনে, '৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছি এবং সবশেষে স্বাধীনতার জন্য একাত্তরে প্রাণোৎসর্গ করেছি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে, তিন লক্ষ মা-বোন লাঞ্ছিত-নির্যাতিত হয়েছে দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে। বায়ান্ন সালে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাই ছিল আমাদের সকল সংগ্রামের প্রেরণা শক্তি। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, জাতীয়তাবাদী চেতনারই ফসল।

যুগে যুগে জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকেই তাদের সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। আবার কেউ কেউ নিজ রাষ্ট্রকে গতিশীল নেতৃত্ব প্রদান করে বিশ্ব দরবারে সুমহান মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী, মাওলানা ভাসানী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, পাকিস্তানের সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গাফফার খান প্রমুখ চিরদিন আমাদের প্রেরণা হয়ে থাকবেন। পাশাপাশি জাতীয়তার চেতনা ও চীনের মাও সেতুং, ভিয়েতনামের হোচিমিন, ইন্দোনেশিয়ার শোয়েকানো, তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশা, কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো প্রমুখ রচনা করেছেন দেশপ্রেমের অমরগাথা।

উপসংহারে তাই বলা যায় যে, জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। দেশপ্রেমের মূলেই রয়েছে জাতীয়তার চেতনা।

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

(√ চিহ্নটি সঠিক উত্তর)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। জাতি হলো রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত এমন এক জাতীয়তা যা স্বাধীন কিংবা স্বাধীনতাকামী'–উক্তিটি কার?
ক. অধ্যাপক জিন্মান
খ, রামজে মূইর
গ. জে. এইচ. হায়েস
ঘ, লর্ড ব্রাইস √

২। জাতি হলো ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত এমন একটি স্থায়ী জনসমাজ যাদের ভাষা এক, বাসভূমি এক, অর্থনৈতিক জীবন এবং মানসিক গঠনও এক এবং এই মানসিক গঠন একটি সাধারণ সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় – উক্তিটি কার?
ক, লর্ড ব্রাইস
খ. অধ্যাপক জিম্মার্ন
গ.স্টালিন √
ঘ, হ্যারল্ড লাস্কি

৩। জাতীয়তার ধারণা হলো মূলত ভাবগত—উক্তিটি কার?
ক, লর্ড ব্রাইস
খ. ম্যাকাইভার
গ. রেনা √
ঘ. অধ্যাপক জিম্মার্ন

৪। জাতীয়তার ধারণা একপ্রকার মানসিক ধারণা”—উক্তিটি কার?
ক. ম্যাকাইভার
খ. রেনা
গ. হ্যারল্ড লাস্কি √
ঘ, লর্ড ব্রাইস

৫। জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে কখন থেকে?
ক. প্রাচীন যুগে
খ. মধ্যযুগে
গ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে √
ঘ, একবিংশ শতকে

৬। জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্যের মূলে কোনটি মুখ্য?
ক. ভাষাগত ঐক্য
খ, ধর্মীয় ঐক্য
গ. রাজনৈতিক সংগঠন ও স্বাধীনতা
ঘ, মানসিক ধারণা √

৭। জাতীয়তা' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

ক. Nationalism
খ. National
গ. Nationality √
ঘ. Nation
৮। জাতীয়তাবাদী চেতনার ফসল কী?
ক, জাতি √
খ. জাতীয়তা
গ. উপজাতি
ঘ, গোষ্ঠী
৯। রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত সমাজকে কী বলে?
ক. সমাজ
খ. রাজনৈতিক সমাজ
গ. নির্বাচকমণ্ডলী
ঘ, জাতি √
১০। জাতি রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা কে?
ক, ম্যাকিয়াভেলি √
খ. বিসমার্ক
গ, হিটলার
ঘ. মুসোলিনি
১১। জার্মানিতে উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দেন কে?
ক. হিটলার
খ. বিসমার্ক √
গ. হেগেল
ঘ. ম্যাকিয়াভেলি
১২। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে কত সালে?
ক. ১৯৪৭
খ. ১৯৫২
গ. ১৯৭০
ঘ. ১৯৭১ √
১৩। ভাষা আন্দোলন হয় কত সালে?
ক, ১৯৫২ √
খ. ১৯৫৪
গ. ১৯৬৬
ঘ, ১৯৭০
১৪। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক কে?
ক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান √
খ. তাজউদ্দিন আহমদ
গ. জেনারেল (অব.) এম.এ.জি. ওসমানী

সূচিপত্র

ঘ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

১৫। Natio এবং Natus কোন ভাষার শব্দ?

ক. গ্রিক

খ, ল্যাটিন √

গ. ইংরেজি

ঘ. ফরাসি

১৬। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জাতীয়তার কোন উপাদানটিকে তুমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনে কর?

ক, ধর্মীয় ঐক্য

খ, বংশগত ঐক্য

গ, ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য √

ঘ, ভৌগোলিক ঐক্য

১৭। হিটলার ও মুসোলিনির নাম মনে হলেই কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থার কথা মনে পড়ে?

ক. গণতন্ত্র

খ. একনায়কতন্ত্র √

গ. সমাজতন্ত্র

ঘ. ধর্মতন্ত্র

১৮। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মূলে যে প্রেরণা ছিল তা কোনটি?

ক. বাংলাদেশি জাতীয়তা

খ, বাঙালি জাতীয়তা √

গ. পাকিস্তানি জাতীয়তা

ঘ. উপমহাদেশীয় জাতীয়তা

১৯। বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক পরিচয় বা জাতীয়তা কী?

ক. বাঙালি

খ, বাংলাদেশি √

গ, পূর্ব বাংলার বাঙালি

ঘ, বাংলাদেশি বাঙালি

২০। প্রধানত কীসের পার্থক্যের কারণে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল?

ক. ভাষা ও সংস্কৃতির

খ, রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস

গ ধর্মের √

ঘ. দৈহিক গঠন কাঠামো

২১। প্রধানত কীসের পার্থক্যের কারণে পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়?

ক ভাষা ও সংস্কৃতি √

খ, রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস

গ. ধর্মের

ঘ. দৈহিক গঠন কাঠামো

২২। কোন ধরনের চেতনা একটি জনসমাজকে অন্য জনসমাজ থেকে পৃথক করে তোলে?

ক. সামাজিক চেতনা

খ, রাজনৈতিক চেতনা
গ, জাতীয়তাবাদী চেতনা √
ঘ, ধর্মীয় চেতনা

২৩। জীবনধারণের জন্য যেমন খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষা অপরিহার্য তেমনি জাতি গঠনের অপরিহার্য হলো—
ক, ধর্মীয় সংগঠন
খ. সামাজিক সংগঠন
গ. রাজনৈতিক সংগঠন √
ঘ. অর্থনৈতিক সংগঠন

২৪। পশ্চিম বাংলার জনগণের রাষ্ট্রিক জাতীয়তা কোনটি?
ক. বাঙালি
খ, ভারতীয় √
গ. বাংলাদেশি
ঘ. পশ্চিম বঙ্গবাসী

২৫। পশ্চিম বাংলার জনগণের নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তা কোনটি?
ক. বাঙালি √
খ. ভারতীয়
গ. বাংলাদেশি
ঘ, পশ্চিম বঙ্গবাসী

২৬। বাংলাদেশের জনগণের নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তা কোনটি?
ক. বাঙালি √
খ. বাংলাদেশি
গ, পূর্ব বাংলার বাঙালি
ঘ, বাংলাদেশি বাঙালি

বহুপদি সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

২৭। বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক দল হলো—
i. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
ii. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জামায়াতে ইসলামী
iii. গণতন্ত্রী দল, বাংলাদেশের কমুযনিষ্ট পার্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii
খ. i ও iii √
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

২৮। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল–
i, জনতা লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
ii, কমুযনিষ্ট পার্টি
iii. মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, পিডিপি, নেজামে ইসলাম

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. iii √
খ. iii ও ii
গ. I ও ii
ঘ. i. ii ও iii
২৯। আমাদের দেশে বহু নরগোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার মানুষ রয়েছে। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক উৎস এবং ধর্ম বা বর্ণের পার্থক্য থাকলেও আমাদেরকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছে—
i. পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা
ii, পাকিস্তানি শাসকদের বিমাতাসুলভ আচরণ
iii, পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসরদের '৭১ সালের নৃশংস নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক? -
ক. i
খ. ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii √
৩০। একটি জাতি হতে পারে—
i, স্বায়ত্তশাসিত
ii, পরাধীন
iii. স্বাধীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii √

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও।

অধ্যাপক নীলিমা সান্ন্যাল কলকাতা থেকে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে বেড়াতে এসেছেন। তার বান্ধবী অধ্যাপক শওকত জাহান ময়মনসিংহ শহরের একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। দুজনেই বাঙালি। কিন্তু তাদের ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তা ভিন্ন ভিন্ন।

৩১। জাতীয়তার কোন উপাদানের বিবেচনায় অধ্যাপক নীলিমা সান্ন্যাল ও অধ্যাপক শওকত জাহান উভয়েই বাঙালি?
i, নৃতাত্ত্বিক
ii. রাষ্ট্রিক
iii. ভৌগোলিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i √
খ. ii

গ. iii

ঘ. I ও ii

খ. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

একাদশ শ্রেণির শ্রেণিকক্ষে বরিশালের বাকেরগঞ্জ ইসলামিয়া মহিলা কলেজের অধ্যাপক জাহান আরা জাতি ও জাতীয়তা এবং এর উপাদানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন যে, উৎপত্তিগত অর্থে জাতি ও জাতীয়তা এই ধারণা দুটির মূলে রয়েছে জন্ম বা বংশ। নাভিদ নামের একজন শিক্ষার্থী তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলো তবে কি জাতি ও জাতীয়তা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়? অধ্যাপক জাহান আরা বললেন যে, না উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জাতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের উদাহরণ তুলে ধরেন।

ক. জাতি কী?

খ. জাতি-রাষ্ট্র কী?

গ. অধ্যাপক জাহান আরা কেন বলেছেন যে, জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে? পার্থক্যগুলো কী?

ঘ. অধ্যাপক জাহান আরার উক্তির আলোকে জাতীয়তার উপাদানগুলো চিহ্নিত কর।

২. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

উৎপত্তিগত বা শাব্দিক দিক থেকে জাতি ও জাতীয়তা বলতে একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টিকে বোঝানো হলেও আধুনিককালে জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবাদী চেতনারই ফসল ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক ঐক্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদ উন্মেষের ফলে।

প্রশ্নঃ

ক. জাতি কী?

খ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলতে কী বুঝ?

গ, জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য কী কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ, বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সন্নিবেশিত জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কী জান?

৩. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সৃষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাই হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদী চেতনাই ছিল এদেশের সকল আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রেরণা শক্তি। বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তার মূলে ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা।

প্রশ্নঃ

ক. Natio এবং Natus শব্দের অর্থ কী?

খ. জাতীয়তার একটি সংজ্ঞা নির্দেশ কর।

গ জাতি গঠনে ভাষার গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বর্তমানে জাতি গঠনের উপাদান হিসেবে ধর্মের গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৪. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সূচিপত্র

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উন্মেষ ঘটে। ইতালীয় রাষ্ট্রদার্শনিক নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি তার দূরদৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করেন যে, আগামী দিনের রাষ্ট্র হবে জাতি রাষ্ট্র এবং তার ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ' |

প্রশ্নঃ

ক. জাতি ও জাতীয়তা শব্দ দুটি কোথা থেকে এসেছে?

খ. 'রেনেসা কী?

গ, জাতীয়তার অন্যতম উপাদান হিসেবে ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক আলোচনা কর।

ঘ. তুমি কী মনে কর যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ব্যতীত জাতীয়তা পূর্ণতা পায় না এবং জাতি গঠিত হয় না? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি পেশ কর।

৫. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

রহিম ও করিম দু'জনই বন্ধু। কলেজে পড়ার সময়ই তারা বাঙালি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তারা দুই বন্ধুই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সম্মুখ যুদ্ধে রহিম শাহাদাৎ বরণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। বাঙালি জনগণ স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়।

প্রশ্নঃ

ক. জাতি হলো রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত এমন এক জাতীয়তা যা স্বাধীন কিংবা স্বাধীনতাকামী'–উক্তিটি কার?

খ. দেশপ্রেম কী?

গ. জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য নির্দেশ কর।

ঘ. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জনগণের চূড়ান্ত বিজয়ের দিন—উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

[এ অধ্যায়ের প্রশ্ন-সংকেত]

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। জাতি ও জাতীয়তার শব্দগত বা উদ্ভবগত অর্থ কী?

২। জাতি হলো রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত এমন এক জাতীয়তা যা স্বাধীন কিংবা স্বাধীনতাকামী-উক্তিটি কার?

৩। জাতীয়তা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

৪। জাতি ও জাতীয়তার ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

৫। ১৯৭১ সালে কোথায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়?

৬। Natio বা Natus শব্দের অর্থ কী?

৭। জাতীয়তাবাদী চেতনার ফসল কী?

৮। জাতিতে কীরূপ সংগঠন বিদ্যমান?

৯। জাতীয়তার ধারণা মূলত কীরূপ?

১০। বর্তমান রাষ্ট্রের প্রকৃতি কীরূপ?

১১। ম্যাকিয়াভেলি কোন দেশের রাষ্ট্রদার্শনিক ছিলেন?

১২। দেশপ্রেম কী?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। জাতি বলতে তুমি কী বুঝ?

২। জাতির একটি সংজ্ঞা দাও।

৩। জাতীয়তা বলতে তুমি কী বুঝ?
৪। জাতীয়তার একটি সংজ্ঞা নির্দেশ কর।
৫। জাতি রাষ্ট্র বলতে তুমি কী বুঝ?
৬। জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
৭। জাতীয়তার উপাদানগুলোর নাম লেখ ।
৮। বাঙালি জাতীয়তা বলতে কী বুঝ?
৯। বাংলাদেশি জাতীয়তা বলতে কী বুঝ?
১০ । জাতীয়তার দ্বি-মাত্রা বলতে কী বোঝায়?
১১। জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছে কীভাবে?
১২। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে কোন উপাদানটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে?
১৩। জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
১৪। জাতীয়তাবাদের একটি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা কর।
১৫। জাতীয়তাবোধ কীভাবে একটি জাতিকে সংগঠিত করতে পারে?
১৬। দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়?
১৭। জাতীয়তা কীভাবে দেশপ্রেম সৃষ্টিতে সাহায্য করে?
১৮। দেশপ্রেম কীভাবে জাতীয়তাবোধকে সুদৃঢ় করে?

প্রয়োগ দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১। জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য-বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর ।

২। ধর্মের পার্থক্যের কারণেই ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়—উক্তিটির আলোকে জাতি গঠনে ধর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৩। বর্তমানে জাতি গঠনের উপাদান হিসেবে ধর্মের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে—উদাহরণ দিয়ে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৪। জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদান হলো ভৌগোলিক ঐক্য"–পাকিস্তান ভেঙে যাবার দিকে লক্ষ্য রেখে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর ।

৫। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য বা বন্ধন জাতীয়তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—উদাহরণ দিয়ে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৬ । যখন কোনো জনগোষ্ঠী একই ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয় তখন তাদের মধ্যে কীভাবে জাতীয়তার ভাব সৃষ্টি হয়? বুঝিয়ে বল।

৭। জাতীয়তা মূলত একটি মানসিক অনুভূতি”–উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৮। অবিভক্ত ভারতের মুসলমান জনগণ নিজেদেরকে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে অনুভব করত কেন? এর ফল কী হয়েছিল?

৯ । দেশ বা জাতির উদ্ভবের পিছনে জাতীয়তার অবদান সম্পর্কে জানতে হলে বাংলাদেশের ইতিহাস জানতে হবে”—ব্যাখ্যা কর।

১০ । জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য নির্দেশ কর।

উচ্চতর চিন্তন দক্ষতামূলক প্রশ্ন

১। জাতি গঠনে ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব নির্ণয় কর।

২। তুমি কি মনে কর যে, রাষ্ট্রিক অবস্থানই জাতীয়তা নির্ধারণের শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৩। বাংলাদেশিরা কি একটি জাতি? বিশ্লেষণ কর।

৪। বাঙালিরা কি একটি জাতি? বিশ্লেষণ কর।

৫। জাতীয়তার উপাদানগুলোর মধ্যে কোন উপাদানটি বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে তুমি মনে কর?

৬। জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসারের ফলেই পৃথিবীতে একসময় জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৭। জাতীয়তা একটি মানসিক সত্তা এবং এক প্রকার সজীব মানসিকতা—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৮। উগ্র জাতীয়তাবাদ সভ্যতা, আন্তর্জাতিক ও বিশ্বশান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ —দুটি বিশ্বযুদ্ধের উল্লেখপূর্বক উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

৯। জাতীয়তার চেতনা দেশাত্ববোধের চেতনা সৃষ্টিতেও সাহায্য করে—বিশ্লেষণ কর।

১০ । ‘দেশ ঠিক মায়ের মতই–উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর ।

সূচিপত্র

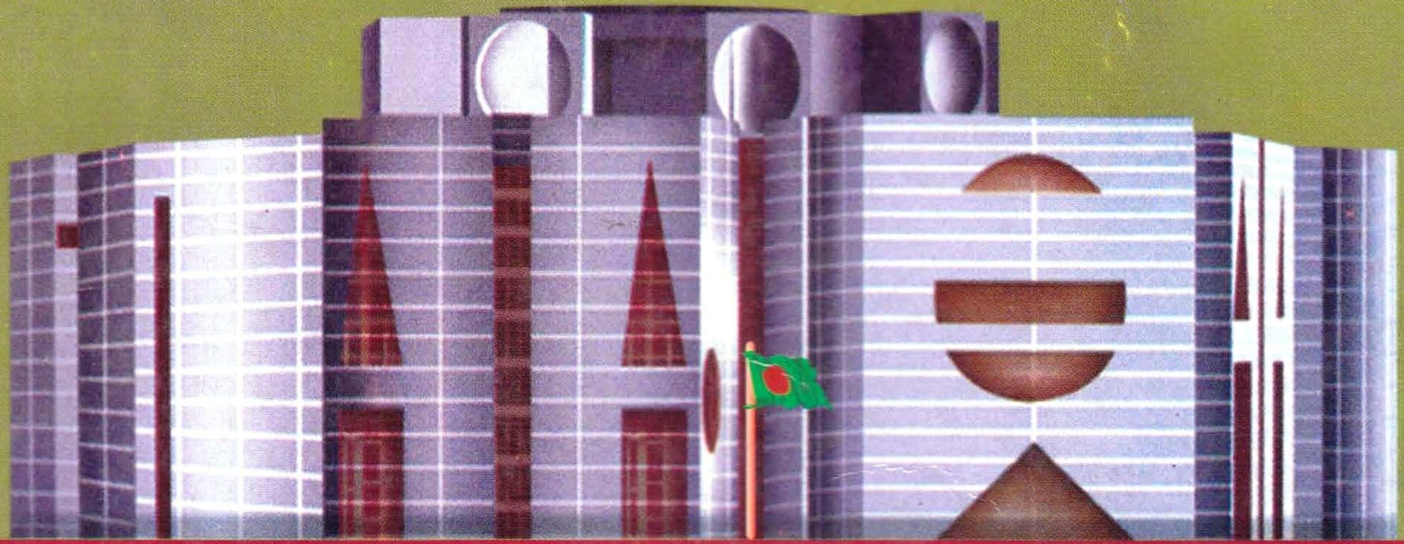

হাসান বুক হাউস ◆ ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত

পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র : একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি ◆ প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক